নন্দলাল

সত্যজিৎ চৌধুরী

প্রচ্ছদ

স্কেচ নন্দলাল বসু

বিন্যাস রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণা প্রকাশনী

কলকাতা ৬



প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
আশ্বিন ১৩৯৫
প্রকাশক :
অরুণা বাগচী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রণ :
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৯
ব্লক তৈরি :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কো.
এবং
রয়্যাল হাফটোন কো.
চিত্র মুদ্রণ :
ইম্প্রেশন হাউস
এবং
প্রতিক্ষণ

দাদা

শ্রীরণজিৎ চৌধুরীকে

অ ন্য ব ই

রচনা

অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব

আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য

সম্পাদনা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক-গ্রন্থ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ

প্রমথনাথ মিত্র বর্ধাপন

Lokayata and Vratya

—H. P. Shastri

বিষয় সূচি

চিত্র সূচি আট
কুঞ্চিকা দশ
আপন কথা এগারো

গুরুর পাশে ১
ভারতীয় আধুনিক শিল্পী ১৮
জাপানের প্রেরণা ১১৮
নন্দন-ভাবনা ১৪৫

চিত্র সূচি

[মূল ছবির মাপ সেন্‌টিমিটারে উল্লেখ করা হল। খাড়াই × আড়]

আলোকচিত্র	পৃষ্ঠাঙ্ক
নন্দলাল : অবনীন্দ্রনাথ	১
আরাই কামপোকে রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিনন্দন লিপি	১৩০
জাপানে তাইকানের বাড়িতে চা নো ইয়ু (চা পার্বণ) অনুষ্ঠানে নন্দলালের সংবর্ধনা	১৩৪
তাইকান ও নন্দলাল	১৩৭
ওগ্যুস্ত রদ্যাঁ-র ভাস্কর্য সেন্ট-জন দ্য ব্যাপটিস্ট	১৫৬

আঁকা ছবি	
জতুগৃহদাহ ১৯১০ রঙ-ওয়াশ ৪৭.৩ × ৩০.৪ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৪৩
পার্থসারথি ১৯১২ রঙ-ওয়াশ ৭৪.২ × ৫৩	৪৪
পার্থসারথি সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৪৪
বৃষ্টিস্নাত কণারক ১৯১৭ রঙ-ওয়াশ ১৫০ × ৬৫	৪৬
উমার ব্যথা ১৯২১ টেম্পেরা ১৩৪.৬ × ৫৩.৪ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৬৬
কুণাল ও কাঞ্চনমালা ১৯২৬ পেন্সিল ড্রয়িং	৬৬
কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ১৯২০ রঙ-ওয়াশ ৭১ × ৪৩	৬৯
কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৬৯
দুর্যোধন ১৯৫৯ সাদাকালো	৭০
শবরীর প্রতীক্ষা (যৌবনে) ১৯৪১ টেম্পেরা ছোপের কাজ ৩৮.৩ × ২৫.২	৭০
ঝড়ের রাতে ১৯২৩ রঙ-ওয়াশ ৩৬.২ × ২৪.২ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৭২
মধ্যাহ্নস্বপ্ন (গ্রীষ্ম) ১৯৩১ টেম্পেরা ছোপের কাজ ৬৮.৯ × ৩৪	৭৪
বসন্ত (কৃষ্ণচূড়া) ১৯৩১ টেম্পেরা ছোপের কাজ ৬৮ × ৩৩ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৭৯
বোলপুরের পথে ১৯৩৪ টেম্পেরা ছোপের কাজ ৫৪.৮ × ৩৫	৮০
রাত্রি (শীত) ১৯৩১ টেম্পেরা ছোপের কাজ ৬৭ × ৩৩.৫	৮৩
স্বর্ণকুম্ভ ১৯৩৬ টেম্পেরা (কাঠের উপরে) ৪৪.২ × ২৭.৫ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৮৪
রাধাবিরহ ১৯৩৬ টেম্পেরা ৮২ × ৪৯.৫ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৮৬
হরিপুরা মিউরাল ১৯৩৭ ৬৩.৩ × ৫৫.৯ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৯০
হরিপুরা মিউরাল ১৯৩৭ ৬৪ × ৫৪ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৯১
কালীঘাট পটের রেখা	৯২
হরিপুরা মিউরালের রেখা	৯৩
হরিপুরা মিউরালের রেখা	৯৪
জাপানি সোশো লিপি	৯৫
অন্নপূর্ণা ও রুদ্র ১৯৪৩ ওয়াশ-টেম্পেরা ৪০.৩ × ২৬ সাদাকালো প্রতিচ্ছবি	৯৬
নটীর পূজা- চীনা ভবনের মিউরাল ১৯৪২ ৭০ × ১২০	৯৮

নটীর পূজা মিউরালের (অংশ) ১০০

আবদুল গফ্ফর খান ১৯৩৫ পেন্সিল স্কেচ ২৯'৫ X ১৮'১ ১০৪

আবদুল গফ্ফর খান ১৯৩৬ লিনোকাট ২৯'৫ X ১৮'১ ১০৫

ডাক পাড়ে ও ঔ (সহজ পাঠ) ১৯৩১ লিনোকাট ৯ X ১৩ ১০৮

হেলাফেলার কাজ ১০৮

চ ছ জ ঝ দলে দলে (সহজ পাঠ) ১৯৩১ লিনোকাট ৭ X ১৩ ১০৮

রাজগির পর্যায় ১৯৪৫ কালিতুলির কাজ ১০৯

রেগে বলে দস্যু ন (সহজ পাঠ) ১৯৩১ লিনোকাট ৬৮ X ১২'৪ ১০৯

রাজগির পর্যায় ১৯৪৫ কালিতুলির কাজ ১১২

গোধূলি ১৯৪৩ টেম্পেরা ৩৪'৮ X ৬০'৫ একরঙা প্রতিচ্ছবি ১১৩

প্রকৃতি চিত্র ১৯৬২ কালিতুলির কাজ ২৬'৪ X ৩৮ ১১৪

প্রকৃতি চিত্র ১৯৬২ কালিতুলির কাজ ২৭'৭ X ৩৮'৯ ১১৫

কাকুজো ওকাকুরা তেন্‌শিন শিল্পী : শিমোমুরা কান্‌জান ১৩৭ X ৬৭ ১১৮

ঢেউ ১৮ শতকের সূচনাকাল শিল্পী : ওগাতা কোরিন কাগজে
সোনালি তবকের উপরে রঙে আঁকা সাদাকালো প্রতিচ্ছবি (অংশ) ৪৬'৬ X ১৬৫'৪ ১৩২

বাঁশ ও পাম ১৮ শতকের সূচনাকাল শিল্পী : ওগাতা কোরিন কাগজে
সোনালি তবকের উপরে কালিতুলির কাজ (অংশ) ৬৬'৪ X ১৮৩'২ ১৩২/১৩৩

তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমুদ্র পার হচ্ছেন
শিল্পী : মোতোনোবু কালিতুলির কাজ ১৩২/৩৩

জলস্রোতে মাছ ১৯৪৯ কালিতুলির কাজ ১৩৫

ও চি বা (ঝরাপাতা) ১৯০৯ শিল্পী : হিশিদা শুন্‌সো রঙিন ছবি ১৫৬ X ৩৬৫
সাদাকালো প্রতিচ্ছবি (অংশ) ১৩৬

সেই সেই রুতেন (জলপ্রবাহ) ১৯২৩ শিল্পী ইয়োকোইয়ামা তাইকান
রেশমের কাপড়ের উপরে কালিতুলির কাজ (অংশ) ৫৫ X ৩৮'৬৪ ১৩৭

কুকুর-কুকুরছানা ১৯৩০ কালিতুলির কাজ ১৩৯

বুড়ি ও শিশু ১৯৪০ স্কেচ ১৪০

গোপালপুর পর্যায় ১৯৪৮ কালির ছোপের কাজ ১৪০

ফসল তোলার সাঁওতালি নাচ ১৯৫০ জলরঙের কাজ ২৪ X ৩৭ ১৪১

কুঞ্চিকা

চিত্রকথা	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৪
চিত্রকর	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৯
দৃ-সৃ	দৃষ্টি ও সৃষ্টি, নন্দলাল বসু, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ
দে-বি	দেশ বিনোদন, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, নন্দলাল জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা
বি-ভা-প	বিশ্বভারতী পত্রিকা
ভা-চি	ভারতের চিত্রকলা, অশোক মিত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ
ভা-শি-আ-ক	ভারতের শিল্প ও আমার কথা, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৯
ভা-শি-ন	ভারতশিল্পী নন্দলাল, পঞ্চানন মণ্ডল, প্রথম খণ্ড ১৯৮২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৪
ভা-শি-ষ	ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭১
শি-অ	শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ, ১৯৭২
শি-শি-ন	শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল, বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ১৩৬৮
C-G-C-A-C	***Centenary, Govt, College of Art and Craft*** 1966
I-O-T-E	***The Idals of the East*** Kakuzo Okakura, 1973
N-B-C-V	***Nandalal Bose Centenary Volume.*** Lalit Kala Akademi, 1983
V-B-N	***Visva Bharati News***

আপন কথা

আমাদের কলা-সংস্কৃতির ইতিহাসে আধুনিকতার সূচনা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে। 'অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব' (১৯৭৭) বইয়ে এই আধুনিকতার জট এবং ত্রাণের দিশা নিয়ে কিছু কথা দাঁড় করিয়েছিলাম। সেইসব ভাবনা নিয়ে আমাকে নন্দলাল বসুর ব্যক্তিত্বের জগতের, কাজের জগতের মধ্যে যেতে হল। কারণ, আধুনিক চৈতন্য কোথাও তো চরম বিন্দু ছুঁয়ে স্থকিত হয়ে যায় না, বিকাশে উত্তরণে পর্বে-পর্বান্তরে তার বিস্তার। শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতা বিকাশের এক দীর্ঘ সময় নন্দলাল অভিভাবকের ভূমিকায় ছিলেন। সমকালীন ভারতীয় বাস্তবতার সঙ্গে বোঝাপড়ার নজির তাঁর হাজার দশেক কাজে এবং শান্তিনিকেতন কলাভবনে কয়েক প্রজন্ম ধরে শক্তিবন্ত শিল্পী সংঘের মাস্টারমশাই ভূমিকায় এক পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল পরিচয় রয়েছে। এই মানুষটির কীর্তির খতিয়ান ছাড়া আমাদের শিল্পের ইতিহাস আবছা রয়ে যাবে। তাঁর মনন-সৃজন-সংগঠনের পরিচয় এ বইয়ে একটা শৃঙ্খলায় সাজানো গেল।

শিল্পীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে 'নন্দলাল বোস সেন্টিনারি ভল্যুম (ললিতকলা অকাদেমি) এবং 'চিত্রাঙ্কন' (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), 'নন্দন' (নন্দলাল সংখ্যা ১৯৮৩, কলাভবন, বিশ্বভারতী), 'দেশ' (বিনোদন ১৩৮৯, নন্দলাল জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা), 'শিলাদিত্য' (ডিসেম্বর ১৯৮২), 'প্রতিক্ষণ' (২ নভেম্বর, ১৭ নভেম্বর, ২ ডিসেম্বর ১৯৮৪) পত্রিকায় লেখাগুলির প্রথম বয়ান ছাপা হয়েছিল। বইয়ে আনতে গিয়ে অনেক অদল বদল করতে হল।

উপকরণ জোগাড়ের জন্য কত গুণী মানুষের কাছে গেছি। নিজের ধারণা যাচাই করতে অভিজ্ঞ বুঝদার মানুষের সঙ্গে আলাপনে অনেক সময় গেছে। এই এখন তাঁদের মুখ মন ছেয়ে আসছে। শিল্পীর বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ বসু, ছেলের বৌ নিবেদিতা বসু বহু সময় দিয়েছেন আমার জন্য। এই বইয়ে ছবিগুলি ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। আমেদাবাদ থেকে মৃণালিনী সরাভাই 'কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী' ছবির কালার ট্রানসপারেন্সি করিয়ে পাঠিয়েছেন। ব্লক ব্যবহার করতে দিয়েছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ। এই সুযোগ পাওয়া গেল জগদিন্দ্র ভৌমিক এবং ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন-এর দাক্ষিণ্যে। প্রতিক্ষণের প্রিয়ব্রত দেব একটি ছবি অফসেটে ছেপে দিয়েছেন। সুবিমল লাহিড়ী এবং শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় নিরন্তর আমার উপদ্রব সহ্য করেছেন। সুবিমল লাহিড়ী নামক "প্রতিষ্ঠান"টির অনুকম্পা ভিন্ন এ ধরনের কাজ তোলাই যায় না। বিশ্বভারতীর সুশান্ত মৈত্রও অনেক মেহনতে ব্লকগুলি মিলিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী কলাভবনের কাঞ্চন চক্রবর্তী এবং জয়ন্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকে অনেক খবর পেয়েছি। কলাভবনের গ্রন্থাগারটিতে সর্বদা সমাদর করে কাজ করতে দিয়েছেন গ্রন্থাগারিক পুলক দেববর্মণ। পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন পাঠ-ভবনের সুব্রত চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্বপনকুমার ঘোষ। দিনকর কৌশিক আর প্রভাস সেনের সঙ্গে আলাপচারিতে নন্দলাল মানুষটি, আমার অনুভবে প্রায় সাক্ষাৎ হয়ে উঠেছেন।

'প্রতিক্ষণে' চিঠি লিখে সমীর ঘোষ আমার লেখার কিছু অসঙ্গতি নজরে এনেছিলেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রয়েছি।

ছবি নিয়ে লিখতে গেলে শিল্পী গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে জল্পনা করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বোধের আলো বড়ো কাজে আসে। গৌতমের ছাত্র শেখরকুমার ঘোষ, অমিতাভ ভট্টাচার্য, অনিতা বিশ্বাস এই কাজটিতে আমাকে নানান্ ভাবে সাহায্য করেছেন। ৯২, ৯৩, ৯৪ পৃষ্ঠায় কালীঘাট-পট আর হরিপুরা মিউরালের রেখা কপি করে দিয়েছেন শেখর। সহজে মেলে না এমন বইপত্র জুগিয়ে দিয়েছেন অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী। দিনের পর দিন প্রকাশক আর আমার মধ্যে সেতুর মতো বিরাজ করেছেন কান্তিরঞ্জন ঘোষ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রে আমার নিত্যসঙ্গী নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত হাসিমুখে বইয়ের অনুক্রমণীটি তৈরি করে দিলেন।

জাপান বিষয়ে তথ্য জানিয়ে এবং প্রতিবর্ণীকরণে সাহায্য করেছেন বিশ্বভারতীর জাপান-বিদ্যা বিভাগের কোইচি ইয়ামাশিতা ও পদ্মরুচি মুখোপাধ্যায় এবং সেন্টার ফর জাপানিজ স্টাডিজের পরিচালক ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসি।

একমনে এ বইয়ের সব কাজ শেষ করা সম্ভব হল সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটার আনুকূল্যে। ফেলোশিপ পদ দিয়ে এই বিদ্বৎকেন্দ্র আপাতত জীবিকার দায় ভুলে নিজের কাজ করার অখণ্ড সুযোগ দিয়েছেন। আমার এখানকার সহকর্মীদের মননের কিরণ থেকে উজ্জীবনী তাপ পাই। বিশেষ করে এই কাজটিতে অশোক সেন, সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ, বরুণ দে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, গৌতম ভদ্রর সঙ্গে আলোচনায় অনেক দ্বিধা কেটেছে। রীলা মুখোপাধ্যায় সব ফরাসি নামের প্রতিবর্ণীকরণ করে দিয়েছেন।

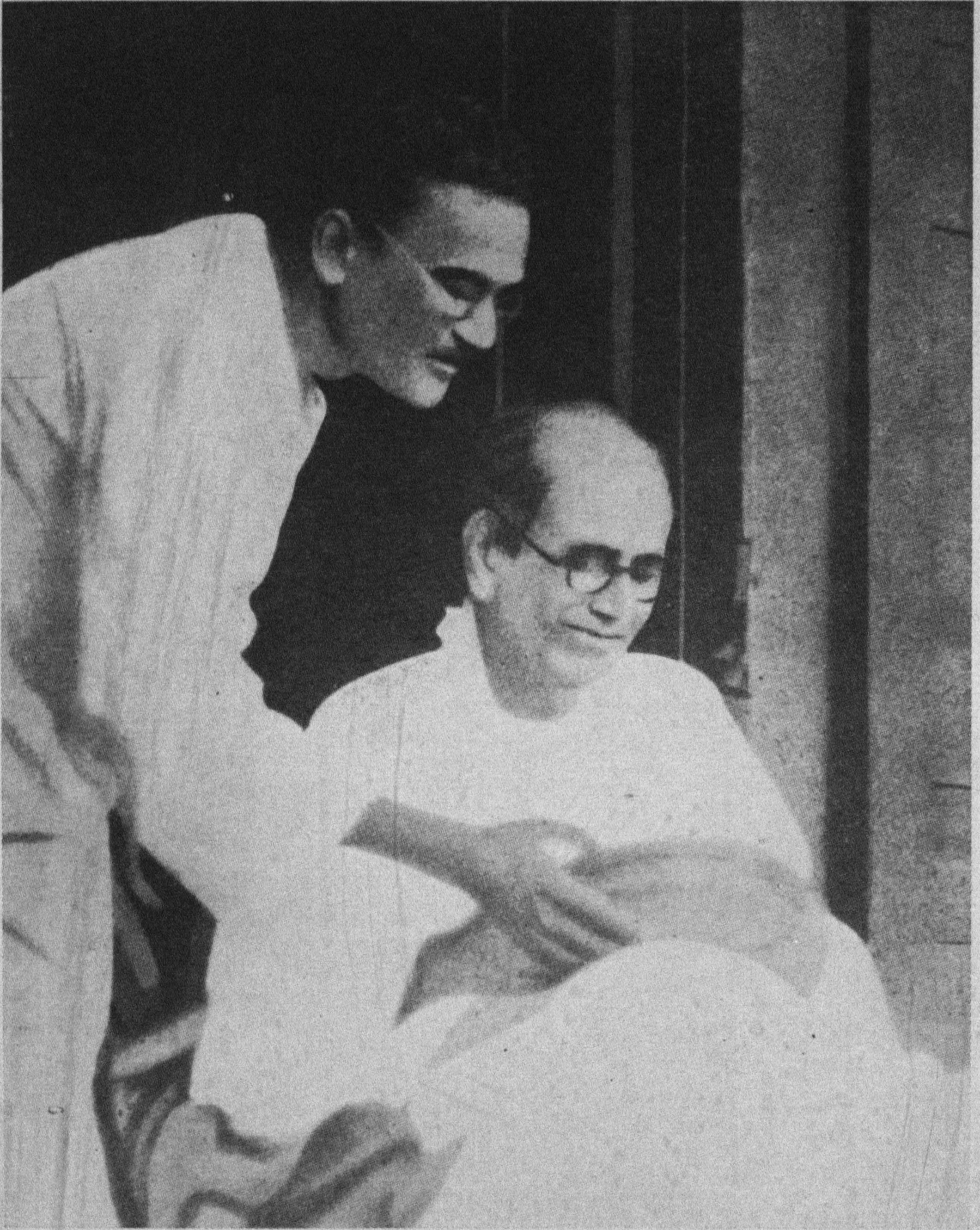
এত মানুষের প্রীতির যোগ্য হয়ে ওঠা বড়ো কঠিন। সকলের সামনে নত হয়ে দাঁড়াই আমি।

অরুণা প্রকাশনী বেশ ঝুঁকি নিলেন এই বইয়ের জন্য। বইটি গড়ে তোলায় যা বলেছি সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আয়োজন করেছেন। এঁদের মুদ্রণ-সহায়ক পশুপতি দে-র যত্নও মনে থাকবে চিরদিন। ব্লক তৈরিতে রয়্যাল হাফটোন ও স্ট্যান্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি যেমন আন্তরিক ভাবে কাজ করেছেন তেমনি রুচিকর ভাবে ছবি ছেপেছেন ইম্প্রেশন হাউস। ছোটো হলেও যত্ন করে ছাপার কাজ করেন শ্রীসারদা প্রেস। আমি এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত এঁদের উদ্দেশে এবং কম্পোজিটর, মেশিন ম্যান ও বাঁধাই কর্মীদের উদ্দেশে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

৭৫/১, শাস্ত্রী রোড, ফ্ল্যাট ৬ সত্যজিৎ চৌধুরী
নৈহাটি ৭৪৩১৬৫
উত্তর চব্বিশ পরগণা

ভুলচুক

৬৬ পৃষ্ঠায় ছবি দুটির পরিচয়ে ভুল আছে। 'উমার ব্যথা' ওয়াশ নয় টেম্পেরায় করা; কুণাল ও কাঞ্চনমালা ওয়াশের কাজ নয়, পেন্সিল স্কেচ। ৪৫ পৃষ্ঠার প্রথম ও নবম লাইনে ছবির নাম 'বৃষ্টিস্নাত কণারক' হবে। ১৪০ পৃষ্ঠায় 'গোপালপুর পর্যায়' ছবির তারিখ হবে ১৯৪৮।



নন্দলাল : অবনীন্দ্রনাথ

১

গুরুর পাশে

দুজন মানুষের মধ্যে কোনো সম্পর্কের সেতু যদি তৈরি হয়, যদি সারা জীবন ধরে টিকে থাকে সেই সম্পর্ক, ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে পরস্পর নির্ভরতার কোনো অন্তর্গত গূঢ় প্রয়োজন সম্পর্কটিকে এমন দীর্ঘ আয়তি দিয়েছে। দুটি মানুষ, একই কালের একই সমাজের হলেও দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আধার। দুটি স্বতন্ত্র জগৎ। নিত্য-নিয়ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের জগৎ নিয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে আসে, সংঘাতে বা সামঞ্জস্যে সাময়িক সম্পর্কের এক-একটা ছক তৈরি হয়, ভেঙেও যায়। যে-কোনো মানুষেরই জীবন ভরে থাকে এমন অজস্র অসংলগ্ন সম্পর্কের ছকে, তাতেও তৈরি হয়ে ওঠে এক-একটি সামগ্রিক নকশা। কিন্তু কোনো দুজন মানুষের সম্পর্ক যদি কেবলই মেলে যেতে থাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ; রুচি, দৃষ্টি, প্রবণতায় সর্বদা না মেলা সত্ত্বেও যদি সেতু ভেঙে না যায়, তা হলে ভাবতে হয় কোন্ গূঢ় প্রয়োজন এঁদের সন্নিহিত করে রেখেছে, সংলগ্ন করেছে।

ভারতীয় আধুনিক শিল্পের পরিমণ্ডলে আদি দুই কৃতী পুরুষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) এবং নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) আমাদের স্মৃতিতে পরস্পর সন্নিহিত হয়ে আছেন। গভীর নির্ভরতাময় সম্পর্কের বুনোটে দুই কীর্তিময় ব্যক্তিত্ব সংলগ্ন। প্রসঙ্গ উঠলেই অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, নন্দলালকে না পেলে তাঁর জীবনের সংকল্প পূর্ণরূপ পেত না কখনও। নন্দলাল বলতেন, তাঁর জীবন যদি কোনো ভাবে ফলবান্ হয়ে থাকে তা সম্ভব হয়েছে অবনীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে। মমত্ব এবং কৃতজ্ঞতার মতো অকৃত্রিম মানবিক অনুভূতি আর কী আছে! এ অনুভূতি সত্তার গভীর অন্তর্দেশে অনিঃশেষ আবেগের উৎস খুলে দেয়। দুজন মানুষের সম্পর্ক নিরন্তর শুদ্ধ করে তোলে। দুজনকে দুজনের নিশ্চিত নির্ভর-স্থল করে তোলে। অন্তত একটি নিশ্চিত নির্ভরতার জায়গা আছে, এই উপলব্ধির জোর জীবনের সব কাজে চরিতার্থতার প্রত্যয় এনে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল পরস্পর নির্ভরতায় সংশয়-বিষাদ পেরিয়ে যেতে পারতেন। যে কাজ হাতে নিতেন এঁরা, অন্তত একটি মনের ঔৎসুক্য

তাতে উদ্দীপনার তাপ যোগাতো।

গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের কাছে নন্দলাল আসেন ১৯০৫ সালে। অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩৪, নন্দলালের বয়স ২৩ বছর। অবনীন্দ্রনাথ প্রৌঢ় যৌবনের স্থিরতায় পৌঁছেছেন। নন্দলালও পূর্ণ যুবক তখন, ব্যক্তিত্বের ছাঁদটি তৈরি হয়ে গেছে ততদিনে। সম্পর্কের সূত্রপাত যখন থেকে, দুজনেই তখন পরিণত মানুষ। তারপর থেকে কেবলই মেলে যাওয়া, অবিচ্ছিন্ন তাঁদের সম্পর্কের মর্ম বোঝার জন্য দুটি ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা কেমন ছিল দেখা দরকার।

২

পিরালি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে সম্ভ্রান্ত উত্তরাধিকার বর্তেছিল। বাংলা দেশে হিন্দু-ইসলাম সমন্বিত সংস্কৃতি যেসব পরিবারে পুরুষানুক্রমে উৎকর্ষের উঁচু মাত্রায় পৌঁছেছিল, ঠাকুর পরিবার তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে বাংলার ইতিহাসে যখন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল, এই পরিবারের মর্যাদাবান্ বিচক্ষণ পুরুষেরা পূর্ণ আত্মমর্যাদা নিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বংশগত আভিজাত্যের নতুন বনিয়াদ গড়ে নিয়েছিলেন। ভূমিস্বত্ব এবং বাণিজ্যের উপার্জনের ঐশ্বর্যে দীর্ঘ দিন ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের জীবিকার জন্য উদ্বিগ্ন হতে হয় নি। সরকারি প্রশাসন বা বাণিজ্য সংস্থায় চাকরি খুঁজে ফেরার গ্লানি এঁদের স্পর্শও করে নি। ইংরেজি শিক্ষার অনুষঙ্গ হিশেবে রুচির বিভ্রম যখন প্রবল, সেই সময়ে ঠাকুর পরিবার সংযত বিচারবুদ্ধি নিয়ে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেয়বস্তু আকর্ষণ করে নিতে চেষ্টা করেছে। কোনো হীনমন্য বিহ্বলতায় আক্রান্ত হয় নি। এ বাড়ির মানুষদের ব্যক্তিত্বে মর্যাদাময় স্বাতন্ত্র্য এবং আভিজাত্যের পরিমণ্ডল সমকালীন বাঙালি ভদ্র সমাজে সম্ভ্রমবোধ জাগাতো। ঠাকুর বাড়ির আর-সকলের মতো অবনীন্দ্রনাথও এই মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর সামাজিক আচার-ব্যবহারে, পোশাক-আশাকে, জীবন যাপনের পরিবেশে যে শালীন পরিশীলিত রুচিবোধ প্রকাশ পেত তাকে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মনে করা যায়। ঠাকুর পরিবারের এই ভাবগত সংহতির মধ্যে প্রথম ভেদরেখা দেখা দিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দুধর্ম ত্যাগে। রামমোহন রায় অর্থহীন আচারে ক্লিষ্ট হিন্দু ধ্যানধারণায় আঘাত করেছিলেন। মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী আধুনিক মনের সেই তীব্র আঘাত বাংলার হিন্দু সমাজকে অবশ্য খুব বেশি বিচলিত করে নি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের দৃষ্টি অনুসরণ করে বিকল্প ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণবিধি প্রবর্তন করলেন, কিন্তু নিজের পরিবারের সকলকে সঙ্গে পেলেন না। একই চৌহদ্দির মধ্যে বাস করেও তাঁর মেজো ভাই, অবনীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা, গিরীন্দ্রনাথের পরিবার হিন্দু

কুলপ্রথা ছাড়লেন না। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গৌরব করে লিখেছেন,

> আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের পূজার দালান শূন্য পড়ে ছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। ('আত্মপরিচয়', ৫, ৫ অনুচ্ছেদ)

রবীন্দ্রনাথের মন সর্ববিধ "পৌরাণিক বিশ্বাস" এবং "পার্বণবিধি"র প্রভাবের বাইরে থেকে বেড়ে উঠতে পেরেছিল। অবনীন্দ্রনাথের ঘরের পরিবেশ সম্পর্কে এমন কথা বলা যাবে না। ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না এঁদেরও। কিন্তু গৃহদেবতার পূজা, হিন্দু পার্বণ উদ্‌যাপন, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু উপলক্ষে প্রথানুগত অনুষ্ঠানগুলি কখনও এ পরিবারে উপেক্ষিত হয় নি। কথকতা, কীর্তনের আদর ছিল। শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, এ বাড়ির মেয়েরা বারব্রতও বজায় রেখেছিলেন। লোকাচারের আধারে আবহমান স্বদেশের মৌল পরিচয় ধরা থাকে। ধরা থাকে মৌল নন্দনরুচি :

> বিয়ের ব্যাপারে এস্থেটিক্ অনুষ্ঠান হচ্ছে স্ত্রী-আচার; সেইটে হল আর্টিস্টের দেখবার জিনিস।—(নন্দলালকে অবনীন্দ্রনাথ, ভা-শি-ন-১, পৃ. ৩৬৮-৬৯)।

নিজেদের পরিবারের পরিবেশে অবনীন্দ্রনাথ সেই আদি মৃত্তিকার স্বাদ অনেকটা পেয়েছিলেন। তাঁর মনের গড়নে এই প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায় সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ফিরে ফিরে লোকশ্রুতি ব্যবহারে, 'আপন কথা' 'ক্ষীরের পুতুল' বা 'বাংলার ব্রত'র মতো অবিস্মরণীয় রচনায়, কৃষ্ণমঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের ছবির দৃষ্টান্তে। এদিক থেকে মনের গড়নে রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথে খুব মিল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করে দেশের লোকজীবনের সাংস্কৃতিক মর্ম বুদ্ধিগতভাবে আয়ত্ত করেছিলেন; অবনীন্দ্রনাথের মনের জমিতে এ উপাদান স্বাভাবিকভাবে এসেছে, সহজাত উত্তরাধিকারে। ইসলামি কালচারে মাজা বনেদি হিন্দু রুচির সঙ্গে লোকাচারের স্বাদ মিলে তাঁর রসরুচির বনেদ তৈরি হয়েছিল। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উপাদান কতটা মেনে নেবেন না-নেবেন, এই রস-রুচির দিক থেকেই তার মাত্রা তিনি স্থির করেছেন। ধ্রুপদী সংগীতে, নৃত্যে নিবিষ্ট হয়ে গিয়ে তিনি নিবিড় আনন্দ পেতেন। আবার ব্রতকথা-কথকতায়, কীর্তনে-যাত্রা-গানে তাঁর মন মেতে উঠত। রবীন্দ্রনাথের গান থেকে পাওয়া আলোর কথাও বার বার বলেছেন। সাহিত্যের রসে ভরপুর হয়ে উঠতেন। সাহিত্যিক রুচি এবং মেজাজ পরিণত হয়েছিল অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রভাবে। এই মার্জিত রুচি ব্যক্তিত্বের মানুষটি আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম রূপে ছবি আঁকায় হাত দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ রাশভারি স্বভাব পান নি। সকলেই সহজে কাছে যেতে পারত, তিনিও বয়স পদমর্যাদা নির্বিশেষে সহজে সকলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন। কৌতুক-প্রফুল্ল, কথায় মাতিয়ে দেওয়া মানুষ ছিলেন। প্রয়োজনের, লাভক্ষতির মাপে কোনো

সম্পর্কে বাঁধতে পারতেন না নিজেকে। ধীমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই, কিন্তু বুদ্ধির মার-প্যাঁচের মধ্যে থাকার মানুষ নন। সৌজন্যময় মমত্ব তাঁর সামাজিক ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে প্রকাশ পেত। নিজে যেন একটু আদর-কাড়া স্বভাবের মানুষ ছিলেন। পরের ছোটো ভাই, বাবার আদরের 'র‍্যাট', অকালে মারা যাওয়ায় তিনিই হলেন সংসারে সবার ছোটো। পরিবারের সকলের আদরের ছেলে। মায়ের সর্বক্ষণের মনোযোগের পাত্র। মায়ের কথায় অবনীন্দ্রনাথ কেমন উতলা হয়ে উঠতেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ের পাঠক মনে করতে পারবেন। এই আদর যেমন মা-দাদাদের কাছে পেয়েছেন, তেমনি ও-বাড়ির জ্যাঠা-কাকাদের কাছেও পেয়েছেন সারাজীবন। আদুরে বুড়ো ভাইপোকে রবিকা "পাগলা" বলে উল্লেখ করতেন। তাতে অবনীন্দ্রনাথের খুশির অন্ত ছিল না। এমনভাবে বড়ো হওয়া কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বে খরতা আসে না কখনও। নরম স্বভাবের, কমনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ কারও আদর পেলে, আর কাউকে আদর করতে পারলে তৃপ্তিতে ভরে উঠতেন।

দেশগাঁয়ে এক সময়ে যাঁদের বিষয়ীলোক বলা হত, নন্দলাল এই রকম পরিবারের ছেলে। মূলত জমির আয়, আর তার সঙ্গে সুযোগ মতো ছোটোখাটো ব্যাবসার আয় মিলিয়ে সচ্ছলভাবে সাংসারিক জীবনযাপন— এতেই এঁরা তুষ্ট থাকতেন। নন্দলালের বাবা পূর্ণচন্দ্র ওভারশিয়ারি পড়ে মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে চাকরি নেন। পরে দ্বারভাঙা এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছিলেন। ইংরেজ আমলের চাকুরে মধ্য-বিত্ত জীবনের ছকের মধ্যে এল এই পরিবারটি। প্রবাসী বাঙালির ছেলেদের লেখাপড়া শেখা একটা সমস্যা ছিল তখন। নন্দলালেরও ভালো চাকরিতে যাবার মতো শিক্ষার বনেদ তেমন পাকা হতে পারে নি। ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় এসে বছর পাঁচেক একটানা পড়ে ১৯০২ সালে এনট্রান্স পাস করলেও কলেজে গিয়ে আর সুবিধে করতে পারলেন না। এনট্রান্স পাস করার পরেই তাঁর বিয়ে হয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চাপ বাড়ে। কিন্তু অভিভাবকদের গরজ যত, তাঁর নিজের তেমন গরজ ছিল না। ছোটো বয়স থেকে এটা ওটা আঁকা-গড়ার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঘরোয়া শিল্প-কাজে নিপুণ মা ক্ষেত্রমণির প্রভাব নন্দলালের স্বভাবে অর্সেছিল। যেমন হওয়া স্বাভাবিক, পরিবারের কেউ ছেলেটির এই প্রবণতার কোনো তাৎপর্য আছে কিনা ভেবে দেখেন নি। মনের টান শিল্পের দিকে। কিন্তু জীবিকার দায় তাঁকে গতানুগতিক শিক্ষার পথে অনেক দিন ঘুরতে বাধ্য করেছে। এনট্রান্সটা পেরিয়ে এলেও ফার্স্ট আর্টস্ আর পেরোনো হয় না। দুটো কলেজ ঘুরে শেষটায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বাণিজ্যবিদ্যা পড়তে গেলেন। অন্য দিকে আর্ট স্কুলের ছাত্র, পিসতুতো ভাই অতুল মিত্রর কাছে নন্দলাল খানিকটা মডেল ড্রইং, স্টিল লাইফ স্টাডির তালিম নিচ্ছেন। সমূহ দোটানা। জীবনের এই সংকট পর্বের কথা তিনি নিজে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ

করেছেন। জীবন এসে দাঁড়িয়েছে এক বাঁকের মুখে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পথের দিশা পেলেন অবনীন্দ্রনাথের ছবির নজিরে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা অবনীন্দ্রনাথের 'বজ্র-মুকুট ও পদ্মাবতী', 'বুদ্ধ ও সুজাতা' ছবিগুলি নন্দলালের পক্ষে সংশয় পেরোবার অবলম্বন হয়ে উঠল। শুভানুধ্যায়ী কারও নির্দেশে প্রেরণায় নয়, একেবারেই নিজের ভেতরের একরোখা স্বভাবের বশে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর্ট স্কুলে যাঁরা নক্‌শার কাজ এবং আলংকারিক কাজ শিখতেন তাঁদের জীবিকার একটা উপায় হত। সরকারি অফিসে নক্‌শাবিদদের কাজ পেতেন, স্কুলে শিল্প শিক্ষকের চাকরি হত। কিন্তু এসব ভাবনা নন্দলালের মাথায় ছিল না। তাঁর একটিই লক্ষ্য, অবনীন্দ্র-নাথের কাছে আসার সুযোগ পাওয়া এবং এজন্য ললিতকলা বিভাগই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সে বয়সে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলে বরং খুশি হবার কথা তাঁর মতো যুবকের। কিন্তু বেছে নিলেন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত পথ। এমন একজনের কাছে শিখবার জন্য এলেন, যাঁর নিজেরই শিল্পী হিশাবে প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে নি তখনও। তখনও অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেশের শিল্পরসিক সমাজে নানা প্রশ্ন, বিরুদ্ধ সমালোচনার জোয়ার বইছে। নন্দলালের ব্যক্তিত্বে সংকল্পের জোর আমরা সেই পরি-স্থিতির কথা ভাবলে খানিকটা অনুভব করতে পারি।

চক্ষুষ্মান্ মানুষ তিনি। ভারতীয় আধুনিক শিল্পে প্রগতিশীল ধারা চিনে নিতে ভুল করেন নি। চার পাশে রুচির বিভ্রমের মধ্যে যথার্থ মানটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং পার্থিব সব ক্ষতি উপেক্ষা করে অবিচলিতভাবে ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অনুচ্ছল, অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের মানুষ নন্দলাল, আস্তিক এবং ঈশ্বরমুখী, স্বাভাবিক বিনয়ে নম্র। গড়পড়তা বাঙালি চেহারা নন্দলালের। পোশাক-আশাকে কোনো চেক্-নাই নেই। গৌরব করে বলার মতো কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঋদ্ধ পরিবার থেকেও আসেন নি। বাইরে থেকে বিশেষ করে চোখে পড়বার মতো কিছুই ছিল না তাঁর মধ্যে। যেন সাধারণ গেঁয়ো মানুষ একজন। কাঁধে বা মাথায় গামছা, ধুলোমাটির মধ্যে বসে কাজ করে চলেছেন— এই চেহারাটা অনেকেই মনে রেখেছেন। ব্যক্তিত্বের অন্তঃশীল প্রখরতা শুধু ধরা যেত তাঁর নিজের কাজের মধ্যে। পরিস্থিতির বিরুদ্ধতা তাঁর সংকল্প টলাতে পারে নি কখনও। ব্যক্তিগত সমস্যা কিছু কম ছিল না, নীরবে সব দায় বহন করেছেন। মধ্যবিত্তের গুছিয়ে নেওয়া মনোবৃত্তি তাঁকে কখনও স্পর্শ করে নি।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে যখন এলেন (১৯০৫) তখন তিনি এক শক্ত-সমর্থ যুবক। বিহার-বাংলার প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের অবিচিত্র অনভিজাত জীবনযাত্রা এবং পালপার্বণ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে জড়ানো নানান্ শিল্পকলার অনেকটা অভিজ্ঞ-তায় ভরা তাঁর মন। গেঁয়ো ছাঁদটা শহুরে পালিশে চাপা পড়ে নি। চেহারা চরিত্রে

অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল যেন দুই জগতের মানুষ। একজন অভিজাত পরিমণ্ডল সঙ্গে নিয়ে ফেরেন, কিন্তু আন্তরিকভাবে সেই মণ্ডলের বাইরের ভুবনে মিলতে চান। অন্য জন জীবনের ধুলোমাটির পথ পেরিয়ে এসেছেন। আকাঙ্ক্ষা, অর্জিত সুকৃতির গৌরবে উজ্জ্বল, সম্ভ্রম জাগানো মানুষটির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া।

আশ্চর্য এই যে, ২৩ বছর বয়সের যুবকটিকে দেখে বয়সের কথা অবনীন্দ্রনাথের মনে আসে নি। "কালোপানা ছেলেটি"কে যেন কোলে তুলে নেবার আবেগ বোধ করেছিলেন। সে আবেগের উৎস জীবনে কখনও শুকোলো না। নন্দলালেরও প্রথম সমর্পণের আনত মানসিকতায় কখনও পরিবর্তন আসে নি। এই মহার্ঘ তৃপ্তিটুকু তিনি অনেক পুণ্যের উপার্জন মনে করে সারা জীবন লালন করেছেন।

৩

নন্দলাল যখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে এলেন সেই সময়, ১৯০৫ সাল, বাংলা বা ভারতেরই সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গভীর তাৎপর্যময় ক্রান্তিকাল। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ দেশের বাবু-ভদ্রজনের চোখের সামনে থেকে "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে— নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে" ('আনন্দমঠ') এই বিশ্বাসের মোহ যবনিকা সাময়িকভাবে হলেও সরিয়ে দিল। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা উপলব্ধি করলেন আধুনিক শিক্ষা আর চাকরি-বাকরির সুযোগ-সুবিধায় লালিত ভদ্রজনের দেশ এবং বাস্তব দুস্থ স্বদেশ দাঁড়িয়েছে যেন পরস্পরের অচেনা দুই ভিন্ন জগৎ। দুই ভিন্নমুখী মন, যে মনের অনুভব, ভাষা, সব আলাদা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই বিচ্ছেদ পেরোবার চেষ্টা মধুসূদন দত্ত থেকে চলে আসছিল। শিল্পে অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় দেশীয় মূল সন্ধানের কাজ সবে শুরু হয়েছে তখন। সাহিত্যে-শিল্পেই ছিন্নমূল অস্তিত্বের যন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভূত হবার কথা, কারণ, দেশের মাটির রস ছাড়া অতি বড়ো প্রতিভাও ফলবান্ হয় না। বাস্তব স্বদেশে মিলবার আকুলতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের (১৮৯৩) মতো একান্ত দেশি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে খানিকটা সংহতি পাচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গের আঘাত এই আকুলতা উদ্বেল করে তুলল। জীবনে, মনেপ্রাণে দেশের সব-স্তরের মানুষের মধ্যে একতা আনবার উপায় নিয়ে তর্ক ছিল। ইতিহাসের দিক থেকে এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলাফল উদ্দেশ্যের পূর্ণতায় পৌঁছয় নি, তাও ঠিক। কিন্তু এমন সামাজিক আলোড়ন, সব ক্ষুদ্রতার উপরে উঠে জীবনের বাস্তব সংকট যথার্থ-ভাবে উপলব্ধি করার এমন সুযোগ, সৃষ্টিপ্রতিভা সম্পন্ন মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে দেয়। সংকল্প গঠনে সাহায্য করে। ব্যক্তিপ্রতিভা তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন, নিশ্চিত ধারণায় উত্তীর্ণ হবার বড়ো সুযোগ পায় এমন আলোড়নে।

দেশ জুড়ে বিপুল আলোড়নের মধ্যে, এক সৃজনমুখী উদ্দীপনা বিকিরণের তাপময় পরিবেশে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের পাশে বসে জীবনের কাজ শুরু করেছিলেন। ভারতীয় আধুনিক শিল্পের গতিপ্রকৃতি এবং সমস্যা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা এই পরিবেশে অনেক বড়ো আয়তনে, স্বদেশের চিত্তের একমুখী ভাবনার যোগে সত্য মর্যাদা পেল। নন্দলাল এই সময়ে দিনের পর দিন নিবিষ্ট হয়ে দেখেছেন, অবনীন্দ্র-নাথের নিজের হাতের কাজে কীভাবে শিল্পে ভারতীয় আধুনিকের সংকট পেরোবার নজির তৈরি হয়ে উঠছে। য়ুরোপীয় শিল্পের অর্জিত শিক্ষা তিনি উপেক্ষা করছেন না, তাকে অস্পৃশ্য মনে করছেন না, ব্যবহার করছেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হতে চাইছেন এমন সিদ্ধিতে, যে-সফলতা শিল্পীকে দেশীয় ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী করে তুলবে। অবনীন্দ্র-নাথ বিশ্বাস করতেন, শিল্পীর হাত সর্বদাই শুদ্ধ। শুচিবায়ু বর্জন করে কালের প্রয়োজনে তাকে যে-কোনো প্রকরণ ব্যবহার করতে হতে পারে। কিন্তু সৃষ্ট শিল্প অবশ্যই হয়ে উঠবে শিল্পীর আপন ঐতিহ্য-বিস্তারের দৃষ্টান্ত এবং শিল্পীর প্রতিভার স্বকীয়তায় চিহ্নিত। ভারতীয় আধুনিক মনের জাগরণে য়ুরোপের স্পর্শ আছে এবং এ জাগরণ ক্রমিক বিস্তারে আন্তর্জাতিক আধুনিকতার অভিমুখী হবেই— অবনীন্দ্রনাথ এই সত্য ক্রমেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। একেবারে প্রথম দিকের লেখায় তাঁর ঝোঁক প্রায় রিভাইভ্যালিস্ট তত্ত্বের দিকে হলেও তাঁর ছবিতে দ্রুত ব্যক্তিগত শৈলীর উন্মেষ ঘটেছে। এই সময়ে, অবনীন্দ্রনাথের নিজেরই উত্তরণের সময়টিতে নন্দলাল তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন।

১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যক্ষ হ্যাভেল অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলেন, আর্ট স্কুলের দায়িত্ব নিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর্ট স্কুলের ছাত্র হিশাবে নন্দলাল বাকি সময় পুরোপুরি অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের তখন যে পথে চালাতে চাইতেন তার আভাস পাওয়া যায় স্কুলের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আওতায় আর-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো আর্ট স্কুলেও যে বিজাতীয়করণের প্রক্রিয়া চালিয়ে আসা হয়েছে এবং যান্ত্রিকভাবে যে য়ুরোপীয় অকাদেমিক শিল্পশিক্ষার কিছু খেলো চেষ্টা করে আসা হয়েছে, সেই ধারাটি তিনি উচ্ছেদ করতে চাইলেন। হ্যাভেলেরই নীতি তিনি অর্থবহভাবে প্রয়োগ করেন। এখানকার ছেলেরা যাতে দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, জাতীয় পুরাণ এবং ইতিহাসের পূর্ণ ধারণা পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করলেন। ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। দেশি শিল্পের রীতিপদ্ধতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য পাটনা থেকে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে আনালেন। বাইরের আবহে দেশের দিকে মুখ ফেরানোর উদ্দীপনায় এবং স্কুলের ভেতরে এইসব আয়োজনে নন্দলালের

মনে স্পষ্ট ধারণা হল, আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির পথ দেশের বুকের উপর দিয়েই তৈরি করতে হবে। তার জন্য শিল্পের স্বদেশের সঙ্গে অব্যবহিত সাক্ষাৎ যোগ প্রয়োজন। এ অশেষ তিতিক্ষা এবং অধ্যবসায়ের কাজ, কিন্তু এগোতে হলে এ পথেই এগোতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনা এবং তাঁর দৈনন্দিন সাহচর্য থেকে নন্দলাল এই দায়িত্ব নিজের উপরে তুলে নেবার সাহস এবং প্রত্যয় উপার্জন করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ হাতে ধরে কিছুই তেমন শেখান নি নন্দলালকে। সেভাবে শেখানোর নীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কোনো একটা রীতিতে ছাত্রের হাত পাকিয়ে তোলার চেয়ে মন তৈরি করে দেওয়া, দৃষ্টির উন্মেষে সাহায্য করা তিনি বেশি প্রয়োজন মনে করতেন। দৈনন্দিন আলাপনে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের মনে দুর্গত স্বদেশের মূল সমস্যাটা ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। অনুভব করাতে পেরেছিলেন, কেমনভাবে দেশের স্বাভাবিক বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। দেশীয় সমাজের ভেতর থেকে সৃজন শক্তির উদ্বর্তন ঘটতে পারে নি, ঘটলে ভারতীয় আধুনিকতা স্বাভাবিক পথ পেত। বিবশ, উত্তরণের সম্ভাবনাহীন দেশের উপরে চেপে বসেছে এক খাপছাড়া আধুনিকতার স্তর। রুচির একতা তাই ছিন্নভিন্ন। জীবনে মননে কোথাও মূল্যবোধের সুস্থির বাঁধুনি নেই। লড়াইটা এইখানে। একজন শিল্পীকে সে লড়াই ছবির ফ্রেমের মধ্যেই লড়তে হবে। সফলতার জন্য প্রয়োজন প্রখর কাণ্ডজ্ঞান। ভারতীয় বাস্তবতার অসম স্তরগুলির মধ্যে একতার, শৃঙ্খলার, উপায় তাঁকে খুঁজে পেতে হবে। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কী সম্পদ পেয়েছিলেন? পেয়েছিলেন এই সচেতন কাণ্ডজ্ঞান, এই দায়িত্ব চেতনা।

হাতে ধরে শেখান্ বা না-শেখান্ গুরুর কাজের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করা নন্দলালের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁর ড্রইংয়ের বনেদ অবনীন্দ্রনাথের কাছেই পাকা হয়েছিল। ওয়াশের কলাবিধিও তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাজ দেখে আয়ত্ত করেছিলেন। ওয়াশের আঙ্গিকে অবনীন্দ্রনাথের অব্যর্থ নিপুণতার স্তরে পৌছনো অন্য কোনো শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব, একথা নন্দলালই বলেছেন। অবনীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক মেজাজ, নীড় প্রত্যাশী অথচ সুদূরের পিয়াসী মন ছবির ফ্রেমের মধ্যে যে মুড বা ভাবাবহ ধরতে চাইত, তার জন্য প্রয়োজন ছিল রঙের আমেজ ঘনিয়ে আনা। রঙের সমস্যাটা মূলত আলোরই সমস্যা। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষক চার্লস্. এল. পামার (Charles L. Palmer) যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, আলোছায়া নিয়ন্ত্রণের য়ুরোপীয় নীতি অবনীন্দ্রনাথের মনে ধরতো না তেমন। আবার জাপানি রীতিও তিনি হুবহু অনুসরণ করেন নি। এটাই স্বাভাবিক। কারণ স্বদেশের ঐশ্বর্যের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের স্বপ্নের সীমান্তরেখায় দাঁড়িয়ে নিজস্ব বর্তমানের ভাবাবহের জন্য একান্ত নিজস্ব রীতি

তাঁকে গড়ে নিতে হয়েছিল। আহরিত জ্ঞান তাঁর প্রাতিস্বিক শৈলীতে মিলে মিশে গেছে। দেশি ছবির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের অন্তরের টান ছিল মুঘল মিনিয়েচারে। মুঘল-সিদ্ধ বলতেন নিজেকে। একটু তলিয়ে দেখলে এই প্রবণতার কারণ তাঁর শিক্ষা এবং মেজাজেই নিহিত বোঝা যায়। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় শিল্পে য়ুরোপীয় প্রভাবের সূত্রপাত হয়েছিল মুঘল আমলে, আকবরের সময় থেকে। মুঘল মিনিয়েচারের সূক্ষ্ম অলংকরণে য়ুরোপীয় এন্‌গ্রেভিং এবং ছবির মধ্যে স্পেস্ বা আকাশের আবহ ব্যবহারে য়ুরোপীয় পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা অনেক দূর এগিয়েছিল। বাধা না পেলে এই যোগা-যোগ প্রাচ্যপাশ্চাত্য শিল্পের স্বাভাবিক সম্মিলনের পথ খুলে দিতে পারতো হয় তো। অবনীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় আঙ্গিকে শিক্ষিত রুচির পক্ষে ভারতীয় ছবির বিভিন্ন কলমের মধ্যে মুঘল-কলমের দিকে ঝোঁক তাই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতির হিন্দু-ইসলামি বনেদ এই প্রবণতার পরিপোষণ করেছে মনে করা যায়।

নন্দলাল প্রথম দিকে এবং উত্তর জীবনেও বহু ওয়াশের কাজ করেছেন। তাঁর উপরে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবেব জের এদিক থেকে অনেক দূর অবধি চলেছে, একথা বললে আপাত বিচারে আপত্তির কোনো কারণ নেই। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ছবির পাশে নন্দলালের ছবি ধরে ধরে দেখলে সিদ্ধান্তটির ভিত্তি একেবারেই টলে যায়। কিছুদূর এগোলে বুঝতে পারা যায়, অবনীন্দ্রনাথের অনুকরণে বর্ণমায়ার তনুতায় রোমান্টিক মুড ঘনিয়ে আনা তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য নয়। ক্রমেই তিনি চিত্রগত বস্তুর ত্রি-আয়তনিক স্পষ্ট গড়ন, বিন্যাসের আলংকারিক গুণ আয়ত্তে আনার পরীক্ষায় গুরুর পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। ভিন্ন শিল্পপ্রজাতির সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে যেখানে কোমল ভাবে পর্দায় পর্দায় মিলিয়ে দেওয়া রঙের আমেজে সাংগীতিক মূর্ছনা ফোটে, সেখানে নন্দলালের ছবি যেন হয়ে উঠতে চায় ত্রি-আয়তনিক ভাস্কর্য। নন্দলাল পটের সমতল ভাঙেন সবল রেখায়।

ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশে অল্প দিনের মধ্যেই কেন তিনি এমন ভিন্ন পথে গেলেন ?

শিল্পের স্বদেশ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথই তাঁর অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে আগ্রহ শুধু তত্ত্বগত রইল না, শুধু আর্ট গ্যালারির বাছাই করা নমুনা সংগ্রহের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রইল না। ভারতবর্ষময় প্রাচীন শিল্পকীর্তির সাক্ষাৎ পরিচয় জানার জন্য তিনি প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগালেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১০-এর প্রথম দিক পর্যন্ত নন্দলাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সে সময়ে আর-কারো এত বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল না। পর্যটক আরও ছিলেন তখন, তাঁদের কেউ কেউ নতুন শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। কিন্তু নন্দলালের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি এঁদের থেকে আলাদা। এই সময়ে

অজন্তায় অনুলিপির কাজ করা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত উল্লেখ-যোগ্য শিল্পকীর্তি তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। ইতিহাসের পর্বে পর্বে এইসব কীর্তিতে ভারতীয় প্রতিভার বিকাশ কোন্ পথে এগিয়েছে বুঝবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দৃষ্টান্তগুলি স্কেচ করতেন। নিজের হাতে স্কেচ করে মূল প্রকল্প এবং তার রূপায়ণ পদ্ধতির মর্ম আয়ত্ত করে নিতেন। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের মানুষজনের চেহারা, সাজসজ্জা, তাদের জীবনযাত্রার ছাঁদ, ঘরবাড়ি আসবাব-পত্রের বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে দেখতেন, স্কেচ করতেন। কঠিন এই অনুশীলনে তাঁর দৃষ্টিতে দেশীয় শিল্পের রূপায়ণগত বিশিষ্টতাগুলি যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ভারতশিল্প সম্পর্কে কোনো মরমিয়া ব্যাখ্যা পড়ে তা কিছুতেই হত না। তিনি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করলেন কোনো স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের সুমহান আধ্যাত্মিক আবেদন যেমনই হোক, শিল্পীকে উপকরণের মূল্য স্বীকার করে, নির্দিষ্ট আঙ্গিকে, মান-পরিমাণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে সেই সামগ্রিক দ্যোতনার উপযোগী শরীরী রূপটি গড়তে হয়েছে। এইসব গড়নে যে রীতিবদ্ধতা আছে তা আশপাশের প্রকৃতির, মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব ছাঁদ থেকে তুলে নেওয়া। একথা তো না মেনে উপায় নেই যে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও ভারতশিল্প বস্তুটির সর্বায়ত চেহারা ঠিক কী তা বোঝার জন্য এমন কঠিন পরিশ্রম করেন নি। ইনট্যুইশন্ বা স্বজ্ঞা-বলে তিনি অনেক সত্যা-সত্য ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে এবং করাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর পাশে তাঁর ছাত্র-টির ভাবমূর্তি অনেক পরাক্রান্ত এবং শৌর্যময় দেখায়।

এবং, শিল্পের স্বদেশের এই জ্ঞান থেকে নন্দলাল ভারতীয় শিল্পের চরিত্র সম্পর্কে যে ধারণায় উত্তীর্ণ হচ্ছিলেন তারই প্রতিফলনে তাঁর আঁকার ধরন ক্রমে অবনীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। নন্দলাল স্থির ধারণায় পৌঁছেছিলেন, ভারতীয় শিল্পপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে ভাস্কর্যে এবং বিশেষ করে অজন্তার অভিজ্ঞতায় তিনি নিশ্চিত হন, ভারতীয় ছবি ভাস্কর্য প্রভাবিত। পট-পাটা-পুথির ছবি বা ভিত্তিচিত্র সর্বত্রই তিনি এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। ত্রি-আয়তনিক ভাস্কর্যের গুণ ছবিতে আনার জন্য ভারতীয় শিল্পীরা প্রধানত রেখার প্রকাশ-শক্তির উপরে নির্ভর করেছেন। বস্তুর গড়নের গতিভঙ্গি, রূপের অভিব্যক্তির ছন্দ ভারতীয় শিল্পদৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে। রেখার গুরুত্বের জন্যই ভারতীয় ছবি মণ্ডনধর্মী। নন্দলালের কাজের ধারা এবং তত্ত্বগত মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি মনে করতেন আবহমান ভারতীয় শিল্পের মূল নীতি আশ্রয় করেও আধুনিক রুচির দাবি মেটানো সম্ভব। আধুনিক হবার জন্য নিজের ভিত ছেড়ে অনাত্মীয় কোনো রীতি অনুসরণ করতেই হবে, এই যুক্তি তিনি মানতেন না। নতুন কোনো আঙ্গিক আধুনিক শিল্পের বৈচিত্র্য এবং প্রকাশ-ক্ষমতা বাড়াবার প্রয়োজনে আনা যদি প্রয়োজন হয়, নিজেদের স্বাভাবিক

প্রবণতার মধ্যে সে আঙ্গিকটি সামঞ্জস্যে মিলিয়ে ব্যবহার করাই তাঁর সঙ্গত মনে হত।

১৯১০-এর পর থেকে নন্দলালের ওয়াশের কাজেও ক্রমেই নান্দনিক দৃষ্টির পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা যাবে। যেমন 'জতুগৃহদাহ', 'হিমালয়ের শিব', 'অন্নপূর্ণা ও শিব'— থেকে পরের প্রধান কাজগুলিতে তাঁর নিজস্ব শৈলী দ্রুত পরিণত হয়ে উঠেছে। এই সময়ে মাধ্যম বদলেরও সূচনা হয়েছিল। ১৯১১-য় টেম্পারায় ২০ খানি রামায়ণী পট আঁকলেন— যা সচেতনভাবে অজন্তা শৈলী প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। কিছু পরে, ১৯১৮-য় নন্দলাল 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে'র দেওয়ালের জন্য মহাভারত থেকে বিষয় নিয়ে ৬ খানি মৌলিক ছবি এবং অজন্তার কয়েকটি অনুলিপি করেন। বড়ো মাপের কাজের সাহস ক্রমেই বেড়েছে তাঁর মধ্যে। প্রতিভার স্বাদ এবং প্রত্যয়বোধ আত্মপ্রকাশের কী প্রবল আবেগ জাগিয়ে তুলছিল, কাজের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য লক্ষ করলে তার আঁচ পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র নন্দলাল গুরুর ছায়া দ্রুত পেরিয়ে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথের মিনিয়েচার ছবির ধাঁচ, রঙের উদ্দীপনা নিয়ে পরীক্ষার মেজাজ নন্দলালকে টানল না। দুজনের সংবেদনের প্রকৃতিই যেন ভিন্ন। নন্দলাল বড়ো মাপের পটে জটিল বিন্যাসের ছন্দোবদ্ধ রূপ সৃষ্টির দুরূহ পরীক্ষার পথে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের এই উত্তরণ অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। কেমন অনুভব করেছেন তিনি? আর কোনো ছাত্রকে নিয়ে তেমন ভাবেনও নি কখনও। তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা ছিল শুধু নন্দলালকে নিয়ে। সরকারি চাকরির ছকের মধ্যে গিয়ে কাজের সুযোগ সংকুচিত হবে আশঙ্কা করে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে আর্ট স্কুল থেকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। নন্দলালের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্বও নিজের উপরে তুলে নিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীন আত্মবিকাশে বাধা দেন নি। রাশ টানা বা আদেশ-নির্দেশ অবান্তর মনে করেছেন। নন্দলাল সর্বদাই প্রতিটি কাজের ভালোমন্দ অবনীন্দ্রনাথের চোখে যাচাই করে নিতে চাইতেন। গুরুর মনে না ধরা অবধি তৃপ্তি পেতেন না। কোনো ছবি গুরুর অপছন্দ হলে মনোবেদনার অন্ত থাকত না। 'আনমনা' ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের মনে ধরে নি জানায় ব্যথিত নন্দলাল কেমন অশান্তি বয়ে ফিরতেন; 'পার্বতীর প্রত্যাখ্যান' এঁকে দেখানোয় অবনীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে "বকুনি দিয়েছিলাম বলেই অমন ছবি হল" — বলায় আবার মনের প্রসন্নতা ফিরে পেয়েছিলেন— এসব গল্প করে বলতে ভালোবাসতেন। (ইন্দ্র দুগার অনুলিখিত স্মৃতিকথা, 'দেশ', ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫২)। অবনীন্দ্রনাথও নন্দলালকে পরামর্শ দিতেন গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে, সম্ভ্রমের সঙ্গে। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে বলেছেন, নন্দলালকে 'উমার তপস্যা' ছবি সংশোধন করতে বলে এসে কী অস্বস্তিতে সারা রাত ঘুমোতে পারেন নি। সকাল হতেই ছুটে গেছেন পরামর্শ প্রত্যাহার করে নিতে। যদি-বা কখনও হাত দিয়েছেন নন্দলালের ছবিতে,

অবনীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাষায়, সে যেন "ফুলের উপরে সূর্যের আলো বুলিয়ে দেওয়া।" এমনভাবে যে নন্দলালের কাজের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ জড়িয়ে থেকেছেন, তার কারণ, তিনি অনুভব করতেন— তাঁরই লালন করা সংকল্প এবং ভাবনামন্ত্র পরাক্রান্ত নন্দলাল বিরাট বিস্তারে রূপায়িত করে তুলছেন। নন্দলালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ যেন নিজেকেই পূর্ণতর হয়ে উঠতে দেখেছিলেন। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে' যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি" (দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ)। ছেলেদের মধ্যে বাবা নিজেকে সত্যতর হয়ে উঠতে দেখে বলে তাদের ভালোবাসে। গুরু-শিষ্যের বেলায় কথাটা বোধ হয় আরও বেশি খাটে। এই গূঢ় প্রয়োজনের ঐকসূত্র দুজনের সম্পর্ককে এক শুদ্ধ পর্দায় বেঁধেছিল, যার বিস্তার উভয়ের জীবনের পর্বে পর্বে কেবলই মেলে গেছে নন্দলালের বশ্যতাও ছিল বড়ো অদ্ভুত। গুরুর ইচ্ছার মূল্য দিতে তিনি সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন। বাবুভদ্রজনের চর্চার সীমার মধ্যে আর্টকে রেখে শিল্প খুব বেশি বাড়তে পারবে না ভেবে নন্দলাল কালীঘাটের পটের ধরনে ছবি করে মুদির দোকান থেকে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। চার আনা দর। বিক্রি হতও বেশ। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা কিনতেন। ১৯১৩-১৪য় এমন ভাবনা এবং উদ্যোগ খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ আঁকা সব পট আট আনা দরে কিনে নিয়ে এ কাজ থেকে নন্দলালকে নিবৃত্ত করেন। কী ভেবে বারণ করেছিলেন জানবার কৌতূহল নিয়ে আমি শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, "বাবা কখনও এ নিয়ে অবনীবাবুকে প্রশ্ন করেন নি। নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। ও রকম প্রশ্ন করার কথা বাবা ভাবতেই পারতেন না।" নন্দলাল মন্তব্য করেছেন, "বেশি দাম পেয়ে মনটা দমে গেল, (দেখলাম আমার পট আঁকার উদ্দেশ্যটার) উনি বেশি importance দিলেন না।" (দৃ-স্থ, পৃ. ২৮৩)।

দুজনের মমতা ও মান্যতাময় এই সম্পর্ক সত্ত্বেও দৃষ্টি এবং কাজের পদ্ধতিতে মানসিক অবস্থানে একটা প্রভেদ বরাবর থেকে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ নিজের পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে, য়ুরোপীয় আঙ্গিকে শিক্ষার প্রভাবে, মার্জিত আধুনিক মন নিয়ে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগের সূত্র খুঁজেছেন। তুলনায় নন্দলাল এসেছেন সমাজের এমন স্তর থেকে, আধুনিকতার অভিঘাত যে স্তরে তেমন কোনো আলোড়ন তোলে নি। যেখানে পুরানো কাঠামোটা তখনও অটুটই ছিল। এই পরিবেশে তৈরি মন নিয়ে তিনি অপরিসীম অধ্যবসায়ে দেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার শাখাপ্রশাখার ভিন্নতা এবং মিল নিয়ে, লৌকিক শিল্পের সঙ্গে পরিশীলিত শিল্পের যোগাযোগ নিয়ে অনুশীলন করেছেন। আধুনিকতার দিকে এগিয়েছেন আবহমান দেশীয় শিল্পের বুকের ভেতর দিয়ে।

দুজনের মনের গতি বিপরীত, কিন্তু লক্ষ্যটা একদিকে। দেশের আধুনিক চিত্ত-

স্তরে মূল্যবোধ এবং রুচির যে মান তৈরি হয়ে উঠেছিল তাকে সংহত করা এবং দেশের মাটির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার কর্তব্যবোধ দুজনের সমস্ত উদ্যোগকে পরস্পর-সাপেক্ষ তাৎপর্যে গেঁথে তুলেছে। যেমন, জাতীয় পুরাণের সঙ্গে নিজেদের চেতনার ওতপ্রোত যোগে প্রাচীন এই স্বদেশের যৌথ-অবচেতন থেকে দুজনই ছবির রূপকল্প তুলে এনেছেন। য়ুরোপেও যেমন একেবারে হাল আমলের শিল্পীরাও বারবার খৃস্টীয় পুরাণ থেকে রূপকল্প তুলে আনেন, অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালও তেমনি ভারতীয় পুরাণের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। সে তো কিছু ঠাকুর দেবতা বানিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয়। ভারতীয় পুরাণের দেবলোক, দেবলোকের অধিবাসীদের চেহারা-চরিত্র আবহমান ইহলোকেরই এক বিচিত্র রূপান্তর। দৈনন্দিন মানবিক অভিজ্ঞতা ফলিয়ে তোলা। মানবিক উপলব্ধির, মানবিক শক্তি এবং দুর্বলতার অতিকৃত সব রূপ। সেসব পুরাণ-প্রতিমা নতুন নান্দনিক বোধের আলোয়, আধুনিক মননের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভিন্ন গড়ন পায় এঁদের হাতে। অবনীন্দ্রনাথের 'শিবসীমন্তিনী'র বা নন্দলালের শিবপার্বতী রূপকল্প নিয়ে আঁকা ছবিগুলির সংবেদন দেশের যৌথ-অবচেতনের গভীর স্তরের উপরে আধুনিক রুচির অধিষ্ঠান সুনিশ্চিত করেছে। ভক্তের পূজার আবেগ নিয়ে, বা আধ্যাত্মিক ঘোর নিয়ে এসব ছবির আবেদন ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। আবার, এর সামনে দাঁড়ালে দ্রষ্টার, অন্তত ভারতীয় দ্রষ্টার মন নিজেরই অন্তঃস্তরের কতকালের সংস্কার-লেশের, আলংকারিকদের পরিভাষায় 'বাসনা'র বাতাবরণটি অনুভব করে। অনুভব করে অবিচ্ছেদ এক গূঢ় যোগ, নাড়ির টান। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল ভারতীয় আধুনিকতাকে এই পর্দায় বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রথাগত অর্থে "আত্মিক", "আধ্যাত্মিক" বা "ধ্যান-ধারণা"র কথা এঁরা কখনও বলেন নি। অবনীন্দ্রনাথের ওসব পিছুটান ছিলোই না। দেবতাদের নিয়ে কৌতুক করতেও বাধতো না তাঁর। যেমন 'গণেশ জননী' (১৯০৫) ছবি। বাচ্চা গণেশকে পার্বতী উঁচু করে ধরে গাছের ডাল খাওয়াচ্ছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসে ভক্তি, মহেন্দ্রনাথ দত্ত-গণেন মহারাজ-শরৎ মহারাজ— এঁদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীর কথা ভেবে নন্দলালের মধ্যে ধার্মিকতা খুঁজতে গেলেও হতাশ হতে হয়। কারণ, তিনি সরাসরি বলে দেন,

> শিল্পের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যা, তার সঙ্গে লৌকিক আচারধর্মের বা নীতিধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শান্তি সমতা ও চেতনার প্রসার অনুভূত এবং প্রকাশিত হলেই হল। (দৃ-স্থ, পৃ. ৩৭)।

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, যোগীর ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে তফাত আছে, শিল্পীর ধ্যান চোখ খুলে। ('জোড়াসাঁকোর ধারে, ১৩ পরিচ্ছেদ)। নন্দলাল বলেন, ধ্যান করলে রূপটা প্রত্যক্ষ হয়। অরূপে উধাও হওয়া নয়, রূপে নিবিষ্ট হওয়াকেই তিনি ধ্যান বলেন। ধ্যান কথাটার মানেই আলাদা হয়ে যাচ্ছে এঁদের ব্যবহারে। শিল্পের রূপায়ণ

পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নন্দলালকেও প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় ধারণার বাইরে আধুনিক মননের শুদ্ধতর স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল। তাই তিনি বলতে পারতেন, "গাছের মধ্যেই শিব আঁকব।" তাঁর রামকৃষ্ণ-ভক্তিরও একটি চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা। আর ঠাকুরের ছিল aesthetics (অনুভবের) পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। দু-জনারই ছিল aesthetics (অনুভবের) ও জ্ঞানের পূর্ণতা। কেবল পথ চলার process ভিন্ন রকম। আমার মনে হয়, ঠাকুরেরই অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশি উপযোগী। শিল্পীরা সব সময়েই ঐপথে চলেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী ; জ্ঞানের উপাসক নিরাকারবাদী। (শিল্পীদের মায়া নিয়েই কারবার)।—(শি-শি-ন, পৃ. ২৮)।

ঠাকুরের দিকে তাঁর টানের মূলেও ছিল শিল্পেরই সাধন।

৪

১৯২০ সালে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ঘনিষ্ঠ দৈনন্দিন সম্পর্কের অবসান হল। অবনীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল, খুবই বেদনা পেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে টেনে নিলেন। শুধু নন্দলালের ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল কলকাতা কেন্দ্রিত নতুন শিল্প আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে। আর্ট স্কুল, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট— দুটি প্রতিষ্ঠানেই শিল্পচর্চা ক্রমে বাঁধা ছকের মধ্যে আটকে গিয়েছিল। তিনি জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা-সভায় নতুন কাজের যে আয়োজন করলেন— তাও জমল না। রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তে এলেন, কলকাতায় বসে আর নতুন কিছু করা সম্ভব নয়। দেশের শিল্পমুক্তির জন্যে শক্তিমান্ তরুণদের স্বাধীনভাবে কাজ করার একটি বড়ো আঙিনা তৈরি করে দেওয়া দরকার। শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার নতুন পরীক্ষার জন্য বিশ্বভারতীতে তিনি কলাভবন পত্তন করলেন। তাঁর বিবেচনায়, এই পরিকল্পনার পূর্ণ দায়িত্ব নেবার মতো বড়ো মাপের মানুষ নন্দলাল ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

সত্যিই ১৯২০ নাগাদ নন্দলালের নিজের কাজেও আবদ্ধ দশা ঘনিয়ে আসছিল। তাঁর শিল্পী জীবনের দ্বিতীয় সংকটকাল চিহ্নিত করা যায় এই সময়ে। আর-একটি বাঁক। আজ মনে হয়, নন্দলাল কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে না গেলে কলাভবন গড়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেমন সম্ভব হত না, তেমনি নন্দলালের ব্যক্তিগত বিকাশও এত বৈচিত্র্যে বিশালতায় পূর্ণতা পেত না। রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি

চরিতার্থতার উপায় পেলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এ ঘটনায় বড়ো বিচলিত হয়েছিলেন। সাময়িক ভাবে হলেও রবিকার সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর সম্পর্ক মলিন হল। কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বোঝা যায় 'আনমনা' ছবি সম্পর্কে এই মন্তব্যে, "এমনই হবে জানতাম, তুমি ওখানে গিয়ে সব ভুলে গেছ।"— (ইন্দ্র দুগার অনুলিখিত স্মৃতিকথা, 'দেশ', ৬ ডিসেম্বর ১৯৫২)।

ভারতীয় আধুনিক শিল্পের দ্বিতীয় তরঙ্গ কলাভবন থেকেই জেগে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় চরিতার্থ হতে পেরেছিল নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে। শান্তিনিকেতন পর্বে নন্দলালের ব্যক্তিগত বিকাশ অনেক বড়ো প্রসরের অবকাশ পেল। শিল্পচর্চা তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত সংবেদনের প্রকাশ মাত্র রইল না, শুধু কিছু ছাত্র তৈরি করার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক যাবতীয় কাজের মধ্যে নন্দনরুচির শৃঙ্খলা গড়ে তোলার ব্যাপক দায়িত্ব তাঁকে নিতে হল। কলাভবনে দেশীয় এবং পশ্চিমি নানা করণ-কৌশলের পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় ক্রমেই বেড়েছে। শান্তিনিকেতনের আশপাশের মানুষের সঙ্গে, তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে, অব্যাহত যোগ এবং ঋতুতে ঋতুতে নতুন হয়ে ওঠা প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের উদ্দীপনা নন্দলালের শিল্পী চেতনায় অসীম প্রসার এনেছে। তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবন যেন টব থেকে তুলে এনে মাটিতে বসিয়ে দেওয়া কোনো বনস্পতির বাড়ের মতো। শাখাপ্রশাখায় পরিপূর্ণ প্রকাশরূপ।

দূরে সরে এলেও অবনীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্ব নন্দলাল অন্তরের মধ্যে সর্বদা অনুভব করেছেন। অবনীন্দ্রনাথও ক্ষোভ পুষে রাখেন নি। কোলের ছেলেও সাবালক হলে নিজের পথ খুঁজে নেয়। দৈনন্দিন সম্পর্ক ছেড়ে নন্দলাল দূরে গেল— এ বেদনা অবনীন্দ্রনাথ ক্রমে সইয়ে নিয়েছিলেন।

বিচিত্রা উঠে গেল। সোসাইটি থেকে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথও অনেকটা নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। কলকাতায় আর্ট স্কুলে, সোসাইটিতে শিল্পচর্চা চললেও আন্দোলনের জোরালো চেহারা আর রইল না। তবুও অবনীন্দ্রনাথ দায়িত্ববোধ এড়াতে পারেন না। নিজের কাজকর্ম ছাড়াও সোসাইটির কাজ তত্ত্বাবধান করেন। আর-একটি বড়ো দায় হয়ে উঠল শান্তিনিকেতনে নন্দলালের কাজ সম্পর্কে খবর রাখা। প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া। যেন আধুনিক শিল্পের চর্চায় যেখানে যা-কিছু ঘটছে তার সব দায়িত্ব অবনীন্দ্রনাথের। এই দায়বোধ কোনোদিন তিনি এড়াতে পারেন নি। মনে করেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক পর্বে এ একটা লড়াই যার নায়কত্ব তাঁরই উপরে অর্পিত। এ প্রসঙ্গেও নন্দলালের কথা আসে। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ তারিখে অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে লিখছেন, "একটা জিনিশ খুব অনুভব করি — বয়স হয়ে যাচ্ছে, বেশি দিন টিকব না। আমার জায়গা নেবে এমন কাউকে দেখতে

পাই না। নন্দলাল ঠিক জঙ্গি মানুষ নয়। তাই যাবার আগে আমি লড়াইয়ের কাজ সব শেষ করতে চাই, যাতে ফসলের জন্যে খেত তৈরি করে যেতে পারি— আপনার আশীর্বাদ জানাবেন, লড়াই তো এখনও শেষ হয় নি।"*

এ ভাবনা আসে সেই একই অনুভূতি থেকে। যেন ছোটো ছেলেটি আছেন নন্দলাল। কলাভবন সংগঠন-পরিচালনের বিরাট দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত তাঁকে দেখেও যেন মন মানতে চায় না। স্নেহের দৃষ্টি নন্দলালের কর্মিষ্ঠ পৌরুষের দিকটি যেন দেখতেই পেত না। বলতেন, "নন্দলাল কাঁটাবন মাড়ায় নি। কোলে কোলে চলে এসেছে। আমার কোল থেকে খুড়োর কোলে এল।" (শি-অ, পৃ. ৬১)।

কলকাতায় বসে অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনে নন্দলালের কাজের ধারার উপরে নজর রাখতেন। নন্দলালও বরাবর নিজের এবং ছাত্রদের কাজ নিয়ে যেতেন গুরুর কাছে ভুলভ্রান্তি ঘটছে কিনা যাচাই করে নিতে। শান্তিনিকেতনে যখনই এসেছেন অবনীন্দ্রনাথ, কলাভবনের কাজ খুঁটিয়ে দেখে ফিরেছেন। কত বড়ো ভার বহন করছেন নন্দলাল দেখে তাঁর নিজেকেই চরিতার্থ মনে হয়েছে। কারুশিল্প এবং ললিতকলার সমস্ত শাখায় কাজের এত বড়ো উদ্যোগ নন্দলাল বাইরে থেকে নিয়ম আরোপ না করেই নিহিত শৃঙ্খলায় চালিয়ে নিতেন। এত বিচিত্র কাজের মধ্যে শৃঙ্খলার বাঁধুনি কী করে থাকে—অবনীন্দ্রনাথের মতো মেজাজের মানুষের মাথায় আসা সম্ভব ছিল না। এই বাঁধুনির মূলে ছিল নন্দলালের বহুদর্শী ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

গুরুর গুরু অবনীন্দ্রনাথ এলে অবশ্য কলাভবনের কাজকর্মে একটু এলোমেলো ভাব আসতো। ছেলেমেয়েরা অবনীন্দ্রনাথকে পেলে মেতে উঠবেই। নন্দলাল এটা মেনে নিতেন। আবার তাদের শৃঙ্খলার মধ্যে টেনে নিতে হত। একবার নাকি আড়ালে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "দম্বল দেওয়া দুধ নাড়িয়ে দিলেন।"

১৯৫১য় অবনীন্দ্রনাথের জীবনের অবসান হল। এই বছরই ৭০ বছর বয়সে নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আদরের "কালোপানা ছেলেটি"কে কীর্তির চূড়ায় অধিষ্ঠিত দেখে গেছেন।

"One thing I feel very much Viz—I am growing old and can indeed not last and I do not see who will take my place, Nandalal is not a fighter, so I want to finish all the fighting work before I leave so that I may have the field fit for the corn— send me your blessings the battle is not yet over." Uma Das Gupta, Letters: Abanindranath to Havell, *The Visvabharati Quarterly*, Vol, 46, April 81, p. 227.

একটি চীনা পাকুড় গাছকে বন্‌সাই করার চেষ্টা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কিছুতেই বাগ মানে না দেখে নন্দলাল যখন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে যান তখন তাঁকে উপহার দিয়ে দিয়েছিলেন। সে গাছ নন্দলাল কলাভবনের চত্বরে লাগিয়ে দিতে মাটির লালনে ডালপালা মেলে স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা পেল। আজও রয়েছে সে গাছ।

নন্দলালের জীবনের দিক থেকে ভাবলে ঘটনাটি প্রতীকী তাৎপর্য পায়।



২

ভারতীয় আধুনিক শিল্পী

জীবনের বহমান ধারায় নতুন সমস্যা আসে। তেমনি শিল্পেও আসে বাস্তবের অভিজ্ঞান আত্মস্থ করে নেবার নতুন সমস্যা। নতুন পরীক্ষায় শিল্পীকে উপস্থিত বর্তমানের শিল্প-ভাষা উদ্ভাবন করতে হয়। প্রসর বাড়ে শিল্পের। বিষয়ে আঙ্গিকে নিয়ত নতুন ধারা উপধারা তৈরি হতে থাকে। এই নিয়মে আজ ভারতীয় -শিল্প বিকাশের ভিন্ন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একদা দেশের এখানে সেখানে শিল্পচর্চার সংকীর্ণ আয়োজনে উদ্বিগ্ন হয়ে সেই "কেয়ারি করা ছোটো ছোটো ফুল গাছের বাগানের" পরিবর্তে "বনস্পতির অরণ্য" দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। "বনস্পতির অরণ্যের" মতো পরিব্যাপ্ত মহীয়ান শিল্পের আয়োজন দেশে আজও নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেক শক্তিমান চিত্রকর ভাস্কর রয়েছেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই প্রত্যাশা মতো, ভারতীয় শিল্পকে বিশ্বের বড়ো রাস্তায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন। এঁদের অনেকের কাজ দেশিকতার বেষ্টন পেরিয়ে আন্তর্জাতিক আধুনিক রুচির দৃষ্টান্ত হিশেবে মাননা পায়। খুব স্বাভাবিক যে, আজকের শিল্পের পরিবেশে অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালকে মনে হয় অনেক দূরের মানুষ। দূরত্ব কালের হিশেবে তত নয়, যতটা শিল্পরুচির দিক থেকে। একালের শিল্পী, শিল্পজিজ্ঞাসু নন্দলালের কাজে অনেক সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন। বলাও হয়ে থাকে সে-সব সীমাবদ্ধতার কথা। অনুযোগ ওঠে, তাঁর প্রভাব শিল্পের বিশ্বমুখী প্রকাশরূপকে অনেকটাই আবদ্ধ করেছে। প্রাচ্য অভিমানে, জাতীয়তার অভিমানে অমন প্রবল প্রতিভার বিকাশ খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। শোনা যায়, তাঁর একান্ত নিয়ন্ত্রণের এলাকায়, কলাভবনে, স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের পথ তৈরি করতে চাইতেন যে ছাত্ররা, তাঁদের পরীক্ষায় তাঁর অনুমোদন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না তেমন।

জল্পনা বাদ দিলেও বিবেচনাযোগ্য কিছু গভীর প্রশ্ন এসে পড়ে এইসব প্রতিক্রিয়া থেকে। আধুনিক শিল্পের বয়স সবে এক শতাব্দী পূর্ণ হল, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের কুটিল গতির মতোই অনেক বাঁক আমাদের আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে। অনতিদীর্ঘ এ-ইতিহাসের অনেকটা, প্রায় ষাট বছর, জুড়ে আছে নন্দলাল বসুর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের

বিকাশ এবং শিক্ষক-ভূমিকার বিবর্তন। তাঁর সব কাজ এক জায়গায় দেখবার সুযোগ নেই। বিচ্ছিন্ন প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতায় বা বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্বাচিত ছবির মুদ্রণের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হওয়ায় অনেকেরই মন্তব্যে তাঁর সম্পর্কে এক-পেশে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন অশোক মিত্রর বিখ্যাত বই 'ভারতের চিত্র-কলা'য় (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) নন্দলাল সম্পর্কে প্রায় দায়সারা আলোচনা। তাঁর স্বীকৃতি থেকেই জানা যাচ্ছে, ১৯৮২-র আগে নন্দলালের মূল কাজ তেমন দেখেনই নি, ছাপা ছবি দেখে বিচার করেছেন (*N-B-C-V* p. 19)। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে কাণ্ডজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল শিল্প সমালোচনা যা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিল বিশেষ বিশেষ শিল্পী। কখনও যামিনী রায়, কখনও ক্যালকাটা গ্রুপের কোনো কোনো শিল্পী সুবিচার পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিল্পের সমগ্র পরিচয়, বিভিন্ন ধারার কাজের তাৎপর্য কারও আলোচনাতেই ফোটে নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শাহিদ সোহরা-ওর্দী বা বিষ্ণু দে— সকলেরই লেখা এদিক থেকে একপেশে। কলকাতার শিল্পচর্চার কথা এঁদের লেখায় এলেও শান্তিনিকেতন কলাভবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এঁরা উদাসীন ছিলেন। কখনও -সখনও নন্দলাল সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন মন্তব্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশ বা গোটা কলাভবনের কাজে তাঁর কর্মিষ্ঠ প্রতিভার সামর্থ্য যেন এঁদের আগোচর রয়ে গেছে।

এইসব খণ্ডিত বিচারে ধরাই যায় না কী ধরনের রুচির সংকটের মধ্যে তাঁকে সংকল্প গঠন করতে হয়েছিল, প্রায় সর্বব্যাপী আদর্শ বিভ্রাটের মধ্যে কীভাবে তিনি বাস্তব স্বদেশের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নান্দনিক শুদ্ধাচার অর্জনে সচেতন গ্রহণ-বর্জনের পথে এগিয়েছেন। একজন শিল্পী হিশেবে তাঁর সামর্থ্য পরীক্ষার জায়গা, যাবতীয় দ্বন্দ্ব এবং উত্তরণের বোঝাপড়া ছবির ফ্রেমের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু রেখা ও বর্ণপাতের স্তরে স্তরে তাঁকে বুঝে নিতে হয়েছে, স্বদেশের ইতিহাসের কোন্ বাঁকে দাঁড়িয়ে তিনি কাজ করছেন। মনে রাখতে হয়েছে, শিল্পের এলাকায় সংকল্প গঠন এবং প্রকরণ উদ্ভাবনের সমস্যার জড় দেশের বাস্তবতায় নিহিত। জীবনে যেমন, তেমনি শিল্পেও কোনো সরল সমাধান নেই আধুনিক ভারতীয়র পক্ষে। এই বোধ থেকেই তাঁর কাজে এসেছে সচেতনভাবে পথ তৈরির, অব্যর্থ প্রকাশরূপ খোঁজার নিরন্তর উদ্যম। আঁকার রীতিপদ্ধতি এবং মাধ্যম বার বার বদলেছেন। বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর তাঁর সারা-জীবনের কাজের ধারার দিকে তাকালে মনে হয় এ এমন এক শিল্পীব্যক্তিত্ব, যাঁর অপ্রতিহত সামর্থ্য যেন সর্বদাই সমুদ্যত। যে -কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি নিজের শর্তে, স্বধর্মে অবিচলিত থেকে উত্তরণের অমোঘ উপায় আয়ত্তে আনতে পারংগম। নন্দলাল বসুর প্রতিভার আধুনিক চরিত্র বোঝার জন্য তাঁর শিল্পীজীবন সূত্রপাতের পরি-প্রেক্ষিত এবং তাঁর আত্মবিকাশের স্তরগুলির পারম্পর্য অনুশীলনের ধৈর্য প্রয়োজন।

২
বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা ছিল মাস মাইনের চাকরি। অভিভাবকেরা নন্দলালকে প্রথম থেকে সেইভাবে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। দুটো-তিনটে পাস দিলে তবে ভব্য কোনো জীবিকার উপায় হত তখন। কিন্তু নন্দলাল ভালো ছাত্র ছিলেন না। তিনটে কলেজ ঘুরেও ফার্স্ট আর্টস্ পাস করা হয়ে উঠল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাণিজ্য বিদ্যার ক্লাসে বৃথা আরও কিছু সময় নষ্ট করলেন। এনট্রান্স পাস করেই বিয়ে করেছিলেন। সংসারের দায়িত্ব এবং কেরিয়ারের ভাবনা এই সময়ে ১৯০২ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে যে তাঁকে ক্রমে বিহ্বল করে তুলছিল— বোঝা যায়।

সব মানুষের জীবনেই সংকট কাল আসে। পরিস্থিতির চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের সামর্থ্যে এগোবার পথ বেছে নিতে হয়। বড়ো কোনো দায়বোধ না যদি থাকে, তাহলে সংকটের বোধও তেমন তীব্র হবার কথা নয়। গড়পড়তা ব্যক্তিত্বের মানুষ সহজেই এ সংকট পেরিয়ে যায়। সামান্য ঝুঁকি নিলে বা বাইরের কারও অভিভাবকত্ব মেনে নিলেই সারা জীবনের মতো একটা দাঁড়াবার জমি তারা পেয়ে যায়। কিন্তু সৃজন-প্রতিভা নিয়ে, বড়ো কোনো দায়বোধ নিয়ে জন্মায় যে মানুষ, তার পক্ষে এত সরল সমাধান জোটে না সচরাচর। ঠেকে ঠেকে তাকে বুঝতে হয়, সফলতার বাঁধা পথে প্রতিষ্ঠা নেই। গোপনবাসী তার অনন্য স্বভাব কেবলই আন্‌পথে চালিয়ে নেয়। গড়পড়তা ছকের বাইরে যেতে উন্মুখ করে তোলে। বাইরের বাধা এবং নিজের ভেতরের সংশয়— এই দোটানা পেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিত্বের ধার বাড়ে ক্রমে। অন্তঃশীল প্রবণতাগুলি প্রত্যয়ের চেহারা নেয়। নিজের কাছে উন্মোচিত হয় আপন সত্তা-পরিচয়।

নন্দলালের জীবনে দোটানার সংকটপর্ব একটু দীর্ঘ। বালক বয়স থেকে তাঁর মনের টান ছিল শিল্পকাজে। নিজে বলেন, মায়ের হাতের কাজ দেখে দেখে শিল্পের চোখ ফুটেছিল। মা ক্ষেত্রমণি সেকালের গাঁয়ের আর-সব মেয়েদের মতো ঘরোয়া কারুকাজে নিপুণ ছিলেন। ছাঁচ কাটতেন, খয়েরের পুতুল গড়তেন, নকশি কাঁথা সেলাই করতেন। এইসব হাতের কাজে "রচনা" করে তোলার গৌরবটুকু ছোটো বয়স থেকে নন্দলাল অনুভব করতে পারতেন। সব শিশুই বড়োদের দেখে এসব খেলা খেলে এক সময়ে। তার পরে ভুলে যায়। নন্দলাল খেলার চেয়ে বেশি নিবিষ্ট-তায় রচনা করে তোলার কাজে লেগে থাকতেন। তাঁর আলাপচারিতে প্রমাণ রয়েছে, ক্রমে ঘরোয়া গণ্ডি পেরিয়ে কৌতূহল গেছে গাঁয়ের কারুশিল্পীদের, পূজাপার্বণে

মূর্তি গড়ার শিল্পীদের কাজের দিকে। খেলা থেকে তিনি শেখার শৃঙ্খলার দিকে এগিয়েছেন। বালকের শেখায়ও সচেতন আয়াস থাকে। এই সচেতনতা নিজের কাছে নিজের নিহিত শক্তি উন্মোচন করে দেয়। এগিয়ে যাবার সাহস জোগায়।

বালক বয়স পেরিয়ে আসতে আসতে নিয়মিত কিছু-না-কিছু আঁকা বা গড়া নন্দলালের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে যদি কোনো অভিভাবকের সমর্থন পেতেন, কেউ যদি তাঁর সৃজনমুখী ব্যক্তিত্বের উন্মেষটুকু লক্ষ করে ঠিক পথে চালিয়ে নিতেন, তাহলে এলোমেলো সময় নষ্ট হত না। আবার এও ঠিক যে, অভিভাবকদের কারও কাছে সে নজরটুকু পান নি বলেই তাঁর ভেতরে প্রখর এক রোখ্ জেগে উঠেছিল। ভালোমন্দের, ভবিষ্যতের সব দায় একান্তভাবে নিজের উপরে তুলে নেবার রোখ্। শিল্পের পথে আসায় নন্দলালের পক্ষে নিজের সংকল্প ভিন্ন নির্ভর করার মতো আর-কোনো সহায় ছিল না।

লেখাপড়া শেখার সূত্রে কলকাতায় এসে দেশেব নতুন শিল্প আন্দোলনের খবর পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হল। পত্র-পত্রিকার খবরে, সমালোচনায়, মুখে মুখে আলাপ আলোচনায় এই নতুন আন্দোলনের হাওয়া তাঁকে উৎসুক, চঞ্চল করে তুলত। তাঁর পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পাড়ার আর একটি ছাত্র সত্যেন বটব্যালের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। এঁদের কাছে সরাসরি আর্ট স্কুলের ভেতরের পরিবেশের পরিচয় পেতেন। স্কুলের শিক্ষাবিধির, হ্যাভেলের শিল্পশিক্ষা সংস্কারের চেষ্টার, বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের কথা শুনতেন। অতুল মিত্রর কাছে ড্রইং ও পেইন্টিংয়ে খানিকটা রীতিবদ্ধ আঙ্গিকের শিক্ষাও পেয়েছিলেন।

এইসব যোগাযোগে তাঁর লক্ষ্য স্থির হয়ে এল। বুঝতে পারলেন, অভিভাবকদের ইচ্ছা পূরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় আর। যত বড়ো ঝুঁকি নিতে হোক, শিল্পের পথ আঁকড়ে থাকতে হবে। সচেতন বিবেচনার ধাপে ধাপে তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। আত্মস্থতা উপার্জন করেছিলেন। নিরন্তর অনুশীলনে যেমন নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যয় গাঢ় হয়ে আসছিল, তেমনি নতুন শিল্প আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতায় দেশীয় আধুনিকতার মূল প্রবণতা ধরতে পারছিলেন। তাঁর বোধের বিকাশে তখনকার 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাসে মাসে ছাপা ছবি দেখার সুযোগ খুব কাজে আসে। এখানে কিছু বিদেশি ছবি দেখেন এবং তার কপি করেন। যেমন র‍্যাফাইলের মাদোনার কপি। দেখেন রবি বর্মার ছবি। অল্প দামে তাঁর ছবির ওলিয়োগ্রাফ ছাপাও পাওয়া যেত। ঘরে ঘরে তার সমাদর ছিল। তখনকার শিল্পরসিকেরা রবি বর্মার কাজে সকলেই কম বেশি মুগ্ধ ছিলেন। নন্দলালও আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু সমকালীন শিল্পের সেই এলোমেলো আবহাওয়ার মধ্যেও নন্দলাল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন— সমাদৃত শিল্পী রবি বর্মার প্রভাব বা তখন যে-কজন য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিল্পী কাজ শেখাতেন, তাঁদের প্রভাব

ছাপিয়ে উঠছে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি। অবনীন্দ্রনাথের নিজের কাজেও তখনও অবশ্য পরিণতি আসে নি। কোনো বিশেষ শৈলী দাঁড়িয়ে যায় নি তাঁর হাতে। কিন্তু শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার আদর্শ নিয়ে বিতর্ক আবর্তিত হচ্ছিল তাঁরই কাজ নিয়ে। লন্ডনের 'দি স্টুডিও' পত্রিকায় হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের ছবির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন "সাম নোটস অন ইন্ডিয়ান পিক্‌টোরিয়াল আর্ট" প্রবন্ধে (১৫ অক্টোবর, ১৯০২)। হ্যাভেলের বিচারে সায় দেবার মতো মানুষ দেশে তখন খুব বেশি ছিল না। সেই পরিবেশে একজন তরুণ শিক্ষার্থী নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকেই গুরু নির্বাচন করলেন।

তাঁর সংকল্প গঠনের প্রক্রিয়ায় অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহ ক্রমেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠছিল। চূড়ান্ত বিবেচনায় তিনি শিল্পের পথ যেমন বেছে নিলেন তেমনি যে করেই হোক অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া লক্ষ্য হয়ে উঠল। বোঝা যায়, সফলতার চেনা রাস্তা আর তাঁকে টানতে পারছিল না তখন। না হলে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হত, ভেতর থেকেই বাধা পেতেন। এ সিদ্ধান্ত আকস্মিকও নয়, দীর্ঘ বিচার বিবেচনায় সংহত সংকল্পের প্রকাশ। তাঁর সারা জীবনেই কোথাও আকস্মিকতার চমক নেই। সম্ভাবনাগুলি সামর্থ্যের মুঠিতে ধরার সুস্থির একাগ্রতায় তাঁর ব্যক্তিত্বের পৌরুষ প্রকাশ পেত। কিছুই তাঁর হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন নয়। উপার্জিত সম্পদ। এই পৌরুষে ভর করে তিনি প্রাথমিক আত্মপরিচয়ের সংকট পেরিয়েছিলেন।

৩

১৯০৫ সালে নন্দলাল গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি হতে আসেন। "অবনবাবুর কাছে শিখতে হলে এখানে আসাই প্রশস্ত" কারণ, ১৯০৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ওনিস্তো গিলার্দি অবসর নিলে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জায়গায় এই বছরেই ১৫ আগস্ট আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছিলেন।

শিল্পকলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের ঢেউ পৌঁছেছিল অনেক দেরিতে। কলকাতায় শিল্পশিক্ষার পত্তন হয় ১৮৫৪-য়, আধা সরকারি 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' প্রতিষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি আওতায় এল ১৮৬৫-তে, নাম হল 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট'। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে এখানে ছাত্র এসেছে অনেক, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক ও সাহিত্যিক আদর্শের প্রশ্নে যেমন দ্রুত নতুন চেতনার অভ্যুদয় হয়েছিল, এই বিলিতি শিল্পশিক্ষার আয়োজন তেমন কোনো চেতনার উন্মেষ ঘটায় নি এখানকার ছাত্রদের মনে। ১৮৯৬-এ অধ্যক্ষ হয়ে এলেন আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল এবং তাঁর প্রথম রিপোর্টে স্পষ্টই বললেন, এখানে এতদিন অনুসরণ করা হয়েছে ইংল্যান্ডের আঞ্চলিক আর্ট স্কুলের চল্লিশ বছরের পুরানো

ছেঁদো রীতি। প্রাচ্য শিল্প উপেক্ষা করে ছাত্রদের ভুল পথে চালানো হয়েছে। তিনিই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপাধ্যক্ষ পদে আনেন। আর্ট স্কুলে প্রথম যাঁরা ছাত্র হিশাবে অবনীন্দ্রনাথের পাশে এসে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দলাল বসুকে অবনীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ।

১৯০৬-এ হ্যাভেল অসুস্থ হয়ে দেশে চলে গেলে অবনীন্দ্রনাথ অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। নন্দলালের ছাত্র বয়সে আর্ট স্কুলের শিক্ষা পুরোপুরি অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ীই চলেছে। এখানকার শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যক্ষের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে (১৯০২-০৩ থেকে ১৯০৬-০৭)। বলা হয়েছিল,

> বহু বছর ধরে এখানে বিজাতীয়করণের প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। ছাত্ররা এমন এক শিল্প সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অযথা ব্যয় করেছে যা তারা যথার্থ ভাবে আয়ত্ত করতে পারে নি, পারবেও না। ভালো কাজ করতে হলে ছাত্রদের অবশ্যই দেশের চিরায়ত বাঙ্‌ময় খুব ভালো করে জানতে হবে। দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ এবং মহাকাব্য ও ইতিহাসের উপাখ্যান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অবশ্যই দরকার। অতীতের মহান ভারতীয়দের প্রবণতা সম্পর্কে না জানলে তার সৃষ্টি উঁচু মান ছুঁতে পারবেই না।*

আদর্শরিক্ত, কল্পনারিক্ত আঙ্গিক চর্চার বাধ্যবাধকতায় নিকৃষ্ট বিলিতি কারিগরি শেখানোর যে ধারা আর্ট স্কুলে চলে আসছিল, একটা শক্ত বাঁধ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ সেই মানসিকতা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, ছাত্রদের চেতনায় এই গৌরববোধ জাগ্রত থাক যে, যতটা দীনহীনভাবে দেখানো হয় ভারতীয়দের, ভারতবর্ষ তেমন দীন ছিল না। গৌরব করার মতো অতীত আছে ভারতের। ভবিষ্যতের শিল্পের ভারত যাদের হাতে, যারা আজ এক রিক্ত দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই গৌরববোধ তাদের সংকল্প ও উদ্যম উঁচু পর্দায় বেঁধে

---

*"The process of denationalisation went on for years, and for years our art students were made to spend the best part of their life in fruitless attempts to acquire ideas about an art which they never could or ever would rightly understand. ···To produce any really good work the art students must be thoroughly conversant with the classical lore of his country. He must have a complete knowledge of its religious and social ideals, of the episodes of the Indian epics and history·· without knowing the trend of the greatest Indians of the past, his productions are bound to fall short of a high standard."—*C-G-C-A-C*, p. 31

দিক। অবশ্য আদর্শ হিশাবে যাই বলুন, অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কোনো বিশেষ রীতি-পদ্ধতি শিখতে বাধ্য করতেন না। কে কোন্ পথে এগোবে, সে বিষয়ে ছাত্রদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এত স্বাধীনতা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দেওয়া হয় না। অবনীন্দ্রনাথ নিজে কাজ করতেন, ছাত্ররাও পাশে বসে কাজ করত। কেউ সমস্যায় পড়লে হয়তো তার ছবিতে হাত দিতেন। মূল বিন্যাস বাঁচিয়ে সংযোজন সংশোধন করে দিতেন। জীবনের বহতা ধারার সঙ্গে ছাত্রদের কাজের যোগ সাধনের জন্য পথে-ঘাটে ঘুরে মানুষজনের আদল, গতিভঙ্গি অনুশীলন করতে বলতেন। অতীতের ভূত ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই বর্তমানের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন কথা তিনি কখনও ভাবেন নি। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কোনো বাঁধা নিয়মের মধ্যে ন' গিয়ে নিজের রুচি এবং আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার পুরো স্বাধীনতা তিনি স্কুলে পাবেন। অবনীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস তৈরি করেন নি। ছাত্ররা ঠিক কী শিখবে, কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করবে, কীভাবে ধাপে ধাপে বিশেষ আঙ্গিকে নিপুণ হয়ে উঠতে পারবে— এসব ভাবনা তাঁর অবান্তর মনে হত। স্বাভাবিক দক্ষতা যদি কারও থাকে তাহলে নিজের স্বভাবে কাজ করে যেতেই হবে এবং ঠেকে ঠেকে বাঁক নিয়ে নিয়ে সে যে চেহারা নেবে সেটা হবে একান্তই প্রাতিস্বিক। সব গাছই তালগাছের মতো সরল বিকাশে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে এ কখনও সত্য হতে পারে না। কিন্তু সব গাছই নিহিত স্বভাব এবং বাইরের বাধার দ্বন্দ্বময়তায় একটা ছাদ পায়, যা তার নিজস্ব রূপ। অবনীন্দ্রনাথ ভাবতেন, শিল্পীব্যক্তিত্বের রূপটিও এই নিয়মেই তৈরি হয়ে ওঠে। শিক্ষক হিশেবে তিনি শুধু সংকটে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে পারেন, আর মনের আধারটি ঐশ্বর্যে ভরাট করে দিতে পারেন। ফলে তাঁর ক্লাসের ছাত্ররা যা স্বাধীনতা পেয়েছেন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে অভাবনীয়। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে হাতে কলমে যতটা শিখেছেন তার চেয়ে কথা শুনেছেন অনেক বেশি। নানাজনের স্মৃতি বেয়ে আমাদের কাছে সেই অপরূপ আলাপনের যে আভাস ফুটে ওঠে তাকে কিছুতেই গুরুর উপদেশ বলা যায় না। নিজেরই অভিজ্ঞতার কথা বলতেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তাঁর সারা শরীর মুখর হয়ে উঠত। জটিল সমস্যা-কেও তিনি ছাত্রদের অনুভবের মধ্যে স্থায়ী করে দিতেন আয়াসহীন আলাপন আর লম্বা লম্বা আঙুলের মুদ্রায়। কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার তাগিদ তাঁর স্বভাবেই ছিল না। শুধু অনুভব করাতে চাইতেন, কোন্ বিভ্রমের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে নিজেকে এবং ছাত্রদেরও। তাঁদের পথ খোঁজার তাৎপর্য কী। নিজের কাজের অভিজ্ঞতায় মর্মে মর্মে জানতেন ভারতীয় আধুনিকতার সমস্যা কত জটিল। ভারতবর্ষ ছিল প্রাচ্য শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। কারিগরি এবং শিল্পগত দক্ষতার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল এই দেশে। অথচ নৈপুণ্যের সে আবহমান ধারা আধুনিক পর্বে উত্তীর্ণ হল না। ইংরেজ শাসনের

সূত্রে য়ুরোপীয় আধুনিকতার প্রভাব এল। নতুন চিন্তা চেতনা জাগল। জাতীয় আত্ম-পরিচয়ের আগ্রহ দেখা দিল। কিন্তু সেই চেতনার পরিসর অতি সংকীর্ণ। বিশাল দেশ পড়ে রইল এই আধুনিক মানসিকতার বৃত্তের বাইরে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতাই মূল সমস্যা কোনো সচেতন ভারতীয়র পক্ষে, শিল্প-সাহিত্যের সৃজনশীল প্রতিভার পক্ষে যে সমস্যা তীব্র হতে বাধ্য। দেশের মাটিতে শিকড় না মেলতে পারলে কিছুই ফলানো সম্ভব নয়। অবনীন্দ্রনাথ এই সংকট পাশ কাটিয়ে যান নি, কোনো সরল সমাধান খোঁজেন নি। তাঁর ছাত্রদের চেতনায় এ সমস্যার বোধ সঞ্চার করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন কোন্ দুরূহ সাধনের দায় বহন করতে হবে একালের শিল্পীদের।

চোখের সামনে নতুন শিল্পভাষা তৈরির জন্যে অবনীন্দ্রনাথের পরীক্ষার ধারা দেখে নন্দলাল নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের কাজে এবং কথায় বিঘ্ন-বিপত্তির যে চেহারা ফুটে উঠত, তার মধ্যে প্রতিফলিত হত স্বদেশের ইতিহাসের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়ানো জটিলতার বিভিন্ন আয়তন। আর্ট স্কুলের প্রশিক্ষণের আওতায় হ্যাভেল কারুশিল্পী ঘরের ছেলেদের টেনে আনতেন। বোঝা যেত, দুস্থ দেশে শিল্পশ্রীময় কারু উৎপাদনের ক্ষীণধারা তখনও টিকে ছিল। বহু গুণী মানুষও ছিলেন। কিন্তু সমকালীন জীবনে তাঁদের গুণপনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। জনসমাজের ভেতর থেকে এইসব কারু উৎপাদনের চাহিদা ক্ষয়ে এসেছিল। মুঘল আমলের শেষ দিকেই ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছিল। দেশের কৃষিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন এল না। শিল্পবিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। দেশময় পণ্য উৎপাদনের, কারিগরির প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি অচল অবস্থায় মজে এল। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের সম্ভাবনাহীন এই অসাড়তা রাজনৈতিক কাঠামো ছত্রখান করে দিল ক্রমে। দেশের মধ্যে আর প্রতিরোধের শক্তি জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কোনো-না-কোনো প্রবল য়ুরোপীয় শক্তির আঘাতে পরাভব মেনে নেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অবমানিত, লুণ্ঠিত, অবসন্ন ভারতবর্ষের বৈষয়িক এবং মানসিক জীবনে সুচির বিবশ দশা ঘনিয়ে এল। নিশ্চল অসাড় সমাজের ভেতর থেকে নতুন কোনো মূল্যজ্ঞান জাগতে পারে না কখনও। চিন্তাচেতনার গতি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় তাৎপর্যরিক্ত হয়ে যায়। দেশের শিল্পী এবং কারিগরদের পরম্পরাগত কুশলতা এই পরিবেশে উদ্দীপনা হারিয়ে লক্ষ্যহীন পুনরাবৃত্তিসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াল।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন ধরনের শিক্ষার যে সংকীর্ণ আয়োজন হয়েছিল, তার সুযোগ নিলেন কিছু উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শহুরে বাবু-ভদ্রজন। ঔপনিবেশিক উপযোগিতার মাত্রায় মাপা য়ুরোপীয় আধুনিকতার আরক সমাজের এই উপর স্তরের

মানুষের চেতনায় আলোর চেয়ে আঁধিই ছড়িয়েছিল বেশি। নতুন জমানার কর্ণধারেরা গোপন করেন নি যে, তাঁরা ইংরেজি সংস্কৃতির গৌরবে গরবি একদল বশংবদ দেশীয় সহযোগী তৈরি করতে চাইছেন। তাঁদের প্রত্যাশা মতো সাড়াও জাগল। আজ আমাদের চোখে এই জাগরণের করুণ স্ববিরোধ অনেকটাই স্পষ্ট। চাকরির শিকলি পরা "মুক্তমতি" আধুনিকদের দোটানায়, জীবনে মননে আত্মপ্রতারণায় রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সংহতি এবং সংকল্পের শুদ্ধতা আবিল হয়ে উঠত পদে পদে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সেই বিসংলগ্ন পরিবেশে পশ্চিমি ভব্যতার মোহে মজেন নি এমন চেহারা-চরিত্রের মানুষ খুব বেশি ছিলেন না। নতুন শহুরে স্থাপত্যে, ঘরবাড়ি সাজানোয়, পোশাক-আশাকে সাহেবিয়ানার কিম্ভুত রুচিতে সে আমলের নান্দনিক বিশৃঙ্খলার যে চেহারা ফুটে ওঠে, শিল্পশিক্ষা এবং শিল্পচর্চায় তার প্রভাব অনিবার্য ছিল। শিক্ষিত ভদ্রলোকের দোআঁশলা রুচির চাহিদা মেটানোর মতো কিছু শিল্পী তৈরির উদ্দেশ্য নিয়েই আর্ট স্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনসট্রাক্শন্স্-এর প্রতিবেদনে ১৮৭৬-৭৭ সালে স্পষ্টই বলা হয়, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য য়ুরোপের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে দেশীয় যুবকদের অবহিত করা এবং শিল্পে 'য়ুরোপিয়ান মেথডস অব ইমিটেশন' শেখানো। কর্তারা আশা করতেন এই বিদ্যা নিয়ে দেশীয় শিল্পীরা ভারতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের, স্থাপত্য কীর্তির, নানা জাতের মানুষের এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিরূপ আঁকায় দক্ষ হয়ে উঠবে।* "কলোনিয়ল আর্ট"-এর পত্তন হবে এর ফলে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য সংস্থার মতোই এখানেও নকলনবিশ তৈরিরই আয়োজন করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের কোনো সংস্রব ছিল না, য়ুরোপের আর্ট অ্যাকাডেমির উঁচু মান অনুসরণ করারও কোনো অভিপ্রায় ছিল না। সরকারি শিল্পশিক্ষা-নীতির এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে হ্যাভেলের উদ্যোগ খুবই বিস্ময়কর মনে হবে।

তখনকার 'কালেজি শিক্ষা'-র বিন্যাসটি খাড়া করা হয়েছিল বেন্থাম-কোঁৎ-মিলের উপযোগিতাবাদের তত্ত্বভিত্তির উপরে। ভদ্রলোকের ছেলেদের ধ্যানধারণার কাঠামো তৈরি হতো ইউটিলিটেরিয়ন দর্শনের ছকে। আমাদের স্বদেশভাবনায়, ধর্মভাবনায়,

---

* "The object of the institution was to give the native youth of India an idea of men and things in Europe both present and past, not that they might learn to produce feeble imitations of European art, but rather that they might study European methods of imitation and apply them to the representation of natural scenery, architectural monuments, ethnical varieties, and national costumes, in their own country." *C-G-C-A-C*, p. 12.

নন্দনভাবনায় এই মিল-বেন্থামি শিক্ষার জের চলেছে অনেক দিন। 'ক্যাপিটাল্' গ্রন্থে মার্কস বলেছিলেন,

> আধুনিক দোকানদার, বিশেষ করে ইংরেজ দোকানদারকে বেন্থাম মনে করেন স্বাভাবিক মানুষ। উদ্ভট এই স্বাভাবিক মানুষের কাছে এবং তার জগতে যা-কিছু দরকারি তাকেই মনে করেন পরম উপযোগী। এই মাপকাঠি তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের উপরে প্রয়োগ করেন।*

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পরাক্রান্ত মনীষীও এই বেনিয়া দর্শনের মোহ কাটাতে পারেন নি, পরিণত বয়সে "অনুশীলনতত্ত্ব" নামে এর দেশি সংস্করণ বানিয়েছেন। উপযোগিতাবাদ-প্রত্যক্ষবাদ (এমপিরিসিজ্‌ম) থেকেই শিল্পে বাস্তববাদ অনুকৃতিবাদের উদ্ভব, সুতরাং এই উপনিবেশের সরকারি শিল্পশিক্ষায় 'য়ুরোপিয়ান মেথড্‌স অব ইমিটেশন' চালানো কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু য়ুরোপের নন্দনভাবনায় তখন রোমান্টিক বিদ্রোহে কোঁৎ-প্রুধঁর দর্শনে পুষ্ট বাস্তববাদের ভিত্তি টলে গেছে। খোদ ইংলন্ডেও তখন ব্লেক-টার্নারের ছবির নতুন ভাষায়, কোলরিজ-ওয়ার্ডসওয়ার্থের নন্দনভাবনায়, অন্তত শিল্পসাহিত্যের এলাকায়, মিল-বেন্থামের প্রতিপত্তি বিধ্বস্ত। আমাদের মধুসূদন দত্তর প্রিয় কবি ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। বিদ্যাসাগর মশায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার বই দেখা যায়। নানান বিকার বিকৃতির আবর্জনার মধ্যেও গোড়া থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুদ্ধতর নান্দনিক মান আনার পরীক্ষা চলেছে। এই ধারায় রুচির প্রগতি পূর্ণতর চরিতার্থতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকিরণে। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিল্পে আদর্শ বিভ্রাটের জের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্তও মেটে নি। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কাজে এবং হ্যাভেলের শিল্পশিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগে প্রথম সচেতন প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা দিল। দুজনের সহমর্মিতায়, সহযোগিতায় একটা বাঁক এল আমাদের শিল্পচর্চায়। নন্দলাল বসুর প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল এঁদেরই তত্ত্বাবধানে।

১৮৯৬-এর জুলাই থেকে ১৯০৬-এর জানুয়ারি অবধি হ্যাভেল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে ভারতীয় অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন,

> ভারতবর্ষকে আমরা সভ্য করে তুলছি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং এমন কী শিক্ষিত ভারতীয়দেরও বোঝাতে পেরেছি যে তাঁদের নিজস্ব শিল্প বলে

---

* "... he takes the modern shopkeeper, especially the English shopkeeper, as the normal man. Whatever is useful to this queer normal man, and to his world, is absolutely useful. This yard-measure, then he applies to past, present, and future." *Capital*, vol. 1, Moscow 1954. p. 609 F. N.

কিছুই নেই, যদিও তেমন শিল্পের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রচুর ও বিশাল প্রমাণ রয়েছে, বস্তুত প্রাচীন বৃটিশ শিল্পের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। চব্বিশ বছর আগে ভারতীয়দের শিল্পকলা শেখানোর কাজে আমায় পাঠানো হয়েছিল, আমার সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে তাদের শিখিয়ে এবং নিজেও শিখে এই বিস্ময়ে ভরপুর হয়ে ফিরেছি— অ্যাংলো স্যাক্সন মানসিকতা এমনই সংকীর্ণ যে য়ুরোপের কাছ থেকে ভারতের যা শেখার তার চেয়েও অনেক বেশি আমাদেরই ভারতবর্ষের কাছে শেখার আছে এটা আবিষ্কার করতে এক শতাব্দীর বেশি সময় লেগেছে।*

হ্যাভেল আমাদের চেনা সাম্রাজ্যিক কলুষমুক্ত বিরল ইংরেজের একজন, পিয়ার্সন-এনড্রুজদের সগোত্র মানুষ। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ কলাভবনে 'হ্যাভেল হল' প্রতিষ্ঠা করে তাঁর উদ্দেশে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তাঁর কাজে এবং লেখায় যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ তাতে বোঝা যায়, হ্যাভেল মিল-বেন্থাম বিরোধী আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের শুদ্ধতর দৃষ্টি পেয়েছিলেন। সে দৃষ্টি হয়তো একটু বেশি ব্লেকপন্থী, মরমিয়া উপলব্ধির প্রত্যাশী। তবুও বেনিয়া দৃষ্টি-সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। তাই আর্ট স্কুলে তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সীমার মধ্যে প্রয়োজন ও উপযোগিতার দায়মুক্ত অবাধ শিল্পচর্চার, স্বাধীন পরীক্ষার পথে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের নতুন ভাষা উদ্ভাবনের সুযোগ তিনি অবারিত করে দিয়েছিলেন। ললিতকলার সঙ্গে সঙ্গে কারুকলাতেও নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। নতুন শহর পত্তনে, ঘরবাড়ি তৈরিতে, সাজানো গোছানোয় ভারতীয় স্থপতি কারুজীবীদের ডাকা হোক— সরকারের কাছে তিনি বার-বার এই আবেদন জানিয়েছেন। একটু আশ্চর্যই লাগে যে তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী আর্ট কলেজে প্রথা বিরোধী উদ্যোগে ওপরওয়ালারা বাধা দেন নি। বোধ হয় ঔপ-নিবেশিক প্রশাসনের ব্যাপক কর্মকাণ্ডে শিল্প ব্যাপারটা কর্তাদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি।

---

* "We have been civilising India···for more than fifty years and have succeeded in persuading educated Indians that they have no art of their own, though the evidences of its existence are many and great; indeed very much more extensive that those of ancient British art. Twenty-four years ago I was sent out to India to instruct Indians in art, and, having instructed them and myself to the best of my ability, I return filled with amazement, at the insularity of the Anglo-Saxon mind, which has taken more that a century to discover that we have far more to learn from India in art than India has to learn from Europe." —The New Indian School of Painting, *The Studio*, 15th July 1908, p. 108.

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর টিপ্পনী,

আমাদের শাসকেরা তখন যুদ্ধপূর্ব কালের রেশমি উদারনীতি ফলাতো এবং মিণ্টো-মর্লি (শাসন) সংস্কারের কারণে সিংহকে (লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন) আইন ও শৃঙ্খলার জিম্মাদারি দিয়েছিল ; শোভনতার খাতিরে সেই তারাই আর্ট স্কুলে প্রাচ্য-শিল্পের ঢুকে পড়ায় বাদ সাধে নি।*

এ উদারনীতির যুক্তি কি সত্যিই খুব টেকে ? অন্য কোনো সাধারণ শিক্ষার স্কুল-কলেজে এতটা পরিবর্তন আনা আদৌ সম্ভব হত মনে হয় না। বাধা আসতই।

হ্যাভেল বাঙালি সমাজের সঙ্গে যোগ রাখতেন। অনুভব করতে পারতেন, অন্তত যাঁরা কোনো-না-কোনো সৃষ্টিমূলক কাজে লিপ্ত তাঁরা স্বদেশের ঐশ্বর্যময় অতীতকে বুঝতে চান। দেশের মাটি থেকে, দেশীয় বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সংকটের বোধ ক্রমেই তীব্র হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের এই মানসিকতাকে বলা যায় জাতীয় আত্মপরিচয় খোঁজার ব্যাকুলতা। শিল্পকলায় দেশের পরিচয় জানার আগ্রহ তীক্ষ্ণ করে তোলায় হ্যাভেল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই সময়ে। অসুস্থ হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হল। অবনীন্দ্রনাথ অধ্যক্ষের কাজ চালাবার দায়িত্ব পেলেন। নন্দলাল এখানকার শিক্ষার্থী জীবনের বাকি অংশ অবনীন্দ্রনাথের অখণ্ড পরিপোষণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

স্কুলের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনে আক্ষেপ করা হয়েছিল, এখানে সংস্কৃতিবান্ ছেলে অল্পই দেখা যায়। সংস্কৃতিবান্ মানুষ বলতে অবনীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন ?

তখনকার ভদ্র সমাজে সংস্কৃতিবান্ বিবেচিত হতেন পশ্চিমি ভাবনাধারায়, পশ্চিমি আচার-ব্যবহারে পটু মানুষেরা— সে যতই খাপছাড়া হোক। একই আধুনিকতা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ভাবতেন এমন মানুষের কথা, যে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন, যে চলতি রুচির উপরে ওঠার জন্য সচেতনভাবে নিজের শক্তি প্রয়োগে কৃতসংকল্প। নতুন কালের শিল্পীকে তিনি দেশের মাটির উপরে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। স্কুলে দেশের সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশি ধারার শিল্পী পাটনার লালা ঈশ্বরী প্রসাদকে আর্ট কলেজে শিক্ষক করে এনেছিলেন।

---

* "Our rulers then were also sporting the woolly liberalism of the pre-war brand ; and having, due to the Minto-Morley Reforms, admitted Sinha to the custodianship of law and order, they could not, in decency, exclude the intrusion of "Oriental Art" into the Art School." — Sudhindranath Dutta, Jamini Roy, *Lonmgans Miscellany 1943*, Calcutta 1943 p. 128.

চেয়েছিলেন, হাতে কলমে কাজের ভেতর দিয়ে ছাত্ররা দেশি রীতির পরিচয় পাক। নন্দলাল ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে কাজ শিখেছিলেন। আর্ট গ্যালারির পুরানো ছবি দেখে অনুশীলনের সুযোগ ছিল। শিল্পের স্বদেশকে নন্দলাল এইভাবেই চিনতে শিখেছিলেন। এই স্বাদেশিকতার দিকে তাঁর ঝোঁকের মূলে অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চান নি। অন্ধ স্বদেশাভিমান অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না। নিজের কাজে এবং শিল্প বিষয়ে আলোচনায় তিনি একটি স্থির নীতি অনুসরণ করেছেন। মেনেছেন শিল্পীর মূল দায় তাঁর নিজের বর্তমানের কাছে। কালের গতি পেছনে ফেরানো যায় না। অতীতের কীর্তি আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। বর্তমানের দাবি মেনে প্রতিভাবান্ শিল্পীকে নিজস্ব পরম্পরার বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে হয়। নন্দলালকে তাই তিনি কোনো রীতিবদ্ধ শিক্ষায় বাধ্য করেন নি। নন্দলাল যদি বিশেষ কোনো প্রবণতার পরিচয় দিয়ে থাকেন সে তাঁর নিজেরই বিচারবুদ্ধির ফল।

৪

আর্ট স্কুলের ভেতরের পরিবেশের সঙ্গে বাইরের সামাজিক আলোড়নও নন্দলালের শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বে গাঢ় প্রভাব রেখে গেছে। ১৯০৫ সাল আধুনিক বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল। ১৯ জুলাই তারিখে সরকার বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদ জেগে উঠল। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল স্বাদেশিক চেতনার মূল উচ্ছেদ করা, কিন্তু এই চেষ্টার প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরেজের ন্যায়বিচার, ইংরেজ শাসনের সুফল সম্পর্কে শিক্ষিত ভদ্র-সাধারণের মোহ প্রবল ধাক্কা খেল। দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে দেশের সর্বায়ত জীবনে নিজেদের মেলাবার কথা বলে আসছিলেন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি জগতের সেই অগ্রণী পুরুষেরা সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেলেন। দেশ জুড়ে অরন্ধন পালন, রাখিবন্ধন, ছোটো বড়ো সভায় সব সম্প্রদায়ের মানুষের সমাবেশ যে বিপুল আবেগ জাগিয়ে তুলেছিল, সে অভিজ্ঞতা সত্যিই অভিভূত হবার মতো। কোনো সচেতন, সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে এই আলোড়নের তাৎপর্য সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ -রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীদের মতো নেতা অনুভব করেছিলেন, এ জাগরণকে সংহত করা দরকার, গঠনমূলক কাজের পরিকল্পিত ধারায় এগিয়ে নেওয়া দরকার। তাঁদের চেষ্টা বা রাজনৈতিক স্তরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা— কিছুই স্থায়ী হল না। নানা স্বার্থের টানাপোড়েনে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে এমন উদ্দীপনাও ক্রমে স্তিমিত, অবসিত হয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের

সীমাবদ্ধতা, রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে বিচার-বিতর্ক এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু এই আন্দোলন আধুনিক ভারতে শিক্ষিত ভদ্রস্তরের মানুষের সঙ্গে দেশের জনজীবনের বিচ্ছেদের বাস্তবতা যে প্রকট করে তুলেছিল এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। দেশের নামে ডাক দিলেই দেশের মানুষের মনে সাড়া জাগে না, কারণ, আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ভাষাই বদলে দিয়েছে। শিকড়ের সংলগ্নতা ফিরে পাবার শ্রম ও নিষ্ঠা ছাড়া নিজেদের স্বদেশে মেলাবার অন্য কোনো সরল উপায় নেই— চক্ষুষ্মান মানুষেরা এটা মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন। পশ্চিমি আধুনিকতার গৌরব ক্রমেই মানুষকে স্বদেশে পরবাসী করে তুলেছে, দেশের মাটির সঙ্গে এ আধুনিকতার যোগ নেই— এই উপলব্ধি অন্তত যাঁরা কোনো সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত তাঁদের বোধ-চৈতন্যে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তত্ত্ব হিশেবে হ্যাভেল বা অবনীন্দ্রনাথ যা বলতেন স্বদেশি আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে নন্দলাল তার সত্যাসত্য উপলব্ধি করলেন।

আর একজন ভারতপ্রেমী গভীরভাবে টানতেন নন্দলালকে। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। নিরবয়ব আবেগ বা নীহারিকার মতো অস্পষ্ট সব ভাবনাপুঞ্জকে তিনি যেমন সংহত রূপ দিতে পারতেন, তেমনি সে সংকল্পগুলি অসীম চারিত্রশক্তিতে কাজে রূপায়িত করতেন। স্বদেশি যুগে তিনি অফুরন্ত উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠেছিলেন। আইরিশ রক্তের পরাধীনতার জ্বালায় ভারতবর্ষের মূল সংকট তিনি অভ্রান্তভাবে ধরতে পারতেন। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের মূল দ্বন্দ্ব এড়িয়ে গিয়ে যে আধুনিক ভারতীয় কোনো সমস্যারই আসান হতে পারে না, শিল্পকলারও নয়, একথা তিনি বারবার বলেছেন। সূত্রের মতো করে বলেছেন, স্বাধীন দেশেই শুধু শিল্পের বিকাশ সম্ভব।* নন্দলালের সঙ্গে সম্ভবত আর্ট স্কুলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেদিন তিনি নন্দলালের করা 'সত্যভামা ও কৃষ্ণ', 'দশরথের অন্তিমশয্যা' আর 'কালী'র একটি ছবি দেখে খুব সমালোচনা করেন। তার পর থেকে নিবেদিতার কাছে নন্দলালের নিয়মিত যাওয়াআসা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে ছবি নিয়ে, শিল্পের সমস্যা নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন নন্দলাল। নন্দলালের ধারণা, নিবেদিতা শিল্পে স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে যা-কিছু বলতেন সেসব তত্ত্বের ইঙ্গিত তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে পেয়েছিলেন; বিবেকানন্দের শিল্পরুচিতে আবার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু আঁকা-গড়ার কাজ জানতেন। বাংলা ছবির একটি সংগ্রহও তাঁর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মণ্ডলীতে যাওয়া-আসায় নন্দলাল তাঁর সূক্ষ্ম অবলোকন সম্পর্কে কিছু ধারণা পেয়েছিলেন। মানুষের চোখে, শরীরের গড়নে, চরিত্র-প্রকৃতি কী ভাবে ধরা যায়— শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বলতেন। "স্বামী বিবেকানন্দ

* "Art can only be developed by nations that are in a state of freedom." I. O. T. E. Introduction, p. 3.

প্রমুখ সকল ভক্তগণেরই শারীরিক গঠন পরীক্ষা করে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে দিয়েছিলেন।" (শি-শি-ন, পৃ. ৪২)। অধ্যাত্ম ভাবুকতার আবেশ সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে এবং কথায় যে স্বাভাবিক বিচক্ষণতা প্রকাশ পেত শিল্প প্রসঙ্গেও সেই মনেরই পরিচয় মেলে। স্বভাবে নিখাদ দেহাতি এই মানুষটির ভালো লাগত বাংলা পট। দেশি ছবির প্রশংসা করতেন। তাঁর মুখের সব কথাই বিবেকানন্দ গভীর তাৎপর্যে মানতেন। গুরুর সহজ কথাকে, সহজ উপলব্ধিকে বুদ্ধির বাঁধুনিতে শক্ত কাঠামোয় দাঁড় করিয়ে দিতেন। শিল্পে দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বিবেকানন্দ যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন তার মূল প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে এসেছিল ভাবাই যায়। বিশেষ করে দেশের সাধারণ মানুষের শিল্পরুচি নিয়ে, ঘরে ঘরে সামান্য বস্তুতেও শিল্পশ্রীর নজির নিয়ে বিবেকানন্দর গৌরববোধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিই প্রতিফলিত হত। একটি চিঠিতে নন্দলাল লিখছেন,

> স্বামীজীর ব্যক্তিগত নিজস্ব একটি পুরুষজনোচিত বোল্ড আইডিয়াল ছিল যা সিস্টার নিবেদিতা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সিস্টারের মুখে কথা শুনে মনে হত স্বামীজীর বীরভাবাপন্ন ও নির্ভীক কথা শুনছি।— (শি-শি-ন, পৃ. ২৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দকে নন্দলাল দেখেন নি। নিবেদিতার কাছে এসে তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলিত কিরণ থেকে তাপ এবং আলো আহরণ করেছেন।

ত্যাগ এবং দুঃখ বহনের সততায় নিবেদিতা এক প্রবল নৈতিক কর্তৃত্বের অধিকার অর্জন করেছিলেন। নন্দলালেরই উক্তি, "তাঁর কথা অমান্য করা অসম্ভব ছিল।" সমকালীন বাংলার রাজনীতি ও ধর্মভাবনার উপরে যেমন, তেমনি শিল্পের এলাকাতেও নিবেদিতার অভিভাবকতা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁর প্রভাবে নন্দলালের মানসিক গড়নে দুর্গত স্বদেশের মর্যাদার দায়বোধ যেমন ওতপ্রোত হয়ে ওঠে, তেমনি এক অধ্যাত্ম-উন্মুখতা অর্সায়। নন্দলাল সাক্ষাৎ রাজনীতিতে নিজেকে জড়ান নি কখনও, সাধন-ভজনেও মাতেন নি। শিল্পকাজের মধ্যেই তিনি স্বদেশের দায় এবং আত্মিক শুদ্ধাচারের দায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন। এই দায়বোধের জন্যই শিল্পকে তিনি কখনও শৌখিন চর্চার বিষয় ভাবেন নি। ছবি আঁকা তাঁর কাছে হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের উপায়। আবার নিজের মধ্যে নিহিত সামর্থ্যের অনাবিল, পরিপূর্ণ প্রকাশেরও উপায়। অনেক পরে নন্দলাল নিজেই বলেছিলেন,

> হাঁ, আমার ছবিতে একটা লড়াই করার ও চ্যালেঞ্জের ভাব কোথাও ২ প্রকাশ পেয়েছে···। এর কারণ আমার ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌-এর ভাব।—(দৃ-স্থ, পৃ. ২৮৬)।

আর ধর্মকর্ম জপতপের দিকে যেতে মহেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দর মেজো ভাই) তাকে এই বলে নিষেধ করেছিলেন যে,

> তোমরা দুটো করতে যাও কেন? একটাই তো জিনিশ। কেউ মালা নিয়ে জপ-

ধ্যান করে, কেউ তুলি নিয়ে অপধ্যান করে।— (শি-শি-ন, পৃ. ১০)।
শিল্পীর ধ্যান চোখ মেলে, ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে চরাচরের রূপে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া। এ সাধনে কোথায় পৌঁছয় শিল্পী ?

নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পরিপূর্ণ কলসের মতো। পরিপূর্ণ কলস একটু হেলিয়ে দিলেই যেমন জল ছল্‌কে পড়ে, তেমনি কোনো কারণে মন একটু নাড়া পেলেই মনের অক্ষয় রসানুভূতি রূপানুভূতি ছল্‌কে পড়ে হবে— ছবি, মূর্তি, নৃত্য, কবিতা, গান।—(দৃ-স্থ, পৃ. ৪৪)।

স্বদেশি যুগের সেই ভরাকটালের মধ্যে নন্দলাল সত্তাপরিচয়ের সংকট পেরিয়ে এলেন। দেশের মধ্যে চেতনার যে নতুন উল্লাস সেদিন দেখা দিয়েছিল, সেই আলোয় তাঁর শিল্পী সত্তার উন্মেষ হল। নিজেকে চিনলেন। প্রতিভার স্বাদ পেলেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক থেকে সেদিনের স্বাদেশিক উদ্যোগের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন অবশ্যই আছে। কিন্তু দেশের জীবনে অমন বড়ো আলোড়ন সৃজনী প্রতিভাময় মানুষকে আত্মোপলব্ধিতে যে গভীর সাহায্য করতে পারে, সংকল্পের সংহতি এনে দিতে পারে, নন্দলালের শিল্পীজীবন এর দৃষ্টান্ত। জটিল ভারতীয় বাস্তবতায় সেদিন শিল্পের স্বদেশকে চেনা এবং আধুনিক উত্তরণের পথ তৈরি খুব দুরূহ সাধন ছিল। সচেতন ভাবে নন্দলাল এ দুরূহ সাধনের দায় নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। নিজেকে কঠিন সংকল্পে বেঁধেছিলেন— যার বিস্তার তাঁর দীর্ঘ জীবনের নিরলস কাজের ধারায় দেখতে পাই।

৫

আধুনিক শিল্পীমনের মূল অভিজ্ঞান আত্মসচেতনা। পরিস্থিতি অনুযায়ী দেশে দেশে আত্মসচেতনতার রূপ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। য়ুরোপের কোনো দেশের পরম্পরা যে সংকটপর্ব অতিক্রম করে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে ভারতবর্ষে বা অন্য-কোনো প্রাচ্য দেশে তার সমান্তরাল পরিস্থিতি খোঁজা বৃথা। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল সম্পর্কে সচরাচর যেসব রায় দেওয়া হয়, তাতে প্রকাশ পায় ইতিহাসের এই হেরফের সম্পর্কে উদাসীন এক ধরনের তুলনার ঝোঁক। এঁদের শিল্পী জীবনের সূচনা কালের সংকট বোঝার দায় যেমন এড়িয়ে যাওয়া হয়, তেমনি মনে রাখা হয় না দীর্ঘ জীবনে এঁদের কাজেও বিকাশ ও বিস্তারের বিভিন্ন পর্ব আছে। ১৯০৫-এর নন্দলাল এবং ১৯৫০-এর নন্দলাল এক ছিলেন না। এই বিকাশের পাশে অন্য শক্তিমান শিল্পীদের আবির্ভাব এবং তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অবহিত থাকলে তবেই সামগ্রিকভাবে আমাদের আধুনিক শিল্পের বিবর্তন স্পষ্ট বোঝা যায়।

নন্দলালকে বুঝতে হয়েছিল, ছবির ফ্রেমের মধ্যে যে সমাধান আয়ত্তে আনতে চান তার বাধাবিপত্তির জড় চারিয়ে আছে স্বদেশের ইতিহাসের অস্বাভাবিকতায়। বর্তমানের দুর্গত বাস্তব স্বদেশ এবং পূর্বপুরুষের মহৎ শিল্পকীর্তির ঐশ্বর্য— বিসংগত এ দুটি অভিজ্ঞতার তাৎপর্য না বুঝে কোনো কাজে সফলতা ভারতীয় আধুনিকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। নন্দলালের আত্মসচেতনতা তাঁকে এই বিসংগত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। আধুনিক নাগরিক রুচি-বিকারের আবহাওয়ায় বড়ো রকমের কোনো সামাজিক সমর্থন ছাড়াই আত্মস্থ অভিনিবেশে এক দীর্ঘ কঠোর অন্বেষার জন্য নিজেকে তিনি প্রস্তুত করেছেন। শিল্পে রুচির নতুন মান আনার জন্য দেশীয় পরম্পরার ইঙ্গিত নির্দিষ্টভাবে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর চেহারায় বা স্বভাবে কোনো আধুনিকতার চেক্‌নাই ছিল না, কিন্তু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভারতীয় আধুনিকের সমস্যা স্পষ্ট দেখতে পেতেন। স্থির বুঝেছিলেন, ভারতীয় আধুনিক শিল্পীর পক্ষে রেনেসাঁস-উত্তর য়ুরোপীয় শিল্পের মানবিক কল্পনার বিরাট ব্যাপ্তি এবং অন্তহীন পরীক্ষার বিস্ময়কর শক্তি আয়ত্ত করার কোনো সহজ উপায় নেই। পশ্চিমি শিল্পের কোনো একটা ধারার বা কোনো বিশেষ আঙ্গিকের বিচ্ছিন্ন অনুশীলনে আন্তর্জাতিক-আধুনিক হয়ে ওঠার অসম্ভব দুরাশা তাই তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নি। তাঁর প্রখর সচেতন শিল্পীমনে নিশ্চিত এই সিদ্ধান্ত জেগে উঠেছিল যে, আধুনিক যুগের আহ্বানে আত্মমর্যাদা নিয়ে সাড়া দেবার জন্য নিজেদেরই পরম্পরা থেকে পাওয়া উপাদানে আধুনিক শিল্পভাষা গড়ে নিতে হবে। এ দুরূহ সাধন এড়িয়ে ভারতীয় আধুনিক শিল্পীর মুক্তি নেই।

হ্যাভেল বা আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর মতো প্রাজ্ঞ তাত্ত্বিকেরা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ধারা উপধারা, রূপগত বৈশিষ্ট্য এবং মরমিয়া আধ্যাত্মিক আবেদন সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছিলেন। এ থেকে প্রেরণা পেলেও শিল্পী হিশেবে নন্দলালের অন্বেষণের প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি জানতেন, মহৎ আদর্শ বা গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থাকলেই মহৎ শিল্প সৃষ্টি হয় না। সংকল্পনা থেকে সৃষ্টির চরিতার্থতায় উত্তরণ শিল্পীর পক্ষে কঠিন তিতিক্ষাময় সাধন। উপকরণ, করণ এবং প্রকরণজ্ঞানের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে শিল্পসৃষ্টির সফলতা অর্জন করতে হয় শিল্পীকে। যিনি আস্বাদন করছেন, কোনো শিল্পবস্তু তাঁর মনে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি জাগাতে পারে, মরমিয়া আবেগে তিনি অভিভূত হতে পারেন। কিন্তু শিল্পীর অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন। প্রতিপদে তাঁকে উপকরণ-বস্তুর বাধা অত্যন্ত সতর্কভাবে অতিক্রম করতে হয়। ধারণার অন্তর্গত রূপকল্পটি বস্তুর অবয়বে আরোপের জন্য মন ও স্নায়ুর অখণ্ড একাগ্রতায় শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। চিত্রকর বা ভাস্কর তুরীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তুলি বা ছেনি হাতে নেন, সেই মুহূর্তেই শুরু হয় এক বাস্তব লড়াই। বস্তুকে পর্যুদস্ত, বশীভূত করে

রূপান্তরিত করার লড়াই। এই বাস্তব রূপায়ণ পদ্ধতিতে অতীন্দ্রিয়তার কোনো ভূমিকা নেই। ভারতশিল্পে আধ্যাত্মিকতার বুলি আমাদের শিল্পীদের অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। শিল্পের ফলিত জ্ঞানের গুরুত্ব তাঁরা অনেকেই বোঝেন নি। কিন্তু নন্দলাল ছিলেন একেবারেই ভিন্ন ধাতের মানুষ। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকীর্তি দেখতে গেছেন। ছাত্র বয়সেই (১৯০৮) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মূল ধারাগুলি সম্পর্কে তিনি গভীর সাক্ষাৎজ্ঞান অর্জন করেন।

তুলনামূলকভাবে আমাদের প্রাচীন শিল্পে ছবির চেয়ে ভাস্কর্যের ঐশ্বর্য অনেক বেশি। ভাস্কর্যের নির্মাণগত বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তির মুদ্রা, অলংকরণ রীতি অনুশীলন ভিন্ন শিল্পে ভারতীয় প্রতিভা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান সম্ভব নয়। নন্দলালের ধারণা হয়েছিল, প্রাচীন ভারতের ছবিতে মূর্তিশিল্পের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। একই নান্দনিক আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে দুই ভিন্ন মাধ্যমে। নিজে ভাস্কর না হয়েও তাই তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের করণ-কৌশল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার দেখেছেন, প্রখর রোদে গামছা মাথায় দিয়ে নন্দলাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্দির ভাস্কর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ নকল করছেন। (ভা-শি-আ-ক, পৃ. ১৯৩)। এই নিবিষ্ট অনুশীলনে তিনি প্রাচীন ভাস্কর্যের তালমান, আকৃতি-প্রকৃতি, মুদ্রা এবং অলংকরণের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করেছিলেন। অতীত ভারতের শিল্পমহিমা আর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ভাবালুতা এবং এই প্রত্যক্ষ চর্চায় অনেক তফাত। ধ্রুপদী নন্দনভাবনার মর্ম এবং রূপায়ণগত শিল্প-আঙ্গিক ও কারিগরি কৌশল বুঝবার জন্য অখণ্ড নিষ্ঠায় তিনি সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করতেন। প্রাচীন শিল্পীদের কাজে রীতিবদ্ধ শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনেও সৌন্দর্যের চূড়ান্ত প্রকাশ তাঁকে মুগ্ধ করত। মূর্তি রচনায়, অলংকরণে নকশার সুনির্দিষ্ট বাঁধুনি মেনেই তাঁরা প্রকাশ করতেন বাস্তব জীবনের এবং প্রকৃতির প্রাণছন্দ। হ্যাভেল— কুমারস্বামীদের মতো পণ্ডিত ভারত-শিল্পের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যখন মরমিয়া তত্ত্ব গড়ছিলেন, সেই সময়ে নন্দলাল তাঁর সৃষ্টিময় চৈতন্যের সামর্থ্যে ভারতশিল্পে শাস্ত্রীয় বাঁধন এবং জীবনমুখী মুক্তির দ্বৈতাদ্বৈত নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতশিল্পের নির্মাণগত দক্ষতার দিকই বিশেষ করে তিনি বুঝতে চাইতেন। সর্বায়ত জীবনের অভিব্যক্তির মহিমা উপলব্ধি করতেন। তাই, এমন কী মিথুন ভাস্কর্য সম্পর্কে বললেন,

> কেবল নীতি বা আদর্শ দিয়ে আর্ট হবে না। সাধুর এ রাজ্যে প্রবেশাধিকার নেই, ঋষির আছে।…কণারকের যে বদ্ধকাম মূর্তি আছে, কামকাজ চলছে অথচ কামভাব নেই, মুখে, চোখে, দেবভাব রয়েছে।…Moralist হলে শিল্প rigid হয়ে যাবে, fossil হয়ে যাবে।— (শি-শি-ন, পৃ. ৬০)।

সাধারণ দর্শক প্রাচীন মন্দির ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে অভিভূত হন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু খোঁজেন রূপের আড়ালে দার্শনিক বা ধর্মীয় উপলব্ধির স্বরূপ। কিন্তু শিল্পী নন্দলাল দেখতে যেতেন অন্য জিজ্ঞাসা নিয়ে। তাঁর আগ্রহ, বিশেষ শিল্পীরূপটি গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে। স্থাপত্যটি রগোটা গড়নে যে কল্পনা-মহিমা রূপবদ্ধ হয়ে আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাতগত সুষম বিন্যাসে শিল্পীরা কীভাবে ধাপে ধাপে সেই রূপ নিষ্পন্ন করেছিলেন তা বোঝার জন্য নন্দলাল, বিপরীত পদ্ধতিতে, গঠিত শিল্পরূপটি গড়ে তোলার পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করে রূপ নির্মাণে ভারতীয় প্রতিভার তাৎপর্য আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করতেন। সামগ্রিক একটি কাজে যে সুমহান ছন্দ ফুটে উঠছে তাতে অজস্র ছোটো বড়ো টুকরো কাজ মূল ছন্দের নিয়ন্ত্রণে সঙ্গতি পাচ্ছে কীভাবে, নিজের করা নকলে সেই রহস্য ভেদ করতে চাইতেন। প্রতিটি অলংকরণের, উৎকীর্ণ অজস্র মূর্তির ভঙ্গিমার রেখারূপ বিশ্লেষণ করে দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করেন, প্রাণছন্দের অন্তর্গত শৃঙ্খলায় সব অংশ সংহত হয়ে ওঠে ভারতীয় শিল্পীদের হাতে। ভারতীয় ছবিতেও ঠিক এই পদ্ধতিই তিনি লক্ষ করেছেন এবং বুঝিয়ে বলেওছেন নিজের মতো করে।

আর্ট স্কুলের গ্যালারিতে দেশি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা এবং জন গ্রিফিথ্‌সের বইয়ের অজন্তার ফ্রেস্কোর কপি (১৮৭২-৮৫-র মধ্যে করা) অনুশীলন থেকে অজন্তায় যাবার আগেই ভারতীয় ভাস্কর্য এবং ছবির দৃষ্টিভঙ্গিগত, ছন্দোরীতিগত মিল সম্পর্কে নন্দলাল নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ১৯০৯ সালে হ্যাভেলের বন্ধুপত্নী শ্রীমতী সি. জে. হেরিংহামের সঙ্গে অজন্তায় যাবার আগে আঁকা তাঁর কোনো কোনো ছবিতে অজন্তার রীতি এবং ভাববস্তুর প্রভাব দেখা যায়। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ অবধি পাঁচ বছরে নন্দলাল নিজেকে ভারতশিল্পের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন করে তোলার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। শুধু শিল্পসামগ্রী অনুশীলন নয়, সেসব জায়গার মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব রূপ দেখা এবং স্কেচ করা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জীবনের যে বাতাবরণ ভাস্কর্যে, ছবিতে দেখতে পেতেন তার বাস্তব উৎস খোঁজার আগ্রহে স্থানীয় গাছপালা, ঘরবাড়ির ছাঁদ, পোশাকপরিচ্ছদ বা দৈনন্দিন কাজের জিনিশপত্র খুঁটিয়ে দেখতেন। শিল্প ও বাস্তব জীবনের তুলনামূলক অনুশীলনে তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ভারতীয় শিল্পে রীতিবদ্ধ প্রকাশভঙ্গি আছে, কিন্তু সেই শৈলী গড়ে উঠেছে জীবন যাপনের বাস্তব রীতি-পদ্ধতির ভিতের উপরে। রীতিবদ্ধ প্রকাশভঙ্গি কোনো অবচ্ছিন্ন— অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্ট কল্পনার ফল নয়, বাস্তব অব-লোকনেরই শুদ্ধতর অভিব্যক্তি। এই উপলব্ধিতে নন্দলালের কাছে ভারতশিল্প জীবনপ্রবাহে সংলগ্ন অত্যন্ত কাছের বস্তু হয়ে উঠেছিল। পুথিপড়া বিদ্যায় শিল্পের স্বদেশকে এমন নিবিড়ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না। গুরু ধরে বসে থাকলেও

পেতেন না।

১৯০৯-এ তাঁর অজন্তায় যাবার সুযোগ হল। নিবেদিতার নির্দেশে শ্রীমতী হেরিংহামের জন্য ছবি নকল করে দেবার কাজ নিলেন। অজন্তার বিরাট আকারের কম্পোজিশন এবং অলংকরণ নকল করার অভিজ্ঞতায় ভারতীয় শিল্প বিষয়ে ইতি-মধ্যে অর্জিত বোধ আরও পরিণত হয়। ছবিতে ভাস্কর্যের গুণ আনা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তাঁর নিজের উক্তি,

> অজন্তায় পাশ-ফেরানো মুখ বা ড্রয়িং (profile) কম। তুলনায় রাজপুত মোগল আর মিশরে অনেক বেশি। কেন? ভারতের ঝোঁক ভাস্কর্যে, in the round দেখাই অভ্যাস ও রুচি। (শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত ধৃত উক্তি)।

শ্রীমতী হেরিংহামের দলে প্রথমবারে অজন্তায় কাজ করেছিলেন অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কে. ভেঙ্কটাপ্পা এবং হায়দ্রাবাদের সৈয়দ আহ্‌মেদ ও ফজলউদ্দিন কাজি। আর-সকলের কাছে কপি করা যেন নিছকই ফরমায়েশি কাজ ছিল। এক নন্দলালই নিজের তত্ত্ব সংগঠনে এবং ব্যক্তিগত স্টাইলের বিকাশে এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করলেন। অবনীন্দ্রনাথের অজন্তার কাজ ভালো লাগে নি, রবীন্দ্রনাথেরও না। নন্দলাল অজন্তার অভিজ্ঞতায় ভারতীয় ভাস্কর আর চিত্রকরের কাজে গভীর মিল দেখতে পান। অজন্তার এপিক কোয়ালিটি তাঁকে অভিভূত করে। দেওয়াল ঠাসা কাজ রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। ওতে একটুও কোনো ফাঁক নেই, আকাশ নেই। নন্দলালের উপলব্ধি: "দৃশ্যত ফাঁক নেই অবকাশ নেই অজন্তায়, বাগ-গুহায়, কণারকে বা দক্ষিণী মন্দিরের ভাস্কর্য কলায়। ফাঁক রয়েছে ভিতরের দিকে।" বাইরের আকাশ দেখানো হয় নি অজন্তার কাজে, আছে মনের আকাশ। "একটা শান্তি ও সমতা সর্বত্র আছে।" "অজন্তার ছবিতে মহাকাব্যের ভাব (epic quality)—তার যে ঐক্য (unity) তা গতির ব্যঞ্জনায় (movement-এ)।" (দৃ-স্ম, পৃ. ৩০০-০১)।

চিরায়ত শিল্পের ধ্রুপদী মর্যাদা পেয়েছে যেসব সৃষ্টি, আধুনিকেরা তার মর্ম নিজের প্রয়োজনের দিক থেকেই বিচার-বিবেচনা করেন। গ্রহণ বর্জনের সিদ্ধান্ত একান্ত ব্যক্তিগত। যেমন, মুঘল-কলমের কাজ অবনীন্দ্রনাথকে যেভাবে আবিষ্ট করত তেমন-ভাবে কখনও নন্দলালকে টানে নি। আবার, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ অজন্তা, মুঘল বা রাজপুত বা বিশেষ কোনো ভারতীয় রীতি থেকে কিছু নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের কাজে বরাবর মিনিয়েচারের ধাঁচ রয়ে গেছে। এক শেষ পর্যায়ের চণ্ডীমঙ্গল-কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের ছবি ভিন্ন সর্বত্র তুলির সূক্ষ্ম খেলার মেজাজ। মাপে বড়ো পট ধরতে অবনীন্দ্রনাথ আগ্রহ বোধ করেন নি। বড়ো মাপের কম্পোজিশনের সংঘাত, তীব্রতা তাঁকে টানে নি। মন্দির ভাস্কর্য অনুশীলনের অভিজ্ঞতার পরে অজন্তার বিরাট ম্যুরাল ধরে ধরে কপি করার অভিজ্ঞতায় নন্দলালের কল্পনা কিন্তু ভিন্ন আদর্শের

পথে গেছে। ধ্রুপদী শিল্পের নির্মাণগত কুশলতায়, কারিগরি দক্ষতায়, রীতিবদ্ধ চর্চার আরোপিত সংযমে নন্দলাল গভীর আকর্ষণ বোধ করলেন। এই চর্চায় গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য বিশেষ কিছুই পান নি। বরং ভারতীয় ভাস্কর্য সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের মনে যথেষ্ট দ্বিধাই ছিল। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ভারতশিল্পে মূর্তি'র (প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী', পৌষ-মাঘ ১৩২০) ভূমিকায় শাস্ত্র-শাসিত শিল্পের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। অন্যত্র বলেন, প্রাচীন ভারতের শিল্পীদের সুকুমার মনোবৃত্তির অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ মতো রেখাগণিত আর সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। "রাজমন্দিরের মতো বা তেত্রিশ কোটি মূর্তির বত্রিশ সিংহাসনের মতো" স্তূপাকার তাঁদের শ্রমের ফলকে যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ মনে করার কারণ নেই। ("পথে পথে", 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)। ভাস্কর্যে ভারতীয় কীর্তি সম্পর্কে নন্দলাল এবং অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবলোকনেও অনেক তফাত। গৃহগত অবনীন্দ্রনাথ সুযোগ মতো কিছু নমুনা দেখে অতীতের শিল্পরীতির মর্ম বুঝে নিতেন। কিছু-বা গ্রহণ করতেন, কিছু এড়িয়ে যেতেন মন টানতো না বলে। সেখানে নন্দলাল দেশময় ঘুরে ঘুরে ছড়ানো শিল্পকীর্তির বিভিন্ন দিক ভেঙে ভেঙে অনুশীলন করেন, তার করণ-কৌশল অনুপুঙ্খ আয়ত্ত করেন। দুজনের মেজাজ এবং পদ্ধতি আলাদা। তখনকার অন্য তরুণ শিল্পীদের ভারতশিল্প সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা এবং তাৎপর্য-বর্জিত ভাবালুতার পাশে নন্দলাল কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত ব্যাপক সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় বিশেষজ্ঞের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

৬

শিল্পী জীবনের এই প্রথম পর্বে (১৯০৫-১৯০৯) তিনি কী ধরনের ছবি করেছিলেন ?

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সহযোগিতায় নন্দলালের ছবির একটি পূর্ণতর তালিকা তৈরি করেছেন ('ভারতশিল্পী নন্দলাল', প্রথম খণ্ড, ১৯৮২)। তালিকাটিতে এই সময়ের প্রায় চল্লিশটি পূর্ণাঙ্গ কাজের বিবরণ পাচ্ছি। এর সব এখন আর দেখবার উপায় নেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রায় সব ছবিই পৌরাণিক। রামায়ণ, মহাভারতের প্রসঙ্গ বেশি। কিছু বৌদ্ধ ও চৈতন্য প্রসঙ্গ। আকার ৮″ × ৬″ থেকে ১৮″ × ১২″-র মধ্যে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবই ওয়াশের কাজ। ছবির বিষয়, আকার এবং রীতির দিক থেকে নন্দলাল যে এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, বুঝতে পারা যায়। দেশের অন্তঃকরণের মধ্যে টেনে নেবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের জাতীয় পুরাণ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। নন্দলালের ছাত্র বয়সের কাজে এবং তার পরেও এই প্রবণতার জের অনেক দূর পর্যন্ত

দেখা যাবে। কিন্তু পৌরাণিক বিষয়ে স্বাভাবিক আকর্ষণ সত্ত্বেও প্রথম থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা সরাসরি ছবিতে রূপান্তরিত করছেন এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। জয়া আপ্পাস্বামী নন্দলালের গোড়ার দিকের তিনটি ছবির (লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ম সংগ্রহ) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন (দে-বি, পৃ. ২৯-৩২), তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যময় কাজ 'নিদ্রিতা' ('ঘুমন্ত মেয়ে'), ১৯০৬ সালে আঁকা। এই দৃষ্টান্তটি বা এ ধরনের আরও কয়েকটি ছোটো ছবিতে বাস্তবের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার প্রবণতা ধরা যায় অনায়াসে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা, তখন পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে নিবিষ্টভাবে যে বহু আলোচিত ছবিগুলি করেছিলেন, তার মধ্যেও কীভাবে বাস্তবের উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন।

সতীপ্রথা সম্পর্কে সমস্ত তর্ক সরিয়ে রেখে এবং এক সময়ে কুমারস্বামী সতীপ্রথার প্রতীকী মহিমা ব্যাখ্যা করে নন্দলালের ছবি যেভাবে সমর্থন করেছিলেন সে প্রসঙ্গও সরিয়ে রেখে, আমরা শুধুই একখানা ছবি হিশেবে যদি 'সতী' (১৯০৭) দেখি তাহলে কাজটির আবেদন ঠিক ঠিক ধরা যায়। আগুনের আভায় একরাশ চুলের ভেতর থেকে ফুটে ওঠা আনত মুখখানি আদৌ আদর্শায়িত মনে হয় না। কোনো মেয়ে কোনো সংকল্প উদ্‌যাপনের সময় তো ঠিক এমনই প্রশান্ত শ্রীতে ভরে ওঠে। খসে পড়া ঘোম-টার ঘের, উরু থেকে পায়ের ভাঁজের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া কাপড়ের পাড়ের ভাঙা রেখা এবং বাঁ পায়ের আঙুলে রাখা ভর— পরিপূর্ণ আচ্ছাদন সত্ত্বেও শরীরের ওজন স্পষ্ট। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাস্তব অনুপাতসম্পন্ন শরীরী এই মেয়েটিকে কোনো দুর্ধর্ষ আদর্শের প্রতীক-বিগ্রহ মনে না করলেও চলে। না করলেই বরং ছবিটির শুদ্ধ আবেদন সহজে অনুভব করা যায়। জোরালো ড্রয়িংয়ের ভিতের উপরে গড়া অবয়ব-টির বাস্তব অস্তিত্বের জোরটা বোঝা যায়। বাস্তবের উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারতেন বলেই সেই শিক্ষানবিশ বয়সে এমন একটা তাৎপর্যময় ছবি করতে পেরেছিলেন। এ সময়ে নন্দলাল ওয়াশেই কাজ করেছেন। সামনে অবনীন্দ্রনাথের নিজের ওয়াশ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত ছিল।

এই সময়ের আর একটি ভালো কাজ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৯০৮)। হ্যাভেলের "দি নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব পেইন্টিং" প্রবন্ধের সঙ্গে এটি স্টুডিও পত্রিকায় (১৫ জুলাই ১৯০৮) ছাপা হয়েছিল। যত্ন করে ছাপা প্রতিলিপিটি নজর টেনে রাখে। ঘন অন্ধকার-পটভূমিতে ছায়া ছায়া মূর্তি। সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে মাথায় পাগড়ি, কোমরে কোমরবন্ধ বাঁধা, মুঠিতে খোলা তলোয়ার এক বলিষ্ঠ পুরুষ। বিক্রমাদিত্য। ঘাড়ে কঙ্কাল। চরিত্রটির মুখে প্রতিজ্ঞা আর ভয় মেশানো অভিব্যক্তি। এক অস্বস্তিকর ছবি। ছবিটিতে কোথাও শিল্পীর আড়ষ্টতার চিহ্ন নেই। সাবলীল কাজ।

ওয়াশে অবনীন্দ্রনাথ ঠিক কী করতে চাইতেন?

জলরঙের মূল বিলিতি শিক্ষা অবনীন্দ্রনাথ জীবনে কখনওই ছাড়েন নি। জাপানি শিল্পী ইয়োকোইয়ামা তাইকানের কাজের পদ্ধতি দেখে তিনি জলরঙে আলো নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পান। ওয়াশের কাজে তাইকান জাপানের শেষ বড়ো শিল্পী। সুতরাং এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ দেখার সুযোগ অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম রোমান্টিক মেজাজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত পর্দায় পর্দায় মিলে-মিশে বিস্তার পাওয়া রঙের আমেজে। আঁকা বিষয় এবং তার পটভূমির অবকাশ ছেয়ে থাকা জমকহীন মেদুরতায় ধরা দিত শিল্পীর আত্মস্থ আবেশ। কাগজের মূল সাদা বাঁচিয়ে আলোর হেরফের ঘটাতেন। জলরঙের বিলিতি রীতি জাপানি শিল্পীদের কাজের দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত করে অবনীন্দ্রনাথ নিজস্ব ওয়াশ রীতিতে দাঁড় করিয়ে-ছিলেন। অনুজ্জ্বল নিচু পর্দার রঙের কাজে যে মায়া বিছিয়ে দিতেন তাতে প্রায়ই তলিয়ে যেত গড়নের প্রান্ত-রেখার স্পষ্টতা এবং বর্তুলতা। রঙের পর্দার সুষম বিন্যাসেই তাঁর ছবির বাঁধুনি দাঁড়িয়ে যেত। সে দক্ষতা তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিশেষ কেউ আয়ত্ত করতে পারেন নি। অথচ তখনকার ছাত্ররা নাগাড়ে গুরুর প্রিয় ওয়াশ আঙ্গিকের চর্চা করে গেছেন। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। অবনীন্দ্রনাথের তুল্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আঙ্গিকে নিরন্তর অনুশীলনজাত দক্ষতা বা বস্তুরূপের গড়ন সম্পর্কে সহজাত রূপদৃষ্টির অধিকার বর্জিত তরুণেরা ওয়াশ পদ্ধতিকে খেলো রোমান্টিক ভাবাবেশ ফোটানো এবং সাহিত্য ঘেঁষা রূপকল্প রচনার সহজ উপায় মনে করলেন। ফলে তাঁদের কাজে শুদ্ধ চিত্রগুণ প্রকাশ পেত কদাচিৎ। এইসব কাজের নমুনা ধরেই অবনীন্দ্র প্রভাবিত বেঙ্গল স্কুলের দুর্বলতা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে এবং সে সমালোচনা অযৌক্তিক নয়। ছাত্রদের কাজের একঘেঁয়েমি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, কেউ যদি আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনে খুশি হয় সেজন্য আমি দায়ী নই। এই কঠোর মন্তব্যের তিক্ততা গায়ে লাগবে না এমন ছাত্র ছিলেন নন্দলাল বসু।

মূলত অবনীন্দ্রনাথের সমস্যাটা ছিল ছবিতে আলোর ভূমিকা নিয়ে। অনেকেই দেখেছেন এবং বলেছেন ওয়াশের মাত্রাভেদে আলো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তিনি কাগজ ঘষে ঘষে, এমন কী রঙ খাওয়ানো কাগজের উপর-পর্দা ছিঁড়ে তুলে ফেলে আলোর মাত্রা বাড়াতেন ছবির মধ্যে। প্যাস্টেলের কাজে, বিশেষ করে পোর্ট্রেটে, কিয়ারাস্‌ক্যুরো বা ছায়াতপের খেলা জমাতে তিনি তো তেলরঙের কাজের তুল্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। টেম্পেরা অবনীন্দ্রনাথ যে এড়িয়ে গেছেন— মনে হয় সে তাঁর এই মেজাজেরই জন্য। টেম্পেরায় আলোর সূক্ষ্ম হেরফের ফোটানোর সুযোগ আপেক্ষিক-ভাবে কম। ছবির মধ্যে স্পেস বা আকাশ এবং বস্তুর সম্পর্কের টেন্‌শন জলরঙ বা তেলরঙে তাৎপর্যময় করে তোলায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়।

আমাদের দেশি ছবির আলংকারিক রীতিতে আকাশের গুণ এবং ছবির মধ্যে

বস্তুর পরিপ্রেক্ষিত ও আলোর মাত্রা নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। টেম্পেরা রঙের গাঢ় হালকা পর্দা প্রয়োগ করে ভাস্কর্যের মতো বস্তুর আয়তন ফুটিয়ে তোলা হত। নন্দলাল পরিণত বয়সে ওয়াশ ছেড়ে টেম্পেরাই যে বেশি ব্যবহার করেছেন তার কারণ গুরুর সঙ্গে মেজাজের এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। এটা তাঁর একেবারে ছাত্র বয়সের কাজে ততটা হয়তো ধরা যায় না। কিন্তু, এটুকু বোঝা যায় যে ওয়াশের কাজেও পটের জমি ভাঙায় তাঁর পদ্ধতি বেশ আলাদা। তাঁর লক্ষ্য, বস্তুর আয়তনগত নির্দিষ্টতার দিকে। এই কারণে অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী নন্দলালের অন্য সতীর্থদের ছবির আলো-আঁধারি মায়াচ্ছন্নতার পাশে, পান্‌শে লিরিসিজ্‌মের পাশে ওয়াশে তাঁর প্রাথমিক কাজও অনেক জোরালো মনে হয়।

'সতী'-র মতোই 'শিব-সতী' ('সতীর দেহত্যাগ' ১৯০৭) বা 'নৌকাবিহার' (১৯০৯) ছবিতেও চরিত্রগুলির এবং পটের ভেতরের বস্তুগুলির আকার-আয়তন সম্পর্কে শিল্পীর সতর্ক সচেতনতা অনুভব করা যায়। রঙের মায়ায় সব-কিছু একশা করে ফেলা হয় নি।

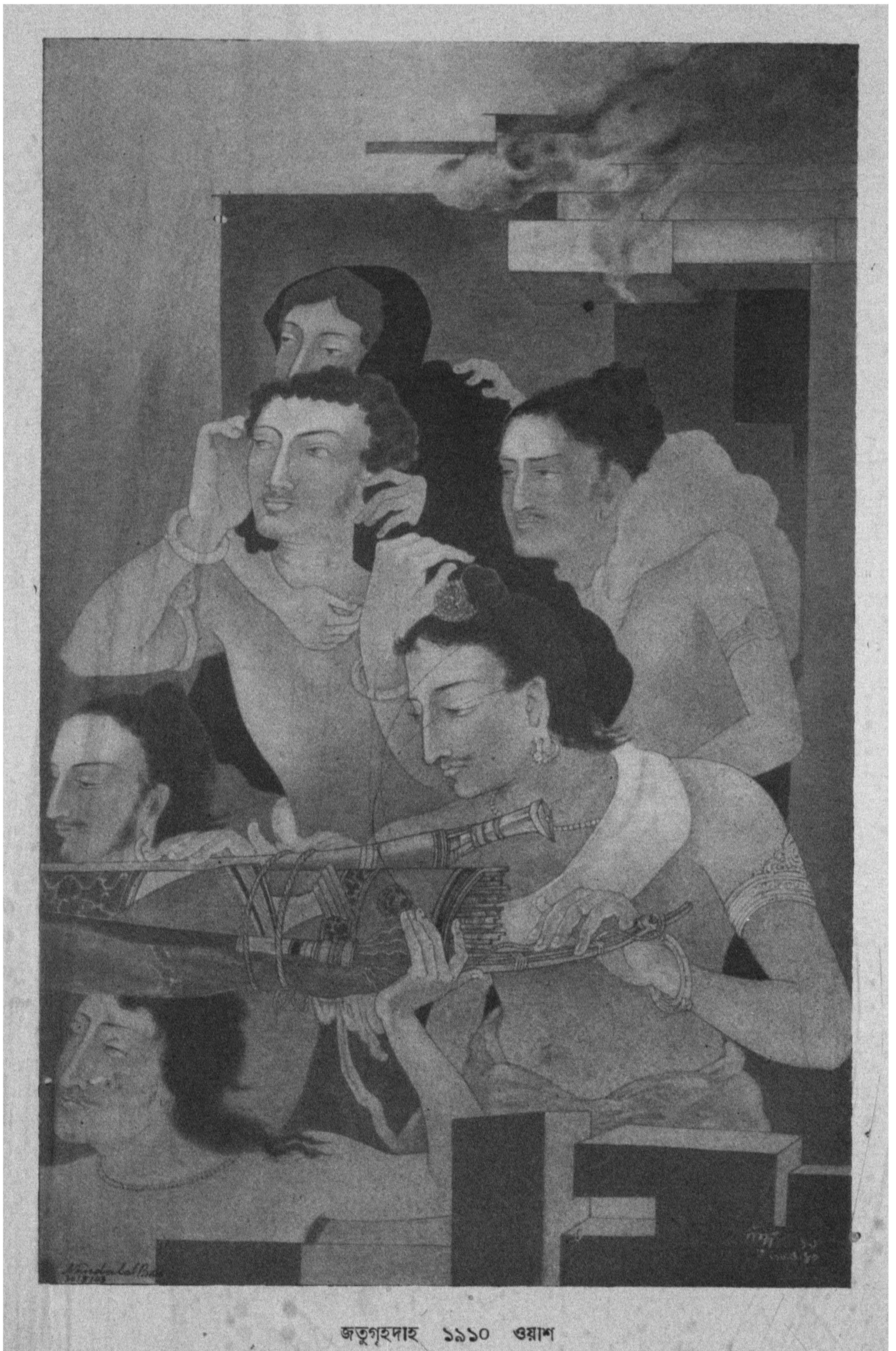
৭

১৯০৯ সালে সমকালীন ছবির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সজাগ জিজ্ঞাসা নিয়েই নন্দলাল অজন্তায় গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষময় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত দেখে দেশীয় শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা তৈরি হয়েছিল অজন্তায় ছবির বেলায় সেই একই দৃষ্টির অনু-বর্তন দেখতে পেলেন। ছয়-সাত শো বছর ধরে অজন্তায় আঁকার কাজ চলেছে। শুরু দ্বিতীয়-প্রথম খৃস্টপূর্বাব্দে। মাঝখানে একটা বড়ো ছেদ। আবার আঁকা শুরু হয় চতুর্থ-পঞ্চম খৃস্টাব্দে। ছবির মাধ্যম ভারতীয় শিল্পীর হাতে প্রাচীন কালে যে উৎকর্ষের সীমা স্পর্শ করেছিল তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় শুধু অজন্তাতেই পাওয়া সম্ভব। দীর্ঘ দিন ধরে আঁকা হলেও অজন্তার ছবিতে শৈলীর একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। বিদেশি উপাদান যা এসেছে তাতে মূল শৈলীর তেমন কিছু ব্যতিক্রম ঘটে নি। দীর্ঘ তিন মাস শ্রীমতী হেরিংহামের সঙ্গে কাজ করার সময়ে নন্দলাল অজন্তার বিশাল ভিত্তিচিত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে দেখবার সুযোগ পুরো কাজে লাগিয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতায় দেশীয় ছবির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন, দেশীয় ছবিতে রীতিবদ্ধ প্রকাশভঙ্গি, স্টাইলাইজেশন, আশ্রয় করা হয়ে এসেছে। য়ুরোপীয় শিল্পের বাস্তবিকতা এখানকার শিল্পীরা গ্রাহ্য মনে করেন নি। কিন্তু তাতে বাস্তব জীবনের সত্য ছবির ফ্রেমের মধ্যে তুলে আনায় কোনো বাধা হয় নি।

বৌদ্ধ-পুরাণ 'জাতকে'র কাহিনী থেকে নেওয়া বিষয় অজন্তার ছবির অবলম্বন। সে-

দিক থেকে একে বলাই যায় ধর্মীয় শিল্প। কিন্তু বৌদ্ধ কল্পনায় জন্মজন্মান্তর পথে সত্য-সন্ধানের জন্য বুদ্ধদেবের আয়াসের বিবরণে তাঁকে জীবনের অতি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মালা গাঁথার সুতো হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জাতক কাহিনীতে সব স্তরের মানুষের জীবনের বাস্তবতা প্রতিফলিত। পাপাচার, প্রলোভনের অতলতা থেকে তুরীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পর্যন্ত সবই এসে গেছে এর মধ্যে। বিষয়ের এমন অঢেল সুযোগ অজন্তার শিল্পীরা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। কাল্পনিক যক্ষ অপ্সরা থেকে পোষা বা বুনো জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত মানুষের অভিজ্ঞতার সামগ্রিক জগৎটি তাঁরা তুলে নিয়েছেন দেওয়ালের বিশাল পরিসরে। কত মানুষের টাইপ! নর এবং নারী দেহের ভঙ্গি ও অবস্থানের বৈচিত্র্য অন্তহীন। বিচিত্র ভাবাবহ ধরা আছে এইসব অবয়বে। বোধি-সত্ত্বদের অবয়বের ছাঁদ এবং অভিব্যক্তিতে একই ধ্যান ফিরে ফিরে ব্যবহার করা হলেও সাধারণ মানুষজন সবাই স্বতন্ত্র চরিত্র-রূপ। সামাজিক মর্যাদায় আলাদা। দেহের গড়নে, পোশাকে আলাদা। ভক্তিতে আনত মানুষ, উদ্‌গত আবেগে আকুল মানুষ, কাজে ব্যস্ত মানুষ, এমন কী প্রগল্‌ভ উদ্দাম মানুষের নানান্‌ রূপ। আঁকার রীতিবদ্ধ শৈলী সত্ত্বেও বাস্তবের উদ্দীপনা দৃশ্যগুলিতে অবাধ প্রবল তরঙ্গের মতো বয়ে গেছে। বাস্তব জীবন প্রবাহের ছন্দও রেখাপাতের নিপুণতায় সংবেদ্য হয়ে আছে। তার সঙ্গে প্রখর মাত্রাবোধে শিল্পীরা যুক্ত করেছেন আলংকারিক কাজ, যার উপাদান চোখ মেলে দেখা প্রকৃতি থেকে তুলে আনা! অজন্তার অভিজ্ঞতায় নন্দলাল স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারলেন, প্রাচীন ভারতীয় ছবি ভাস্কর্য-প্রভাবিত। ছবিতে এই শিল্পীরা ভাস্কর্যের গুণ ফুটিয়ে তুলতেন। দ্বিমাত্রিক পটে ভাস্কর্যের তিন মাত্রা আনার জন্য এঁরা য়ুরোপীয় ধরনে কিয়ারাস্‌ক্যুরো বা ছায়াতপের সাহায্য নেন নি। এঁদের প্রধান অবলম্বন রেখা। শিল্পীরা নিজের বোধের মধ্যে যে প্রাণছন্দ উপলব্ধি করেছেন, মূল একটি রেখায় সেই ছন্দের গতিভঙ্গিটি ধরেছেন প্রথমে। মূল সেই রেখা থেকে নির্গত এবং মূল রেখার অভিমুখী গৌণ রেখার টানাপোড়েনে ক্রমে গড়ে তুলেছেন প্রাণময় অবয়বের পূর্ণতা। সামান্য কয়েকটি রঙের ব্যবহারে, কোথাও বা শুধু একটি রঙের গাঢ় হালকা পর্দায় যে তীব্র প্রাণাবেগ আকারবদ্ধ হয়ে উঠেছে, তার মূলে আছে গড়নের রেখাপাতে শিল্পীর অসামান্য দক্ষতা। আবার রেখাকেই তাঁরা অতি নিপুণভাবে অলংকরণের কাজে ব্যবহার করেছেন। অজস্র ডিজাইন রচনা করেছেন। কোনো বোধিসত্ত্ব বা তুচ্ছ কোনো মানুষ বা প্রাণী যাই আঁকুন না কেন, চিত্রগুণের আবেদন ফোটানোর দিক থেকে তাঁদের মনোযোগ ও নিবিষ্টতায় কোথাও তারতম্য নেই। দৃশ্যমান জীবন ও জগতের রূপগত সত্য ছবিতে তুলে এনেছেন। কোনো ধর্মীয় শুচিবাই জীবন অবলোকনে এবং রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

চিত্রকর হিশেবে নন্দলালের ব্যক্তিগত পরিণতির পক্ষে অজন্তার অভিজ্ঞতা অসীম



জতুগৃহদাহ ১৯১০ ওয়াশ

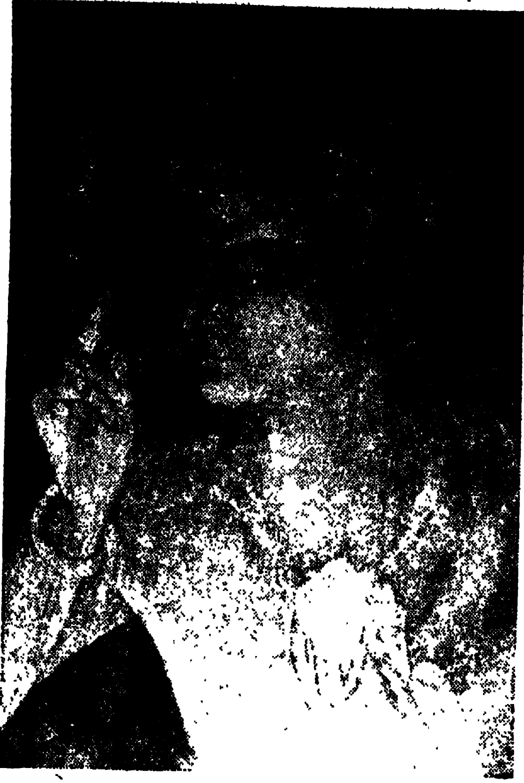
গুরুত্বপূর্ণ। ছবির আঙ্গিকে ভারতীয় ঐতিহ্য য়ুরোপ থেকে স্বরূপে আলাদা, তাঁর এই উপলব্ধি নিশ্চিত হল। বুঝলেন, ভারতীয় রীতিতে আলংকারিক পদ্ধতির শক্তি কতো দূর যেতে পারে। প্রাত্যহিক অনুশীলনে স্পষ্ট হল, ভারতীয় শিল্পদৃষ্টিতে ছবির সঙ্গে বাস্তবের যোগ বাস্তবিকতার অনুপুঙ্খের দিক থেকে নয়, প্রাণছন্দের অভিব্যক্তির নিগূঢ় শুদ্ধতায়। ছবিতে প্রাণছন্দ রূপবদ্ধ করার করণ-কৌশল আয়ত্তে এল। পণ্ডিতেরা ভারতশিল্পের যে আধ্যাত্মিকতার কথা বোঝাতেন, প্রতীকধর্মিতার কথা বলতেন, নন্দলালের অভিজ্ঞতা তার বিপরীত। মানববিশ্বের এবং বিশ্বপ্রকৃতির এমন সাক্ষাৎ প্রবল অভিক্ষেপকে কী করে প্রতীকী বলা যাবে? এমনও নয় যে প্রাণের মূর্ছনাটুকুই আছে শুধু, জীবনের বস্তুগত রূপের স্পৃশ্যতা গুণ, ভর ওজন বোধ নেই। বিশেষত বিশ্ববস্তুর গড়নকেই অজন্তার শিল্পীরা রূপবদ্ধ করেছেন। এই জন্য নন্দলাল অজন্তার ছবিকে ভাস্কর্যধর্মী বলেন। তাঁর এইসব উপলব্ধির কথা টুকরো মন্তব্যে, ছোটো ছোটো লেখায় ছড়িয়ে আছে। অজন্তা প্রসঙ্গে নন্দলালের একটি খুব তাৎপর্যময় মন্তব্য,

/ তখনই লক্ষ্য করেছিলুম, অজন্তার ছবির সঙ্গে আমাদের দেশী পটের আঁকা পট আর পুঁথির পাটার ওপর আঁকা ছবিতে শিল্পছন্দে বেশ একটা মিল রয়ে গেছে। তাছাড়া ওড়িষ্যার যে পট ও পাটা-শিল্প তার সঙ্গে বাংলা দেশের মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদের পট ও পাটার ছবির বিষয় আর অঙ্কন পদ্ধতির মিল আছে। এতে আমার মনে হয়, এই দেশী চিত্রবিদ্যার শেকড় খুব পুরাতন কালের; আর এ দেশের এই শিল্পধারা দ্বীপময় ভারতেও ছড়িয়েছিল। /(ভা-শি-ন-১, পৃ. ৩৯৭-৯৮)।

খুব স্বাভাবিকভাবে ১৯০৯-১০ থেকে নন্দলালের আঁকার ধরনে পরিবর্তন এল। তিনি নিজেই বলেছিলেন, "আমার প্রথম পর্বের ছবিতে তুলি রচনা করে গিয়েছে ভাস্কর্য রূপায়ণ।" (চিন্তামণি কর ধৃত উক্তি, দে-বি, পৃ. ১৩২)। ভাস্কর্যে আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে আরও একটি মন্তব্যে, "পরের জন্মে আবার যদি শিল্পী হয়েই জন্মাই তবে ভাস্কর্য করব।" (রামকিঙ্কর ধৃত উক্তি, দেশ ১৪ মে ১৯৬৬, পৃ. ২৫৮)।

আঙ্গিকের দিক থেকে প্রধানত ওয়াশ রীতিই অনুসরণ করেছেন অনেক দিন পর্যন্ত। কিন্তু ওয়াশের কাজে আলোর বিন্যাসের চেয়ে চরিত্র ও বস্তুর গড়নের স্পষ্টতা আনার ঝোঁক বেড়েছে। ছবির আকার বড়ো হয়েছে। ছবির মধ্যে বাঁধুনি, বিন্যস্ত বস্তুর প্রতিসাম্য এবং নির্মাণগত দিক সম্পর্কে সতর্কতা দেখা দিয়েছে।

'অহল্যা উদ্ধার' (১৯১০) ছবিটিতে শিল্পীর নবজাত বোধ নিয়ে নতুন পরীক্ষার চিহ্ন খুব স্পষ্ট। একটি দুর্বলতা সহজেই চোখে পড়ে এই ছবিতে। আকাশে মাথা তোলা ইমারতের এবং সামনে ঘাসে পড়ে থাকা পাথর দুটির কাঠিন্য এবং বিশ্বামিত্র-রাম-লক্ষ্মণ গ্রুপটির অবয়বের সজীব গড়ন যত স্পষ্ট, সদ্য শাপমুক্ত অহল্যার আকারটি



পার্থসারথি ১৯১২ ওয়াশ

সেই তুলনায় একেবারেই দ্বিমাত্রিক, বেধবর্জিত, শুধু পটে-লিখা। গোটা ছবিতে একই নীতি যেন অনুসরণ করতে পারছেন না। অথচ দৃষ্টির সতর্কতা বোঝা যায় নিচের ঘাসের ঝোপ এবং পুরানো ইমারতের উপরে গজিয়ে ওঠা ঘাস একই ধরনের তুলির টানে আঁকায়। কিন্তু ১৯১০-এই করা 'জতুগৃহদাহ' বাঁধুনির দিক থেকে, কম্পোজিশনের (নন্দলাল বলবেন ছন্দ-সৃষ্টি) প্রতিসাম্যে ; ঘর, আসবাব ও চরিত্রগুলির গড়নের দিক থেকে একটি নিখুঁত কাজ। জমাট ইমারতি গড়নের দৃঢ়তায় 'জতুগৃহদাহ' অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশের কাজ থেকে কত আলাদা! এই ছবি বা 'পার্থসারথি', (১৯১২) দেখলে বুঝতে পারা যায় ওয়াশরীতি নন্দলালের হাতে ভিন্ন সংবেদন জাগাচ্ছে। 'পার্থসারথি'তে রথের কাঠামোর গড়নে, চরিত্রটির শরীরের গড়নে কঠিন ও পেলবের স্পর্শ-গোচর ভিন্নতা সাক্ষাৎ হয়ে আছে। এই সময়ের অবনীন্দ্রনাথের কাজ 'ওমর খৈয়াম' সিরিজের ছবির পাশে রেখে দেখলে তুজনের ঝোঁকের তফাত স্পষ্ট হয়। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের মতো কোনো স্বপ্নমায়া বিছিয়ে দিতে চান না। বস্তুর স্পৃশ্যগুণ, প্লাস্টিসিটি রেখায় এবং রঙে পুরো ধরে দিতে চান। বোঝা যায়, গুরুর হাত ছেড়ে তিনি চরিতার্থতার নিজস্ব পথে এগোচ্ছেন।

আরও কিছু পরে আর একটি অসামান্য ওয়াশের কাজ 'বৃষ্টিতে কণারক' (১৯১৭)। বৃষ্টির বাধায় বেঁকেচুরে যাওয়া আলোর প্রতিসরণ নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। পাথরের মেঝের থাক্, থাম, খিলান এবং ভাঙামূর্তির ছন্দোময় গড়ন উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণে ছবিটিতে এক আশ্চর্য আধুনিক বোধের পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। এ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আবছা প্রতিরূপ মাত্র নয়, মৌলিক অবলোকনজাত একটি চিত্ররূপ সৃষ্টি। ছবির মধ্যে বস্তু-বিন্যাসের মান-পরিমাণ অদ্ভুতভাবে ভারসাম্যে বাঁধা হয়েছে। ভারসাম্য রেখেছেন মূলত আলোর স্পন্দনের সাহায্যে। অথচ একে য়ুরোপীয় ধরনে ছায়াতপের খেলা বলা যায় না। অনেক পরে নন্দলালের ছবিতে আলোর চরিত্র এবং প্রভাব নিয়ে পরীক্ষার ঝোঁক দেখা যায়। 'বৃষ্টিতে কণারক' ছবিটি দেখে মনে হয় বিষয়টি দীর্ঘ দিন তাঁর ভাবনার মধ্যে লালন করেছিলেন।

১৯০৫/৬ থেকে ১৯১৯/২০ পর্যন্ত শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্বে নন্দলাল পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অনেক ছবি করেছেন। কিন্তু তাঁর এসব কাজের কোনোটিকেই পুরাণ-কাহিনীর বা পুরাণ-প্রথিত কোনো ভাবের প্রতিরূপায়ণমাত্র বলা যায় না। 'অহল্যা উদ্ধার', 'পার্থসারথি', 'শিবের বিষপান', 'জতুগৃহদাহ', বা বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে মহাভারতের ছবি শুদ্ধ চিত্রগুণের পরীক্ষা হিশেবেই তাৎপর্যময়। ধ্রুপদী শিল্প-আঙ্গিকের উপাদান ব্যবহারে একালের সৌন্দর্যরুচির ভিত রচনার দিক থেকে ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আজও মানতে হয়। সমকালীন সমালোচনায় অবশ্য ছবির বিষয়ভাবনা নিয়েই সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হত। যেমন নন্দলালের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সিস্টার নিবেদিতার সমালোচনা। ফলে বড়ো করে প্রতিভাত হত শিল্পীর স্বদেশাভিমানময় পুরাণ-ভাবনা। বিবেচনা করে দেখা হয় নি কীভাবে তিনি বাস্তব পর্যবেক্ষণজাত উদ্দীপনা এবং ধ্রুপদী শিল্পরীতির নিহিত শৃঙ্খলা মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন একটির পর একটি কাজে। বাড়িয়ে তুলছিলেন ভারতীয় আধুনিকতার প্রসর এবং বোধ। উৎসের সঙ্গে যোগ রেখে আধুনিককালের শিকড়হীন মানসিকতার রিক্ততা কাটিয়ে উঠছিলেন শিল্পের এলাকায়। সমকালীন বর্তমানের মাটি থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। তাঁর ধ্রুপদী শিল্পরীতিচর্চা অতীতচারিতা নয়, পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও নয়। বর্তমানের প্রয়োজনে আবহমান ঐতিহ্যের ভিত্তি সন্ধান বলা যায়।

মূল্যায়ন খুবই একপেশে হয়ে পড়ে যদি আমরা ভুলে যাই নন্দলাল একই নিষ্ঠায় তাঁর জীবনযাপনের পরিবেশ থেকে, প্রাত্যহিক দেখা জগৎ থেকে নিরন্তর ছবির বিষয় নিয়েছেন। ভূদৃশ্য, চোখে দেখা মানুষজনের চরিত্র, পশুপাখি অবিরল আসে তাঁর ছবিতে। এমন কী পুরাণ-আশ্রিত ছবিতেও চরিত্রের আদল তুলে নিয়েছেন বাস্তব থেকে। তাই 'কৃষ্ণ-সুদামা'র (১৯১১) মতো পৌরাণিক বিষয়ের ছবির সুদামা চরিত্রকে মনে হয় আমাদের জীবন-পরিবেশ থেকে উঠে আসা মানুষ। 'জগাই-মাধাই' (১৯১৩)

ছবিতে নির্দ্বিধায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের মুখের আদল ব্যবহার করেন। চিত্রগুণ জোরালো করে তোলার জন্য পুরাণ-প্রসঙ্গের সঙ্গে বাস্তব উপাদান মিলিয়ে নেন। ফলে তাঁর কাজের আবেদন সমকালীন অন্য শিল্পীদের পৌরাণিক ছবির পাশে একান্তই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। আরও পরে পৌরাণিক বিষয়কে পুরাণের অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে একেবারেই ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন দেখতে পাব। ধ্রুপদী শিল্পচর্চা থেকে পাওয়া আলংকারিক প্রবণতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত উদ্দীপনার টানাপোড়েন তাঁর আঁকার ধারায় বরাবর গতি সঞ্চার করেছে। যেমন, সাজাদপুর বেড়িয়ে আসার অভিজ্ঞতায় আঁকেন একান্ত আধুনিক মেজাজের ল্যান্‌ডস্কেপ 'শীতের পদ্মা' (১৯১৫)। আবার 'পথহারা গাভী' (১৯১৮) ছবিতে খড়্গপুরের চেনা প্রকৃতি আঁকেন অনেকটা রাজপুত ছবির ধরনে।

সব শিল্পীর সৃষ্টিতেই উৎকর্ষের তারতম্য থাকে। সব কাজ সমান উতরোয় না। এটা নন্দলালের ছবির বেলায়ও নিশ্চয়ই সমান সত্য। কিন্তু শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্বেও এমন অনেক কাজ করেছেন যা তাঁর দায়িত্ববান সচেতন মনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট নন্দন-আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে আমাদের বাধ্য করে। এই অভিনিবেশ আসে নিছক চিত্রগুণের জন্যেই। নন্দলালের বিশেষ ছবি কোন্ পরিস্থিতিতে, কেমন পরিবেশে তৈরি হয়েছিল, এই বোধ এবং দেখার চোখ থাকলে তাঁর ছবির উত্তাপ-বিকিরণ, 'উত্তাপ' কথাটাই আমি ব্যবহার করতে চাই,— এড়ানো যায় না।

৮

ছাত্রবয়স না পেরোতেই নন্দলাল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি খবর কলকাতার কলাসংস্কৃতি পরিবেশে মুখে মুখে ফিরত। বুঝদার মানুষ সকলেরই তিনি মনোযোগের পাত্র হয়ে ওঠেন। কাজের পরিমাণে, বিষয় বৈচিত্র্যে, নানা আঙ্গিকের পরীক্ষায় ক্রমেই নন্দলাল সতীর্থ আর সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন। কলকাতায়, সিমলায়, এলাহাবাদে, লাহোরে, মাদ্রাজে— সব প্রদর্শনীতে আধুনিক ছবির ঘরে তাঁর কাজ মর্যাদায় অবনীন্দ্রনাথের পরেই জায়গা পেত। জাপানের 'কোক্‌কা' পত্রিকায়, ইংলনডের 'দি স্টুডিও' পত্রিকায় তাঁর ছবি সমেত আলোচনা বেরিয়েছে। একটানা সফলতায় উজ্জ্বল এক নবীন প্রতিভা। স্কুলের শিক্ষকতায় বা কোনো সরকারি দপ্তরে নকল-নবিশের কাজে নন্দলাল নিজের শক্তিক্ষয় করবেন— অবনীন্দ্রনাথ তা চান নি। তাই আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। নন্দলালও চাকরির লোভ করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটা মাসহারা পেতেন। ছবি বিক্রি হলে কিছু আয় হত। কোনো চাকরির বাঁধাবাঁধির মধ্যে না যাওয়ায় নিজের



বৃষ্টিস্নাত কণারক
১৯১৭ ওয়াশ

মতো কাজ করার প্রচুর সময় পেতেন। তাঁর কাজের বছর-ওয়ারি হিশেব দেখলে বোঝা যায় সে সময় একটুও বৃথা যায় নি। ১৯২০-র মধ্যে আধুনিক ভারতীয় শিল্পে অবনীন্দ্র-ধারায় তিনি অগ্রগণ্য শিল্পীর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

কলকাতার কলাসংস্কৃতি পরিবেশে এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে, সমাদরের মধ্যে কি নন্দলাল ক্লান্ত বোধ করতেন? এ পরিবেশ থেকে নেবার মতো উদ্দীপনার নতুন কোনো উৎস যে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না— এটা ঠিক। অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ১৯১৫-য় অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ছেড়ে আসেন। আর্ট স্কুলের বাইরে তাঁর কাজের জায়গা ছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা আর ইন্‌ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্‌টাল আর্ট। ১৯০৭ সাল থেকে সোসাইটি নতুন শিল্পীদের পোষণ করে আসছিল। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং নবজাত ভারতীয় আধুনিক শিল্পের প্রচারে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা গুরুত্ব পাচ্ছিল। ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সোসাইটি পরিচালনায় গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের কর্তৃত্ব ছিল। অবনীন্দ্র-ধারায় আঁকা শিখতে চায় এমন ছাত্রদের চাপও ছিল। সোসাইটিতে তাই শেখাবার ব্যবস্থা হল এবং নন্দলাল ১৯১৮-য় এখানে দুশো টাকা মাস মাইনের অধ্যাপনার কাজ পেলেন। আয় বাড়ল। মাননা পেলেন। সহকর্মী শৈলেন দে -ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার -চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -গিরিধারী মহাপাত্র— এঁদের সঙ্গে সম্পর্কও ভালো ছিল। কিন্তু এখানকার কাজে তাঁর মন বসে নি। কলকাতার পরিবেশের টানই যেন ভেতরে ভেতরে ক্রমে আলগা হয়ে আসছিল। আয়ত্তগত প্রতিষ্ঠায় তৃপ্তি ছিল না। একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। তাঁর শিল্পীজীবনের আর-এক সংকটকাল ঘনিয়ে এসেছিল।

সারা দেশই তখন এক বাঁকের মুখে অধীর। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২৪) ভারতীয় রাজনীতিতে এক বড়ো পর্বান্তর। গান্ধী ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেশের রাজনীতির চরিত্র অনেক বদলে দিয়েছিল। স্বাদেশিক চেতনা শুধু উপর স্তরের মানুষের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ ছিল না। খেটে খাওয়া মানুষদের জীবনে রাজনীতি চারিয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫-এর আলোড়নের তুলনায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তাই অনেক ব্যাপক হয়, অনেক গভীরে যায়। অন্য দিকে বিপ্লবী আন্দোলনে দেশের যৌবশক্তির সাহসিকতা জন-মনে বীর্যবত্তা সঞ্চার করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে স্বাধীনতা না আসুক, প্রশাসনে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব অনেকটা প্রতিষ্ঠা পাবে এই প্রত্যাশা প্রচণ্ড আঘাত পেল। স্পষ্ট হয়ে উঠল— ইংরেজের শাসন আরও কঠোর এবং নির্মম হবে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পুরিয়ে নেবার জন্য সাম্রাজ্যের উপরে শোষণের মাত্রা বাড়ানো হবে— এ তো অবধারিত ছিল। মুঠি তাই কঠিন হয়। রৌলট আইন (Rowlatt Act, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) পাস হল এবং শাসক-শাসিতের সংঘর্ষ বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। বৃটিশ পীড়ন বর্বরতার চরমে উঠল পঞ্জাবে,

ছিদ্রহীন ব্যবস্থা সত্ত্বেও সত্য প্রকাশ পেয়ে যায়। দেশের মন আতঙ্কে ঘৃণায় স্তম্ভিত। সেই সরকারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম ধিক্কার উচ্চারণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। নাইট উপাধি বর্জন করলেন (২৯ মে ১৯১৯)। দ্রুত এসব ঘটনার ধাক্কায় কংগ্রেস সরাসরি আন্দোলনের কর্মসূচি নেয়। ১৯২০ সালে সারা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের চেহারা কখনও এক থাকতে পারে না, ছিলও না। অহিংসা-হিংসার সীমা সব জায়গায় মানা হয় নি। সাধারণ মানুষের সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের প্রবলতায় এই দিনগুলিতে জাতীয় জীবনের নতুন রূপ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। 'স্বদেশ' কথাটাই নতুন অর্থের আভা পেল। নন্দলাল বসুর মতো দেশাভিমানী মানুষের পক্ষে এর তাৎপর্য ধরতে পারাই স্বাভাবিক। ২৩ বছর বয়সে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আলোড়িত স্বদেশের পটে নিজেকে একভাবে চিনেছিলেন। ৩৮ বছর বয়সে তাঁর শিল্পী জীবনের দ্বিতীয় সংকটকালে আর এক আলোড়নে, অনেক ব্যাপক এবং প্রবল আলোড়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে উত্তরণের দিশা পেলেন। কলকাতার কাজকর্মের পরিবেশে যে সামাজিক স্তরে এতদিন আদর-যত্ন পেয়ে এসেছেন, সেখান থেকে অনেক ধাপ নেমে গেলে পাওয়া যায় প্রকৃত স্বদেশের মাটি। সেই স্বদেশে পা বাড়ানোই উত্তরণের পথ। রবীন্দ্রনাথ এই পথে ডাক দিয়েছিলেন।

এ পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখলে সরকারি টাকায় পোষিত সোসাইটির কেতাদুরস্ত শিল্পচর্চার পরিবেশ ছেড়ে নন্দলালের শান্তিনিকেতনে যাওয়ার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। বিনোদবিহারী ঠিক ধরেছিলেন, শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে নন্দলালের ছবি মাটির দিকে নেমে এসেছে। ('চিত্রকর', পৃ. ২৯)।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিত মনে আসে। দেশের নবীন কলাসংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বরাবর সজাগ ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের কাজকর্মের খবর যেমন রাখতেন তেমনি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন। কার কতটা যোগ্যতা, কাকে দিয়ে কতটা কাজ হওয়া সম্ভব, জানতেন। তিনি নন্দলালকে কাছে ডাকেন ১৯০৯ সালে। 'চয়নিকা' সংকলনের কিছু কবিতা পড়ে শোনান। বইখানির জন্য কিছু ইলাসট্রেশন করে দিতে অনুরোধ করেন। নন্দলালের জীবনে অশেষ গুরুত্ব পাবে এমন একটি সম্পর্কের এই শুরু। ক্রমে তাঁর উপরে রবীন্দ্রনাথের যত্ন-মমত্ব গাঢ় হয়েছে। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নন্দলালকে তিনি কতটা মূল্য দিতেন বোঝা যায় ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনার আয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চার পত্তন করার চেষ্টা করে আসছিলেন। অসিতকুমার হালদারকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে প্রথম এলেন ১৯১৪-র এপ্রিল মাসে। খুব আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করলেন। নিজের

হাতে লিখে অভিনন্দন-কবিতা "তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী চিত্ত" অর্পণ করলেন। অনুষ্ঠান শেষে ভরা মনে নন্দলাল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসায় ফিরছেন। অকস্মাৎ এক আশ্চর্য অনুভূতির প্লাবন এল তাঁর মধ্যে। "হঠাৎ মনে হল দেহ থেকেও তো নেই, জড় বাধা কোথায় অপসৃত হল! আলো হাওয়া চলে যাচ্ছে শরীর ভেদ করে। অভূতপূর্ব আনন্দে আপ্লুত হল চেতনা।" (শ্রীকানাই সামন্ত ধৃত উক্তি)। এ রকম মরমিয়া উপলব্ধির প্রবণতা নন্দলালের ছিল। আর কিছুই না, একটা সংকট বোধের চাপের মধ্যে মানুষ উত্তরণের পথের আভাস দেখতে পেলে এমন আপ্লুত বোধ করতেই পারে। সদর স্ট্রীটে এক সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, "আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" ("প্রভাত সংগীত", 'জীবন-স্মৃতি')। শান্তিনিকেতন জায়গাটার গুণ বা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, কারণ যাই হোক, এ রহস্যময় উপলব্ধি নন্দলালের চিন্তাচেতনায়, গোটা সত্তায় এক নতুন আলো বিকিরণ করেছিল। এর পর থেকে শান্তিনিকেতন তাঁকে টেনেছে গভীর ভাবে। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে তাঁর জীবনের গতি ভিন্ন মুখে বয়েছে। আরও একবার ১৯১৬য় নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে এলেন। শিলাইদহে, বাংলার প্রকৃতি ও জীবনের এক ভিন্ন আবেষ্টনে। সঙ্গী ছিলেন মুকুলচন্দ্র দে এবং সুরেন্দ্রনাথ কর। কবিকেও নতুন করে জানার সুযোগ হল; তাঁর কথা শোনার সুযোগ, দেশের কলাসংস্কৃতি নিয়ে তাঁর ভাবনার পরিচয় পাবার সুযোগ।

অমন আলোয় হাওয়ায় প্রকৃতির বুকের মধ্যে বসবাস আর চোখ ভরে দেখা অবিরল দৃশ্য যে শিল্পীকে উতল করে তুলবে সে স্বাভাবিক। বড়ো পটে এই অভিজ্ঞতা রূপ দেবার অপেক্ষায় না থেকে স্কেচে ধরে যাওয়ার নেশায় তাঁকে পেয়ে বসে। স্কেচে নন্দলালের হাত ভালো তৈরি ছিল না। মুকুল দে-র কাছে শিখতে হয়েছে। নেচার স্টাডির এমন সুযোগ আগে পান নি। সঙ্গে স্কেচের প্রকরণ শেখারও সুযোগ তাঁর শক্তির একটি নতুন দিক খুলে দিল। চোখে দেখা দৃশ্য ধরে রাখার এই অভ্যাস এবং নিপুণতা নন্দলালের সৃষ্টিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। সাদাকালোয় তিনি অসামান্য যে সব কাজ করেছেন পরের যুগে, শিলাইদহে তাঁর পত্তন হয়েছিল। আর, ছবির বিশিষ্ট এক শাখা ল্যাণ্ডস্কেপ— যে ক্ষেত্রে নন্দলালের কাজ সব সমালোচনা স্তব্ধ করে দেয়, তারও সূত্রপাত এই শিলাইদহর অভিজ্ঞতায়। 'শীতের পদ্মা' ছবিতে। এই ছবির জন্য কত অনুশীলন করেছেন স্কেচের খাতায় তার প্রমাণ আছে। শুধু উড়ন্ত বকেরই নানান রকমেব স্কেচ করেছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবাবহ মর্মের মধ্যে নেবার শিক্ষা এইখানে রবীন্দ্রনাথের কাছেই পেয়েছিলেন।

শিল্পকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ক্রমে দায়বোধে পরিণত হয়। অবনীন্দ্র-নাথরা যা করতে পেরেছেন তার পরেও কিছু করার আছে, সে দায় তাঁকেই নিতে হবে, নিজের মধ্যে তিনি এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়েছেন। এই উদ্যোগের একদিক জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' প্রতিষ্ঠা, অন্য দিক শান্তিনিকেতনে কলাভবন গড়ে তোলা। ১৯১৫-১৬-য় লেখা চিঠিপত্রে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া যায়। "নব্য-বঙ্গর চিত্রকলা"র ঠিক দুর্বলতার জায়গা তিনি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে জাপানি জীবনে কলাসংস্কৃতির গভীর, ব্যাপক ভূমিকার দৃষ্টান্তে স্বদেশের শিল্পচর্চার দৈন্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর্ট স্কুলে বা সাহেব-সুবোদের পরিপোষণে ইন্‌ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে যা কাজ হচ্ছিল তার বাইরে শিল্পের আসন পাতার একটা আয়োজন রবীন্দ্রনাথ করলেন 'বিচিত্রা'য়, ১৯১৬ সালে। এখানে নন্দলালকে আদর করে ডেকে আনলেন। সঙ্গে এলেন অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে, সুরেন্দ্রনাথ কর, কাশীনাথ দেবল। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। 'বিচিত্রা'য় বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছাড়াও বাইরে থেকে অনেকে শিখতে আসতেন। এখানকার কলাচর্চায় নতুন পরীক্ষার সুযোগ বাড়াবার জন্য জাপান থেকে শিল্পী আরাই কাম্‌পোকে আনেন। আরাইয়ের কাছ থেকে আর কে কী উপকার পেয়েছেন জানা নেই, নন্দলালের কাজে কিন্তু জাপানের প্রেরণা সৃষ্টির নতুন ধারায় ফলবান হয়েছিল। এটা আলাদা করে আলোচনার বিষয়।

'বিচিত্রা'য় সাহিত্যের জমাট আসর বসত। অভিনয়ের আয়োজনও স্মরণীয়। শিল্প-কাজের দিক থেকে শেখানোর ব্যবস্থা ছাড়াও আলপনা এবং নানা ধরনের হাতের কাজের নমুনা সংগ্রহ করে আনা, তার অনুশীলন— এসব আয়োজনে কিছু বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু শহুরে পরিবেশের আবদ্ধ দশা পেরোনোর কোনো পথ এভাবে যে তৈরি হবে না, রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন। বিচিত্রা স্থায়ী হয় নি।

ব্যক্তিগত ব্যাপক অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ মর্মের মধ্যে অনুভব করতেন, মানুষের আধুনিক ইতিহাসে ভারতবর্ষ কোন্ পিছনে পড়ে আছে। এই অনুভূতির তীক্ষ্ণ বেদনা, বেদনার তাপ তাঁকে বাধ্য করত এমন এক দায়িত্ব পালনে যা কোনো মানুষের একক সঙ্গতি এবং সামর্থ্যের পক্ষে সত্যিই দুর্বহ। যৌবনকাল থেকে তিনি বলে এসেছেন, শুধু স্বদেশ প্রেমের বুলি আউড়ে কখনও আধুনিক বিশ্বের পটে স্বদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ভান ছাড়া দরকার। যার যতটুকু সাধ্য, আন্তরিকভাবে সেই শক্তি নিয়ে দুর্গত স্বদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। কাজের জায়গা মত-সংঘর্ষের ফুল্‌কিতে ঝল্‌মলে শহরে নয়, দেশের নিভৃত অন্তঃপুরে। 'বিচিত্রা'য় যে আয়োজন করেছিলেন সে তেমন জমে উঠল না। ক্রমে রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বদেশভাবনার বাস্তব

রূপ দেবেন ভেবে 'বিশ্বভারতী' সংগঠনে শক্তি-সামর্থ্যের সবটুকু নিয়োগ করলেন। তাঁর মনে এই ভাবনাই ছিল যে, স্বদেশের বিশ্বমুখী বিকাশের পথ তৈরি হবে দেশের বুকের ভেতর দিয়ে। দুর্দশাময় জনস্তর থেকেই মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

আজ মনে হয় এই দুরূহ সাধনে সহযোগীরূপে নন্দলালকে টেনে নেওয়া রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে যেন অনিবার্যই ছিল। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের মধ্যে শিল্পের স্বদেশের টান এতো তীব্র আর কার ছিল! স্বভাবে আর কে ছিলেন কর্তব্যের ভার বহনের এমন তিতিক্ষাময় ক্ষমতার অধিকারী? শিল্পী হিশেবেও সমকালীন তরুণদের মধ্যে তাঁর চেয়ে ক্ষমতাবান আর-কেউ যে ছিলেন না, তা রবীন্দ্রনাথ বহু আগে থেকেই বুঝে-ছিলেন। অসিতকুমার হালদারকে দিয়ে কলাভবন সংগঠনের পরীক্ষায় খুব ভরসা পান নি। শেষ পর্যন্ত নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৮-র জানুয়ারি থেকে নন্দলাল সোসাইটিতে চাকরি করছিলেন, কিন্তু প্রায়ই শান্তি-নিকেতনে যেতেন। সোসাইটির কাজ রুটিনে বাঁধা নিয়ে গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তরে পিছুটান কাটানো সহজ হল। সোসাইটির কাজে ইস্তফা দিলেন। কবির ডাকে সাড়া দিতে আর বাধা রইল না।

নন্দলাল যে পাশ থেকে সরে যাবেন, কখনও অবনীন্দ্রনাথ এমন ভাবেন নি। খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু যে গাছ সরাসরি মাটির রস পেলে বনস্পতি হয়ে উঠবে তাকে টব থেকে তুলে মাটিতে বসাবার কর্তব্যে রবীন্দ্রনাথ অবিচলিত রইলেন। তখনকার রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র চিঠিপত্রে নন্দলালকে নিয়ে দুজনের মধ্যে অভিমানের চিহ্ন কিছু রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে বেশ কঠিন করে বলতে হয়েছিল,

> তোমরা দেশে যে বীজ বপন করেছ সেটাই যাতে অঙ্কুরিত এবং স্থায়ী হয়ে সমস্ত দেশের চিরন্তন জিনিস হয় এই আমার কামনা ছিল।...কলকাতায় ভালো করে শিকড় লাগল না বলেই এখানে কাজ ফেঁদেছি।...নন্দলালের নিজের রচনাও এখানে যেমন অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে কলকাতায় তা হওয়া সম্ভবপর নয়।...যদি তোমরা এর ব্যাঘাত কর তা হলে আমার যা দুঃখ এবং ক্ষতি তাকে গণ্য না করলেও এটা নিশ্চয় জেনো নন্দলালের এতে ক্ষতি হবে এবং তোমাদেরও এতে লাভ হবে না।...নন্দলালের 'পরে আমার কোনো জোর নেই — কিন্তু ওর 'পরে আমার অনেক আশা আছে নিশ্চয় জেনো, সে আমার কাজের দিক থেকে নয়, দেশের দিক থেকে।— ('চিত্রকথা', পৃ. ২২১-২২)।

অবনীন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেও রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। ১৯২০ সালে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে স্থায়ী হলেন এবং শুধু কলাভবন নয়, রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার সংগঠন ও পরিচালনার সঙ্গে ক্রমে তাঁর সম্পর্ক ওতপ্রোত হয়ে উঠল।

দুই অভিভাবকের টানের মধ্যে পড়ে নন্দলাল নিজে কী অনুভব করেছিলেন কোথাও বিশদ করে বলেন নি। কিন্তু বোঝা যায়, নিজেও ভিতরে ভিতরে একটা বড়ো পরিবর্তনের তাগিদ বোধ করছিলেন। শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়া চলছিল কিছু আগে থেকে। এখানকার আলো হাওয়া, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিকিরণে উদ্দীপ্ত পরিবেশ তাঁকে যে আবিষ্ট করত, এমন কথা নন্দলাল নিজে বলেছেন অনেক-বার। কিন্তু মুগ্ধতার চেয়েও গভীরতর কারণ ছিল। কলকাতার আবদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তির, ঘনিয়ে আসা সংকটবোধের চাপ থেকে ত্রাণের উপায় পেলেন। শান্তিনিকেতনে আসার অর্থ অনেক বড়ো দায়িত্বের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। নিজের সামর্থ্য নতুন করে যাচাই করার আগ্রহই এই ডাকে সাড়া দিতে তাঁকে সংকল্পবদ্ধ করেছিল।

উপকরণরিক্ত সেদিনের এই প্রতিষ্ঠানের সামনে রবীন্দ্রনাথ শুধু আধুনিক মনুষ্যত্বের পূর্ণতার একটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সঙ্গতি প্রায় কিছুই ছিল না। যাঁরা এখানে আসবেন তাঁরা জায়গাটিকে নিজের মনে করে আসবেন, উদ্দেশ্যের পূর্ণতায় পৌঁছবার উপায় তাঁদেরই শক্তি দিয়ে, প্রতিভা দিয়ে তৈরি করে তুলবেন— রবীন্দ্র-নাথ এমনিতর আত্মোৎসর্গই প্রত্যাশা করতেন। কাউকে চাকরি করতে ডাকেন নি। জীবনের শেষ দিকে এ প্রতিষ্ঠান পত্তন করা আদৌ উচিত হয়েছিল কিনা— ক্ষোভে এমন ভাবনাও তাঁর মনে এসেছে। কর্মী-সহযোগীদের মধ্যে সকলের মানসিকতা শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে নি, উদ্দেশ্যের একতা অটুট থাকে নি। যে সামান্য কজন মানুষ ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার চাপ নীরবে বহন করে ক্রমে বেড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন, নন্দলাল বসু তাঁদের একজন।

৯

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছিলেন, ভারতীয় আধুনিক শিল্প শহুরে হয়ে আছে। দেশের মাটিতে তার শিকড় চারায় নি। আবার এও ঠিক যে, বছর-পঁচিশ সময়ের মধ্যে, ১৯২০ অবধি, শিল্পে আধুনিকতার একটা স্তর তৈরি হয়েও উঠেছিল। নন্দলাল যখন কলকাতা ছেড়ে গেলেন সে সময়ে শিল্প সম্পর্কে উৎসুক মানুষের সামনে অবনীন্দ্র-ধারার এবং অবনীন্দ্র-ধারার বাইরের বেশ কিছু সমর্থ শিল্পী ছিলেন। তাঁদের কাজের পরিমাণও কিছু উপেক্ষা করার মতো নয়। অবনীন্দ্র-ধারার শিল্পী বা বেঙ্গল স্কুলের মুখ্য শিল্পী, অসিতকুমার হালদার-ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার-সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত-শৈলেন্দ্রনাথ দে-কে. ভেংকটাপ্পা— এঁদের কাজকেই তখন ভারতীয় আধুনিকতার মূল ধারা মনে করা হত। শৌখিন মেজাজের অভিজাত মানুষ অসিতকুমার হালদার বা বৈষ্ণব-

সদাচারনিষ্ঠ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার সাহিত্যিক রুচির ভিতের উপরে কিছু ভালো কাজ করে গিয়েছেন।

অসিতকুমার ছিলেন কবিত্বে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের বিশ্বাত্মবোধের মতো আবেগ অসিতকুমারের কবিতাতে অবিরল প্রকাশ পেত। তাঁর 'খেয়ালিয়া' বইয়ে সংকলিত কবিতায় কিছু শুদ্ধ লিরিক পঙক্তি মিলবে। এই মানুষের হাতে তুলিও চলত লিরিক ধাঁচে। রেখার লীলায়িত গতিভঙ্গি তাঁর ছবির ভাবাশ্রয় রচনা করত। রঙ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সংযত, অভিব্যক্তির অবলম্বন মূলত রেখা। পৌরাণিক বিষয় নিয়েও অসিতকুমার ছবি করেছেন। কিন্তু প্রায়ই সেসব কাজ পুরাণের সীমা পেরিয়ে সাধারণ মানবিক আবেদনের স্তরে পৌঁছেছে। যেমন 'শিশুকৃষ্ণ কোলে যশোদা' ছবিতে। অজন্তায়, বাঘগুহায় ছবি নকলের অভিজ্ঞতায় বড়ো ক্যানভাসে কাজ করার সাহস পেয়েছিলেন। রামচন্দ্রর সঙ্গে গুহ-র মিলনের দৃশ্যে পট জুড়ে নরনারীর সমাবেশটিতে বিন্যাসের বোধ এবং বাঁধুনির দক্ষতার পরিচয় আছে। অভিনিবেশ এবং পরিশ্রমের ছাপ তাঁর সব বয়সের কাজেই অনুভব করা যাবে। ওমর খৈয়ামের রুবাই ধরে ছবি করার জন্য তিনি পারস্যের কলারীতি গভীর-ভাবে অনুশীলন করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ওমর খৈয়াম সিরিজ মনে রেখে অসিতকুমারের ইলাস্ট্রেশনগুলি দেখলে বোঝা যায় কত সতর্কভাবে তিনি গুরুর প্রভাব এড়িয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছেন। বহু বার বহু শিল্পী ওমর খৈয়াম সিরিজ এঁকেছেন। তার মধ্যে অসিতকুমারের কাজ নিজ মর্যাদায় উজ্জ্বল। কাঠের উপরে গালার রঞ্জনে ছবি করার পরীক্ষায় একটা নতুন আঙ্গিক তাঁর হাতে তৈরি হয়। একে তিনি ল্যাকসিট lacsit বলতেন। কাঠের স্বাভাবিক আঁশের বিন্যাস কাজে লাগিয়ে চমৎকার সব নকশা ফোটাতেন। 'দি স্পিরিট অব দি ফাউন্‌টেইন'-'দি স্পিরিট অব দি ফায়ার'-'দি স্পিরিট অব দি এঅ্যার'— এই একটি পর্যায় তাঁর ছবির। অসিত-কুমারের প্রবণতা ছিল সাংকেতিকতার দিকে। প্রায়ই প্রতীক সৃষ্টি করতেন। যেমন 'নেচার মিস্টিরিয়স' ছবিটি। একটি প্রকৃতি-দৃশ্যর উঁচুর দিকে ক্রমে নারীর রূপাভাস, তাকে ছাড়িয়ে কোনো বৃদ্ধের রূপাভাস জাগিয়েছেন। যেমন ল্যাকসিট আঙ্গিকে করা 'বিশ্বমাতৃকা'— শিশু প্রতীকে বিশ্বকে ধারণ করে আছে বিশ্বমাতৃকা। জেমস কাজিন্‌-সকে একবার অসিতকুমার লিখেছিলেন, "শুধুই রূপ সৃষ্টি তো শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়। তার লক্ষ্য মহত্তর, নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে সুন্দর ও সত্য প্রতীকিত করা।"* এই

*"An artists object is not merely to create form. He has a higher aim, namely, to symbolise eternal Beauty and Truth through the medium of his creation."—R, C, Tandan, *The Art of Asit K. Haldar*, Allahabad 1938, pp. 21-2

নীতিতে ছবির চিত্রগুণ চরম মূল্য পায় না। রঙ-রেখার বিন্যাস দর্শককে একান্ত টেনে না রেখে সংকেত করবে উধাও ভাবলোকে— এটা অসিতকুমার সচেতনভাবে চাইতেন। তাঁর সময়ের রুচিবোধে এতে কোনো আপত্তি ওঠে নি। সমকালীন সব প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি মর্যাদাও পেয়েছে। কিন্তু আজ প্রশ্ন ওঠে, দীর্ঘ চর্চা সত্ত্বেও তিনি কি ছবির কোনো নতুন ভাষা উদ্‌ভাবন করতে পেরেছিলেন। এদেশের শিক্ষা নয় শুধু, পশ্চিমি চিত্রকলায় সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা উপার্জনের জন্য তিনি ১৯২৩-২৪-এ য়ুরোপেও গিয়েছিলেন। কিন্তু সব জেনে, সব দেখেশুনে এবং হাতেকলমে কাজ করে তাঁর মনে হয়েছিল, য়ুরোপের আধুনিক ছবি তমোগুণে ভরা। অদ্ভুত-বীভৎস-ভয়ানক রসের আধার। ভারতীয় ধারার ছবিতে তিনি পেতেন নির্ভেজাল সত্ত্ব আর রজোগুণ। ১৯৫১ সালে লেখা এক প্রবন্ধে * মন্তব্য করেছিলেন, য়ুরোপের অতি আধুনিক শিল্পে আঙ্গিকের শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাময় কল্পনা খুব সামান্যই দরকার হয়। অবাক করা কথা! অসিতকুমার হালদারই তো তবু নন্দলালের পরে বাংলা ঘরানার সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী শিল্পী। সুচারু কাজও কিছু করেছিলেন। অসিতকুমারদের রবীন্দ্রনাথ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। তার ফলেই তিনি দেশের শিল্পচৈতন্যের সংকট ঠিক ঠিক আঁচ করতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন একটা সীমায় এসে এঁরা ঠেকে যাচ্ছেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অবশ্য খুব তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। নন্দলালের মতোই তিনি ছিলেন গেঁয়ো মানুষ। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-বৈষ্ণব পদাবলির রসে পুষ্ট মন নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখতে এসেছিলেন। আশ্চর্য এই যে, পরে আজীবন শহরে বাস করেও তাঁর চরিত্রে শহুরে পালিশ লাগে নি। এই ধরনের ব্যক্তিত্ব চটকদার আধুনিক পরিবেশের কৃত্রিমতার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রতিবাদও বটে। এঁরাই মনে করিয়ে দেন, বাংলা দেশটা কলকাতার বাইরেও আছে। ঘটনাক্রমে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে খুব বড়ো দায়িত্ব নিতে হয়। নন্দলাল চলে যাওয়ায় সোসাইটিতে ছাত্রদের শেখানোর দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্সায়। টানা আঠারো বছর তিনি এখানে শিল্পী তৈরি করেছিলেন। বলা যায়, অবনীন্দ্র-ধারার শিক্ষা তাঁরই মাধ্যমে উত্তর পুরুষে বর্তেছিল। তাঁর কাজ আলাদা করে চিনতে অসুবিধে হয় না। আজও বিশেষ করে তাঁর চৈতন্য বিষয়ে আঁকা ছবি আমাদের টানে। গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলালের চৈতন্য বিষয়ে আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা মনে জেগে ওঠে। ছবির মধ্যে বস্তু বিন্যাসে, বাতাবরণ তৈরিতে ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাজে ওঁদের থেকে আলাদা মেজাজ ফুটেছে। চৈতন্যব্যক্তিত্বের ভাবতন্ময়তা তিনজনের ছবিতেই এক মাত্রায় বাঁধা হলেও ক্ষিতীন্দ্রনাথে তৃণ-তরু-লতায় বাস্তব বাংলা অনেক বেশি সাক্ষাৎ। ছবিতে দেশের মাটির স্বাদ তিনি

* Asit K. Haldar, 'Indian Art and Ideology', *Roop-Lekha* Vol. XXII, No. 2, 1951.

খুব অনায়াসে, খুব একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এনেছিলেন। যামিনী রায়ের কথা প্রসঙ্গত এখানে মনে আসবে। ছবির আঙ্গিক নিয়ে যামিনী রায়ের বোঝাপড়ায় সচেতন আধুনিক মনের যে তীব্র সংকটবোধ ছিল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সে তুলনায় সাদামাটা ব্যক্তিত্বের শিল্পী। পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট রঙের প্রয়োগ, অশিথিল বাঁধুনি এবং অজটিল অভিব্যক্তির জন্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কিছু কাজ এখনও তৃপ্তি দেয়। কিন্তু অসিতকুমার বা ক্ষিতীন্দ্রনাথ—এঁরা সবাই আধুনিক ছবির যে ভাষা অবনীন্দ্রনাথ তৈরি করে দিয়েছেন তাকেই চূড়ান্ত মনে করতেন। এক নন্দলালই কখনও এমন মারাত্মক মোহে মজেন নি।

বেঙ্গল স্কুলের চর্চার সঙ্গে নিজেকে নানান ভাবে জড়িয়ে রেখেও একেবারে ভিন্ন শিল্পভাবনায় এই সময়ে নতুন পথ তৈরি করছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাপানি শিল্পী ইয়োকোইয়ামা তাইকান-হিশিদা শুন্‌সো ১৯০৩ সালে ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁরা কাজ করতেন। দক্ষিণের বারান্দায় চোখের সামনে দুই বিদেশি শিল্পীর কাজের দৃষ্টান্ত গগনেন্দ্রনাথকে গভীর প্রভাবিত করে। জাপানি তুলি নিয়ে নাড়াচাড়ায় তাঁর আগ্রহ যায়। আর্ট স্কুলের হেডমাস্টার হরিনারায়ণ বসুর কাছে বিলিতি জল রঙের কাজও নিয়ম করে কিছুদিন শিখেছিলেন। জাপানি কালি-তুলির কাজে যদি কোনো শিল্পীর মন যায়, তাঁর কাজে ছবির মধ্যে আলোর ব্যবহার সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা আসবেই। জাপানি সাদাকালো ছবির বিরাট সম্পন্ন ঐতিহ্যে ছবির মধ্যে আলো এবং না-আলোর সংঘাত ও মেলামেশা নিয়ে অতি বিচিত্র পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে। জাপান এবং এ কাজে জাপানের গুরু চীনের মতো করে আমরা আঙ্গিকটির সম্ভাবনা নিয়ে ভাবি নি। আধুনিক কালে গগনেন্দ্রনাথ-নন্দলাল জাপানি নজির থেকে শিক্ষা নিয়ে সাদাকালোয় অতি আশ্চর্য সব কাজ করেছেন। এই থেকেই গগনেন্দ্রনাথের মাথায় আলোর সমস্যাটা জমে বসেছিল। তাঁর প্রাথমিক কাজ, ১৯১০-এর আগেই করা, কাক-এর স্টাডিগুলি তাঁকে কালিতুলির রহস্য ধরিয়ে দিয়েছিল। কাকের চরিত্ররূপ ফোটাতে জমাট কালি থেকে কালির হালকা রেশ রেখে টানা তুলির কাজে মনোযোগী দর্শক শিল্পীর সূক্ষ্মবোধ এবং কব্‌জির জোর টের পাবেন নিশ্চয়। অনুভব করবেন, আলোর স্পন্দন কতভাবে তিনি কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর হাতের রঙিন ছবিতেও এই আলো ব্যবহারের পরীক্ষার ধারাবাহিক বিকাশ দেখা যায়। বিলিতি জলরঙের শিক্ষা তিনি জাপানি তুলির চাল বজায় রেখে ব্যবহার করেছেন। তাঁর তুলিতে বিলিতি ধরনের বাস্তবতা আসে না। অবয়বগুলি, গাছপালা-পাহাড়-সমুদ্র— কোনো কিছুই অবিকল বাস্তব করে তোলার প্রয়োজন বোধ করেন না। আলোর অবস্থান, আলো বিচ্ছুরণের মাত্রা অনুযায়ী বস্তুর বাস্তব চেহারাটা যে কতভাবে বদলায়— এই সম্পূর্ণ নতুন ধারণা আমাদের ছবিতে গগনেন্দ্রনাথ এনে-

ছিলেন। তাঁর নিপুণ কাজ 'জীবনস্মৃতি'-র ইলাস্‌ট্রেশনে দেখা যাবে. চাপাপড়া আলোর বিচ্ছুরণে বা মিইয়ে আসা আলোয় বা চাঁদের মেদুর আলোয় দৃশ্যবস্তুর স্পর্শ-গুণ কেমন বদলে যাচ্ছে। ঠিক এই পরীক্ষার আশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত আছে হিমালয় দৃশ্যা-বলিতে। পাহাড় তো আলোর খেলায় সবচেয়ে পটু। প্রতিফলিত আলোর ধাক্কা, ভাঙাচোরা আলোর জ্যামিতিক বিন্যাস পাহাড়ই ভালো দেখায়। এবং সে অভিজ্ঞতা গগনেন্দ্রনাথ পুরো কাজে লাগিয়েছেন। চৈতন্য সিরিজের ছবিতেও রঙের উদ্দীপনার অত্যন্ত নিপুণ ব্যবহার আছে। সামান্য রেখার আভাস দিয়ে রঙের পটিগুলিকে অব-য়বের আকার দিয়েছেন। ১৯২০-২১ অবধি তাঁর এইসব কাজ। কিন্তু আরও পরে যে নতুন ধারায় প্রচুর ছবি করেছিলেন— যাকে কখনও কিউবিস্ট, কখনও রূপকথার জগতের ছবি বলা হয়— সেখানে আলোর প্রয়োগ আরও বিচিত্র হয়েছে, আরও জম-জমাট হয়েছে। রঙে হোক, বা সাদাকালোয় হোক, ছবির মধ্যে ভাঙাচোরা আলোর বিন্যাসেই বস্তুর আকারগত গুণ শিল্পী অতি তীব্রভাবে প্রক্ষেপ করেছেন। একাজে আবেগের উদ্বেলতা নেই কোথাও। আছে মগজের শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত রূপ-সংস্থানের সামর্থ্য। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ-উত্তর য়ুরোপীয় চিত্রকলায় প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড তাগিদ শিল্পের বিশ্বদৃষ্টি আমূল বদলে দিয়েছে। আমাদের এখানে সেই আন্তর্জাতিক আধুনিকতার তাৎপর্যময় সূচনা হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে। গগনেন্দ্রনাথের সৃষ্টির তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। তাঁকে কলাভবনে কাজে লাগানোর কথা কি কখনও ভেবেছিলেন? ভাবলেও সে ভাবনা কাজে আসত না। ঘরকুনো গগনেন্দ্রনাথকে কলকাতা থেকে নড়ানো রবীন্দ্রনাথের সাধ্যে ছিল না।

আশ্চর্য এই যে, হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথের বিরোধী রণদাপ্রসাদ গুপ্তর অনুগামী য়ুরোপপন্থী শিল্পীদের মধ্যে কেউ আমাদের ছবিতে সত্যিকার আন্তর্জাতিক হাওয়া বহাতে পারেন নি। শশীকুমার হেশ-যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়-হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার থেকে অতুল বসু অবধি অবনীন্দ্র-ধারার বাইরের শিল্পীদের পরিচয় শেষ পর্যন্ত প্রতি-কৃতি রচনার খ্যাতি আশ্রয় করে টিকে থাকল। পোর্ট্রেটে বিশেষ করে অতুল বসুর ব্যক্তিগত শৈলীর বিকাশ স্মরণীয়। সকলেই এঁরা শক্তি ধরতেন। অথচ সে শক্তি দেশের মাটিতে ভালো করে শিকড় মেলতেই পারে নি। এ ধারার শিল্পীদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম শুধু যামিনী রায়। য়ুরোপীয় শিল্প প্রকরণে পূর্ণ অধিকার এবং বৈষয়িক সফলতা সত্ত্বেও এক যামিনী রায়ই নিরালম্বতা বোধের যাতনায় নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়েন। বাংলা ছবির এক অসামান্য আধুনিক উত্তরণ তিনি ঘটিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সে ১৯২০-র অনেক পরের কথা।

এই পরিবেশে শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার দিক থেকে য়ুরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে নতুন করে বোঝাপড়ার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালেরই সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা

করলেন। য়ুরোপ-সিদ্ধ কোনো প্রবীণ বা তরুণ শিল্পীর নয়।

১০

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের বিশ্বমুখী অভ্যুত্থানের নিজস্ব প্রকল্প রূপায়ণের বিশ্বস্ত সঙ্গী, সহকর্মী এই নন্দলাল সম্পর্কে বলছেন,

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। এ রকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ-রূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সে দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

···আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ।·· ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না। সেই শক্তিকে, তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

···

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত।··· সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ।···তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।

···

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর-একটি লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর অবিচলিত ধৈর্য।···তাঁর মন গরিব নয়।··· নিজের রচনায় যেমন, নিজের স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।"—(বি-ভা-প, নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ. ৫-৭)।

মহত্তম ভারতীয় আধুনিক রবীন্দ্রনাথের এই অবলোকন থেকে মানুষ ও শিল্পী নন্দলালকে বোঝার অনেকটা আলো পাওয়া যায়। খাটো ধুতি, কাঁধে গামছা, প্রায় অভব্য চেহারার এই ধুলোবালি মাখা মানুষটি সম্পর্কে "অভিজাত" শব্দ ব্যবহারে অনেকেরই ভুরু কুঁচকে উঠতে পারে। শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য মশায়ের মুখে শুনেছি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমবার নন্দলালের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তাঁকেই বলেছিলেন— বাবুকে ডেকে নিয়ে এসো। নন্দলাল বাগানের কাজ ফেলে ভেতর থেকে একটু সাব্যস্ত হয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়াতে শরৎচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। এই মানুষ সম্পর্কে "অভিজাত" শব্দটি ব্যবহার করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমাদের কালের আধুনিকতার দোআঁশলা চেহারা-চরিত্রের ছকের মধ্যে মানুষটিকে খাপ খাওয়ানোই মুশকিল। বোঝা সত্যিই কঠিন, কী করে ওই আকৃতির মধ্যে বাস করত উঁচুমাত্রায় বাঁধা নিরাসক্ত স্থিতধী প্রখর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন একটি আভিজাত্যময় আধুনিক মন। অবনীন্দ্রনাথ তো দেশের শিল্পের এলাকায় এমন সংস্কৃতিবান দেশীয় আধুনিকদেরই দেখতে চেয়েছিলেন। একালের শিল্পীদের আদিগুরুর সে প্রত্যাশা নন্দলাল ছাড়া অন্য কারো মধ্যে তেমন পুরো অবয়ব পায় নি। আর মনে আসে যামিনী রায়ের ব্যক্তিত্বের কথা।

ব্যক্তিগত স্বভাবের শুদ্ধাচারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, নন্দলালের "আত্মবিদ্রোহী শিল্পী" সত্তার প্রসঙ্গ। কোনো অভ্যাস বা "মুদ্রাভঙ্গি"র মোহ যে তাঁকে পেয়ে বসে নি, তারই প্রমাণ রয়েছে তাঁর উদ্যোগের অশেষ বৈচিত্র্যে। শান্তিনিকেতনে একটি কলাভবন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব শুধু নয়, এখানকার সামাজিক জীবনের উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, অভিনয়ের মঞ্চ ও সাজসজ্জা, গড়ে ওঠা আবাসগুলি শ্রীময় করে তোলা, পোশাক-আশাক, আসবাব, মুদ্রণ— যাবতীয় আয়োজনে নন্দলালকে লিপ্ত থেকে রুচির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের ব্যাপক দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কাজের দাবি না থাকলে খুব শক্তিমান মানুষও ঝিমিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল কাজের দাবি বাড়িয়ে চলার স্বাভাবিক গতি। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল তাই নানা আয়তনে নিজেকে বিকশিত করার অফুরন্ত সুযোগ পেলেন। শক্তিপরীক্ষার নতুন নতুন ক্ষেত্র তাঁর সামনে ক্রমেই খুলে গেছে এখানে।

অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতীয় আধুনিক শিল্পের প্রথম তরঙ্গ জাগে এবং সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে যতদূর বাড়া সম্ভব বাড়েও। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় কলাকেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা থেকে জেগে ওঠা নতুন শিল্পদৃষ্টি ভারতে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। এসব সাফল্য সত্ত্বেও অতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ অনুভব করছিলেন, আমাদের শিল্পচর্চা আধুনিক বিশ্বের "বড়ো রাস্তায়" গিয়ে দাঁড়াবার মতো জোর পাচ্ছে না। কলাভবন থেকে আর একটা তরঙ্গ জাগিয়ে তোলার

আয়োজন করবেন সংকল্প করে সমর্থ সহযোগী হিশেবে নন্দলালকে বেছে নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগে নতুন করে আধুনিক পাশ্চাত্যের সঙ্গে, প্রাচ্যের অন্য দেশগুলির সঙ্গে পরিচয় এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা তিনি করলেন।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ স্তেল্লা ক্রাম্‌রিশকে কলাভবনে আনেন এবং তাঁর ক্লাসে ছাত্র শিক্ষক সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ক্রাম্‌রিশের আলোচনাধারার দুটি দিকের কথা বলেছেন। প্রথমত, তিনি ভারতীয় শিল্পের ভাবাদর্শের পরিবর্তে আঙ্গিকগত বিশিষ্টতা এবং উপাদান বিশ্লেষণ করতেন। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টান্ত ধরে ধরে য়ুরোপীয় শিল্পে কিউবিজম পর্যন্ত আঙ্গিকগত বিবর্তনের ইতি-হাস আলোচনা করেন। বিনোদবিহারীর মন্তব্য,

> ইমপ্রেশনিজম থেকে কিউবিজম পর্যন্ত বিশদ আলোচনা যে সময় [১৯২১] ক্রাম্‌রিশ করেছিলেন তখন ভারতের শিল্পীসমাজ এ বিষয়ে সচেতন হন নি। —('চিত্রকথা', পৃ. ১৫০)।

ক্রাম্‌রিশ এবং গগনেন্দ্রনাথ ১৯২২-২৩-এ ইন্‌ডিয়ান সোসাইটিতে শিল্পী কান্‌ডিন্‌স্কি এবং অন্য এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। য়ুরোপের আধুনিকতম ছবি কলকাতায় এই প্রথম দেখানো হল।

এই সময়ে কলাভবনে ফরাসি শিল্পী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্‌পেলে স্টিললাইফ, পোর্ট্রেট, ল্যান্‌ডস্কেপ শেখানো শুরু করেন। তাঁর মাধ্যমে পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্ট যুগের ছবির আঙ্গিকের সঙ্গে কলাভবনের শিল্পীরা পরিচিত হন। কার্‌পেলে কাঠখোদাই এবং এন্‌-গ্রেভিংও শেখাতেন। অগুস্ত রোদ্যাঁর ছাত্র এমিল আন্তোয়ান্ বুর্দেল। বুর্দেলের ছাত্রী শ্রীমতী মিলওয়ার্ড এর কিছুদিন পরে কলাভবনে আসেন। ইনি বড়ো শিল্পী না হলেও আধুনিক য়ুরোপীয় ভাস্কর্যে কাজের পদ্ধতি দেখাতে পারতেন। এঁরই কাছে সামান্য সাহায্য পেয়ে ভারতীয় ভাস্কর্যে রামকিংকর বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে স্মরণীয়, প্রতিমা দেবীকে ফরাসি দেশ থেকে ফ্রেস্কোর কাজ শিখিয়ে আনা হয়েছিল।

এ-সব তথ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাশ্চাত্য শিল্প বলতে ইংলন্‌ড নয়, আধুনিক শিল্পে বিচিত্র আন্দোলনের মূল ভূখণ্ড পশ্চিম য়ুরোপের সঙ্গে যতটা সম্ভব সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। হ্যাভেলের উদ্যোগ এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাত। আধুনিক বিশ্বের মূল ধারার সঙ্গে কোনো-ভাবে যুক্ত করে দেওয়া ভিন্ন দেশীয় শিল্পের অবসন্নতা ঘোচানো যাবে না, রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝতে পারছিলেন। হ্যাভেল থেকে প্রায় তিন দশক পরে এই ভাবনা আসা স্বাভাবিক ছিল। আরও কিছু পরে ১৯২৬-এ একটি ভাষণে জাতীয় শিল্পের ছাঁচ তৈরির অর্থহীনতার কথা স্মরণ করিয়ে, তিনি শিল্পী সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, ব্যাপক সংবেদনশীলতাই মানব-আত্মার গর্ব, সপ্রাণ সজাগ মানব-আত্মা সর্বত্রগামিতার অধিকার

দাবি করে। শিল্পমুক্তির আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিল্প লুপ্ত কালের বিজন অনন্তে অবিচল চমকপ্রদ কোনো কবর নয়। জীবনের শোভাযাত্রার মধ্যেই তার জায়গা।* কলাভবনের শিক্ষাবিধিতে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। শিল্পীদের তিনি অনুভব করাতে চেয়েছিলেন, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও উৎকর্ষের চরম সীমায় শিল্পের কোনো জাতিগত গণ্ডি থাকে না। আর, সেই উৎকর্ষে পৌছুবার উপায় বা প্রকরণ শিল্পীর প্রবণতার উপরেই নির্ভর করে। আঙ্গিকেরও কোনো জাত নেই।

শুধু ভাবনায় নয়, কিছুদিনের মধ্যে নিজে ছবি আঁকায় হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিল্পে জাতীয়তার কৃত্রিম গণ্ডি ভেঙে দিয়েছিলেন।

আমাদের কলারসিক মহলে একটা সংশয় আছে নন্দলালকে নিয়ে। প্রশ্ন তোলা হয়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা সর্বতোভাবে অনুসরণ করার মানসিকতা কি তাঁর ছিল? নিজের মধ্যে কি তিনি কোনো প্রতিরোধ অনুভব করতেন? কলাভবনে তাঁর প্রকৃত ভূমিকার তথ্য এবং তাঁর নিজের ছবির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে এ প্রশ্নের নিরসন হতে পারে। জল্পনায় নয়।

কলাভবন পরিচালনায় কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও নন্দলাল যে কোনো বিশেষ রীতির দিকে ছাত্রদের চালিত করতে চেষ্টা করেন নি, সেকালের ছাত্ররা সকলেই একথা বলেছেন। ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে নজর রাখা, কোনো সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করা এবং দরকার হলে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করা— এর বেশি নিয়ন্ত্রণে নন্দলাল বিশ্বাস করতেন না। সকলকে এক ছাঁচে গড়বার পণ্ডশ্রম না করে তিনি দেশি বিদেশি শিল্পের নানা আঙ্গিক প্রবর্তনে অনেক বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন। গ্রাফিক্‌সের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা, একের পর এক ফ্রেস্কো মাধ্যমের কাজের আয়োজন, আবার সঙ্গে সঙ্গে পট-পাটা-আল্‌পনা, তিব্বতি তান্‌কা, জাপানি পদ্ধতিতে উডকাটের অনুশীলন— ক্রমে কলাভবনে শিল্পচর্চার বৈচিত্র্য এবং আয়তন বাড়িয়েছে। এইসব উদ্যোগের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কোনো আঙ্গিককেই নন্দলাল অস্পৃশ্য মনে করেন নি। করলে ইতালির ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ' (১৯২৮) ভিত্তিচিত্র করতেন না, বা লিথো-ড্রাই পয়েন্ট-

* "The human soul is proud of its comprehensive sensitiveness; it claims its freedom of entry everywhere when it is fully alive and awake.…

"Art is not a gorgeous sepulchre, immovable brooding over a lonely eternity of vanished years. It belongs to the procession of life…."

—Rabindranath Tagore, *On Art & Aesthetics*, Calcutta 1961, p. 60 & 62.

এচিংয়ের মতো মাধ্যম ব্যবহারে উৎসাহ বোধ করতেন না। ভারতীয় শিল্পের মূলনীতি বর্জন না করেই তিনি ভিন্ন ঐতিহ্য থেকে পাওয়া করণ-প্রকরণ ব্যবহার করেছেন। এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট বা খোদাই ছবিতেও তাই সেই একই নন্দলালের হাতের রেখার ছন্দ ফোটে, যা তাঁর ছবির মূল ভিত্তি।

কলাভবনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অবলোকন সবচেয়ে মূল্যবান। ছাত্র হলেও বিনোদবিহারী কখনও নন্দলালের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে নন্দলাল কলাভবনকে "সংকীর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন"— এমন সমালোচনাও করেছেন। (চিত্রকর, পৃ. ৪৬)। সত্যজিৎ রায়কে বিনোদবিহারী রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথায় বলেছিলেন,

> তিনি আমায় লিখেছিলেন, সে চিঠি আছে, যে তুমি যদি নন্দলালকে ছেড়ে না দাও, তাহলে তুমি যা করেছ সব শেষ হয়ে যাবে।— (এক্ষণ, ১৪ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)।

এমন কষাটে মন্তব্য সত্ত্বেও সুস্থির বিচারে বিনোদবিহারীকে বলতে হয়েছে, দেশী রং,

> কাগজ, পরম্পরার ক্ষেত্রে জাতীয় আভিজাত্য থাকলেও নন্দলালের শিক্ষা বৃহত্তর শিল্পপরম্পরা সম্বন্ধে তখনও যথেষ্ট সচেতন। অ্যানাটমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং রীতিমত অ্যানাটমির চর্চা ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রবর্তিত করেন এবং নিজেও এ বিষয়ে নূতন করে চর্চা শুরু করেন।
>
> ...
>
> লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, ডুরার ইত্যাদি শিল্পীদের তিনি অনুশীলন করেন এবং প্রয়োজনমত ছাত্রদের এই ড্রয়িং-এ অনুলেখন করতে উৎসাহিত করেন। চিত্ররচনা বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কালে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শিল্পসংস্কৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সকল সময়েই তিনি অনুভব করেছিলেন।
>
> ··· কিউবিজম ও বিমূর্তবাদ সম্বন্ধে নন্দলালের মনে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। সাদৃশ্য-বর্জিত শিল্পরূপ সম্পর্কে নন্দলালের মনে নিরন্তর একটি সংশয়ের দোলা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে তাঁর সহকারীদের মধ্যে যখন বিমূর্ত শিল্পের চর্চা দেখা দিল তখন এই জাতীয় অনুশীলনকে নন্দলাল অনুকরণধর্মী শিল্পের মতোই দূরে রাখবার চেষ্টা করেন।··· অবশ্য নন্দলাল এই জাতীয় শিল্পসৃষ্টির কালে শিল্পীর সামনে কোনো বাধা উপস্থিত করেন নি। রামকিঙ্কর নির্মিত মূর্তিগুলি নন্দলালের উদার শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর।— (চিত্রকথা, পৃ. ১৭৮-৭৯)।

মতবিরোধের ক্ষেত্রেও একটিই কথা ছিল তাঁর। যে শিল্পী হয়ে গেছে তাকে কী করে বাধা দেব।

ভারতীয় আধুনিক শিল্পের আনুপূর্ব কোনো ইতিহাস যদি লেখা হয় কখনও, সে

ইতিহাসে স্বীকৃতি পাবে, আধুনিকতা বিকাশের দ্বিতীয়পর্বে নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বাস্তব কর্মধারায় সম্প্রসারিত করেছিলেন নন্দলাল বসু। এই পর্বের শিল্পকলার পরিচয় সংকলন করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রামকিংকর, বিনোদবিহারীর সঙ্গে নন্দলালের বেশ কিছু নানা মাধ্যমের কাজ একসঙ্গে না নিলে সে পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে যাওয়া অবধারিত।

১১

শান্তিনিকেতন পর্বে নন্দলালের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বিস্তার এল প্রধানত তিনটি দিকে। এমনভাবে প্রকৃতির মাঝখানে দিন যাপনের সুযোগ এর আগে পান নি। ঋতুচক্রের প্রভাবে প্রকৃতির বর্ণগত এবং রূপগত পরিবর্তন দেখার অফুরন্ত সুযোগ তাঁর পর্যবেক্ষণ নিপুণতায় এবং শিল্পদৃষ্টিতে অসাধারণ প্রসার এনেছিল। দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রদের শেখানোর দায়িত্ব বহন ছাড়াও এখানকার নিবিড় সামাজিক জীবনের উৎসবে অনুষ্ঠানে শিল্পশ্রী ফুটিয়ে তোলার মূল দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হয়। উৎকর্ষের মান দেশের আর-সব জায়গার তুলনায় এখানে অনেক উঁচু হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কেন-না রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত বোধের নিয়ন্ত্রণ থাকতোই। অথচ অনেক খরচ করে কোনো আয়োজন করার সঙ্গতি তখন আশ্রমে ছিল না। প্রকৃতি থেকে যা-কিছু উপাদান পাওয়া সম্ভব, কিংবা আশ্রমবাসীদের সঞ্চয়ে থাকত যেসব সহজলভ্য উপকরণ, তারই বিন্যাসে সাজিয়েগুছিয়ে তুলবার জন্য নিরন্তর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হত। মণ্ডন-অলংকরণ-বিন্যাসের এই ভাবনা থেকে ক্রমে আলপনা-শিল্পের, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়ের সাজসজ্জার নতুন রীতির জন্ম হয়েছিল। তৃতীয়ত, বিশ্ব ও স্বদেশের মিলনকেন্দ্র হিশেবে পরিকল্পিত এই প্রতিষ্ঠানের আর-সব কাজের মতোই শিল্পচর্চাতেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখার প্রেরণা দিতেন। সংকীর্ণ অভিমানের বাইরে এসে না দাঁড়ালে চিত্তের প্রসার সংকুচিত হয়ে যায়, ইতিহাসের সচল প্রবাহ থেকে মন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয় এখানকার শিল্পচর্চাতে প্রতিফলিত হল চীন-জাপান সহ বৃহত্তর প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের শিল্পকলা অনুশীলনের আয়োজনে। আমন্ত্রিত অধ্যাপকদের আলোচনা সভায় ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকরা তো বটেই, আশ্রমে থাকলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বসতেন। সারা বিশ্বের শিল্প-ইতিহাসের বিবর্তন এবং সম্ভব মতো আঙ্গিকের বিচিত্রতা সম্পর্কে চর্চার ধারাবাহিক এই আয়োজন নন্দলালের শিল্পচেতনা প্রসারে নানাভাবে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। যা-কিছু নতুন তথ্য জানা যেত, কলাভবনের প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে তার প্রভাব চারিয়ে দেওয়ায় প্রধান ভূমিকা তাঁকেই নিতে হত। তরুণ ছাত্রদের কৌতূহল যেত বিভিন্ন দিকে। ছাত্রদের স্বাভাবিক

প্রবণতা বিকাশের স্বাধীনতা এবং শিক্ষাবিধির শৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তিনি কলাভবন চালাতেন।

তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও প্রবণতার স্বরূপ ঠিক কী এবং কলাভবনের কাজে কী ধরনের টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁকে নিজের ভূমিকা পালন করতে হত এই প্রশ্ন মনে উঠবে।

রূপের গড়ন সঠিক তাৎপর্যে আয়ত্ত করার পদ্ধতিই মূল কথা। বিশ্বের সব শিল্পীকেই এইখানে একটা পথ বেছে নিতে হয়। য়ুরোপের আধুনিক শিল্পে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে মৌলিক আকারের ধারণা পাবার চেষ্টা প্রবল। বিশ্লেষণ মানেই টুকরো করে দেখা, একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা। নির্দিষ্ট আকারটিকে যথাযথ রেখায় ছকে নিয়ে তার অন্তর্গত বিন্যাস বুঝতে চেষ্টা করা। সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপরে প্রতিফলিত আলোর উদ্দীপনাকেও বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টায় য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পে বাস্তব চরাচরের নানা আয়তন উন্মোচিত হয়েছে। নন্দলাল বাস্তব চরাচরের রূপগত সত্য এরকম টুকরো করে করে বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে বোঝা খুব প্রয়োজন মনে করতেন না। প্রাচ্য শিল্পের বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত বোধ নিয়ে তিনি চরাচরের যাবতীয় আকারবদ্ধ দৃশ্যবস্তুর অভিব্যক্তির মূল ছন্দ ধরতে পারাকে রূপগত সত্য উপলব্ধির যথার্থ পদ্ধতি মনে করতেন। ক্লান্তিহীন অনুশীলনে এই পদ্ধতিতে তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের একটি অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতির তাৎপর্য স্পষ্ট বোঝা যায়,

> গাছ সম্পর্কে মাস্টার মশায় যা বলতেন, আমার মনে পড়ে। সাধারণত গাছ আঁকা হয় আগা থেকে। কিন্তু মাস্টারমশায় এরকম আঁকতেন না। বলতেন, গাছের দিকে চেয়ে দেখো, এখনকার এই রূপ কীভাবে পেয়েছে অনুভব করো। নিচ থেকে বেড়ে উঠেছে; তলার শেকড় থেকে শাখা আর উপরের প্রশাখার দিকে এর খাড়াই গতি। গাছটি অন্তর্গত নিজস্ব ছন্দ, প্রাণছন্দের রূপ অর্জন করেছে। তোমাকে সেই রূপটিই তুলে আনতে হবে।*

---

* "I am reminded of what *master-mashai* used to speak about trees. Usually one would start drawing a tree from the top. But with *master-mashai* it was not so. He would say : 'Look at a tree and feel how it has grown up to what it now is. It has grown from below ; its dynamism is vertical, from the roots below to the branches and sub-branches at the topside. The tree has acquired a form of its own inner rhythm, its essential rhythm. You shall have to bring that form out." Satyajit Ray, 'My Apprenticeship Under Nandalal', *World Window*. Vol-I, No. 3, April:May-Juhe 1961, pp. 17-18.

গাছের প্রাণছন্দের গতি ধরার জন্যে তুলির গতিও নিচ থেকে উপরে যাবে— এই তাঁর নির্দেশ। তৃণ-তরু-লতায় বা প্রাণী দেহে অভিব্যক্তির সামগ্রিক ধারণা আয়ত্তে আনাকেই তিনি শিল্পীর অনুধ্যানের বিষয় মনে করতেন। শারীরবিদ্যা অনুযায়ী প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ বা নিহিত জ্যামিতিক আকারের ভিত্তি উন্মোচনের আয়াস তাঁর ভাবনায় তেমন গুরুত্ব পায় নি। মূল ছন্দটা ধরতে পারলে পেশী-স্নায়ু-অস্থি বিন্যাসের রহস্য ঠিক ঠিক আয়ত্তে এসে যায়— এ ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। বস্তুর সামগ্রিক গড়নের ছন্দ যে মূল রেখা-গতি আশ্রয় করে থাকে, সেই রেখাই রূপসত্তার আশ্রয়। প্রাণময় বা নিষ্প্রাণ যে-কোনো বস্তুর, এমন কী ব্যাপ্ত কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও রিয়ালিটি বা সত্যস্বরূপটি মূল রেখা-গতি অনুসরণ করে আয়ত্তে আনা যায়। তার সত্তাগত ছন্দটিকে ধরা যায়। ছবি হোক ভাস্কর্য হোক, শিল্পী মূল রেখাগতির ছন্দিত রূপটি বশে রাখতে সমর্থ হলে আনুষঙ্গিক উপাদান শৃঙ্খলায় বেঁধে অভিপ্রেত রূপ সৃষ্টিতে বাধা পান না। বলতেন,

> রিয়ালিটি অর্থে সত্য। শিল্পে সত্যটাই দেখতে চাই, বস্তুটা নয়।···শিল্পে রিয়ালিস্টিক অপেক্ষা রিয়ালিটিটাই দেখতে চাই।···রিয়ালিস্টিক ততটুকু করবে যতটুকুতে রিয়ালিটি প্রকাশ পায়।— (শি-শি-ন, পৃ. ৫৮-৫৯)।

বস্তুর রূপসত্তা উপলব্ধি এবং রূপায়ণের এই পদ্ধতির সঙ্গে প্রতীচ্যের পদ্ধতির মিল নেই। প্রাচ্য মেজাজে গড়নের রেখা অনুযায়ী বস্তুর রিয়ালিটি রূপায়িত করার প্রবণতা অলংকারিক শৈলীর জন্ম দিয়েছে। প্রতীচ্যের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি বস্তুর অবিকল রূপ অনুসরণের ধারায় ক্রমে গভীরে গিয়ে চরাচরের যাবতীয় বস্তুর অন্তর্গত মৌল জ্যামিতিক আকার উন্মোচন করেছে। মৌল আকারগুলির বিন্যাসে হেরফের ঘটিয়ে, প্রতিফলিত আলোর প্রতিক্রিয়া রঙের ভাষায় ধরার অন্তহীন পরীক্ষায় য়ুরোপীয় শিল্প রিয়ালিটি বশীভূত করেছে প্রাচ্য থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে। এদেশ ওদেশের মধ্যে আঙ্গিকের আদান-প্রদান বিশেষ শিল্পীর বেলায় মূল প্রবণতার এই ফারাক কমে আসতে পারে। বাইরে থেকে আসা কোনো প্রকরণ ব্যবহারে নন্দলালের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রাচ্য স্বভাব ছাড়েন নি।

এদিক থেকে তাঁর তুলনা চলে ওকাকুরা তেন্‌শিনের অনুগামী ইয়োকোইয়ামা তাইকান, হিশিদা শুন্‌সো বা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিল্পী শিমোমুরা কান্‌জান্‌-এর সঙ্গে। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে গিয়ে নন্দলাল লক্ষ করেছিলেন ভারতের মতো জাপান পরাধীন না হলেও য়ুরোপীয়, বিশেষত ফরাসি আধুনিক শিল্পের প্রভাব জাপানি শিল্পীসমাজে কত দল উপদল সৃষ্টি করেছে। তাইকানের নেতৃত্বে একদল শিল্পী তখনও নিজেদের ঐতিহ্যের জমিতে দাঁড়িয়ে জাপানি আধুনিকতার শিল্পভাষা নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন এবং মহৎ স্রষ্টার সম্মান উপার্জন করেছিলেন। এই অভি-

জ্ঞতায় নন্দলালের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঔপনিবেশিক শাসনের আনুষঙ্গিক চাপ যেখানে নেই তেমন প্রাচ্য দেশেও দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব কম তীব্র নয়। আর এ দ্বন্দ্ব বোধ হয় ভিস্যুয়াল আর্টস বা দৃশ্য-শিল্পেই তীব্রতর হয়ে থাকে। সাহিত্যে, নাটকে, সঙ্গীতে দেশীয়তার ছাঁচ সহজে ভাঙা যায় না। কিন্তু দৃশ্যশিল্পে একেবারেই ভিন্ন ঐতিহ্যের শিক্ষা আশ্রয় করে তাৎপর্যময় শিল্পরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব। বিষয়ের দেশীয় কাঠামো সত্ত্বেও তাকে তখন আর দেশীয় ঐতিহ্যের কাজ বলা যাবে না। যেমন নীরদ মজুমদারের তন্ত্র-চিত্রমালাকে ছবি হিশেবে ভারতীয় পরম্পরার অনুগত বোধহয় বলা যায় না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে কলাভবনে পশ্চিমি আঙ্গিকের চর্চা যেমন এল, তেমনি অনিবার্যভাবে পশ্চিমি শিল্পদৃষ্টি অনুসরণের প্রবণতা শক্তিমান তরুণদের মধ্যে দেখা দিল। য়ুরোপীয় শিল্পে এক-একটি গোষ্ঠীর দুঃসাহসী পরীক্ষায় দ্রুত যেসব আন্দোলনের তরঙ্গ জাগছিল তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগে এমন প্রতিক্রিয়া জাগা খুব স্বাভাবিক ছিল। বিশেষত, সব গণ্ডি ভেঙে শিল্পের "বড়ো রাস্তায়" আন্তর্জাতিক আধুনিকতার পথে বেরিয়ে আসায় রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে প্ররোচনা ও সমর্থন ছিল নিরন্তর।

> সৃষ্টির লীলা চারদিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্ট আজও আবিষ্কার করতে না পেরে থাকে, পুরাণকাহিনীর পুঁথির মধ্যে, প্রাচীন রাজপুতনার পটের মধ্যে যদি সে দেখার জিনিস খুঁজে বেড়ায় তাহলে বুঝব, কলাসরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকশিত হয় নি। তাই সে সেকেন্ড্‌হ্যান্ড্ আসবাবের দোকানে নির্জীব কাঠের চৌকি খুঁজতে বেরিয়েছে।—('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তারিখের প্রথম চিঠি)।

এরকম মন্তব্যের ইঙ্গিত উৎসাহী তরুণদের মনের কোন্ গভীরে নতুন ভাবনার তরঙ্গ তুলত, উদ্দীপনা জাগাত, বুঝতে অসুবিধা হয় না। নন্দলালকে ছেড়ে নিজের পথে এগোতে যে বিনোদবিহারীকে উসকে দেন— সেও এমনি দরকারি প্ররোচনার দৃষ্টান্ত। আবার, শিল্পী হিশেবে নন্দলাল বসুর সামর্থ্য সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের কোনো সংশয় ছিল না। অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন, আপন তুলির অভ্যাস ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলবার জীবনীশক্তি তাঁর 'প্রকৃতিসিদ্ধ', তিনি 'আত্মবিদ্রোহী' শিল্পী।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্খলা ভাঙতে চাইছিলেন? যে শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত বাঁধা নিয়মে শিল্পীদের আবদ্ধ করে তাকে ভেঙে দেওয়া নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। দৃষ্টিভঙ্গির এবং মতের নতুন নতুন সম্ভাবনার উন্মোচন চাইতেন তিনি। অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেওছিলেন,

> পুরানো আমলের কোনো রীতি অনুযায়ী ভারতশিল্পের মার্কা দেওয়া যাবে এমন কিছু উৎপাদনের দায় প্রবলভাবে অস্বীকার করুন— আমাদের শিল্পীদের কাছে এ আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। দাগানো জন্তু, যাদের— আলাদা গোরু নয়—



উমার ব্যথা ১৯২১ ওয়াশ



কুণাল ও কাঞ্চনমালা ১৯২৬ ওয়াশ

গোরুর পাল মনে করা হয়, তাদের মতো একই খোঁয়াড়ে ঢুকতে শিল্পীরা সদর্পে আপত্তি করুন।*

তখনকার কলাভবনের পরিস্থিতিতে বিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্ব যে ছিল, পরোক্ষ তথ্যে তো বটেই, প্রধান শিল্পীদের কাজ তুলনা করে দেখলেও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শিক্ষকের ভূমিকায় নন্দলালকে অসীম ধৈর্যে মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও সামগ্রিক শৃঙ্খলায় কাজ চালিয়ে নেবার নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। প্রতিভাবান তাজা এক ঝাঁক ছেলেমেয়ের অসীম উৎসাহে চঞ্চল সেই পরিস্থিতির ঠিক কেন্দ্রে থেকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডি টানার কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় নিয়ত নতুন পরীক্ষার পথ খুলে দেওয়া হচ্ছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে পুষ্টির উপাদান যা এসেছে— নন্দলাল নিজেও সে সারটুকু আত্মস্থ করে নিয়েছেন। কত আগ্রহে, কত যত্নে যে পশ্চিমি শিল্পের মর্ম তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন, ড্রয়িংয়ের খাতাগুলিতে তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। ছাত্রের নিষ্ঠায় ওদেশের মনীষী শিল্পীদের কাজ ধরে ধরে কপি করেছেন, অনুশীলন করেছেন। শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে নন্দলালের নিজের ছবিও দ্রুত বদলে গেছে, এটা লক্ষ করবার বিষয়।

১২

ছাত্র বয়স থেকে বড়ো কোনো কাজের উদ্দীপনা বোধ করলেই পুরাণ-প্রসঙ্গের আধার আশ্রয় করা নন্দলালের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। পৌরাণিক চরিত্রের বা পরিস্থিতির মহিমা তাঁর অভিনিবেশ পুরো আকর্ষণ করে নিত। দেবদেবীর ছবি আঁকতে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যেতেন। অবনীন্দ্র-ধারার শিল্পীদের এবং অবনীন্দ্রনাথের নিজেরও হিন্দু দেবদেবী আঁকার ঝোঁকের মূলে রবি বর্মার ধারাটা রোধ করার আগ্রহ কাজ করেছে নিশ্চিত। রবি বর্মার আঁকা থিয়েটারি ঢঙের দেবদেবীর প্রিন্টে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের হাতে দেবদেবীর ভিন্ন ছাঁদ এল। ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে, ছবি থেকে এঁরা রূপ কল্পনার উপাদান নিয়েছিলেন। অধ্যাত্মগভীরতা এবং সৌম্যতা ফোটানো, সকরুণ সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি করে তোলা— দেবদেবীর ছবিতে এঁরা এই নতুন রুচি আনেন। নন্দলালের হাতে দেবদেবীর রূপ ছাড়াও রামায়ণ-

* "I strongly urge our artists vehemently to deny their obligation to produce something that can be labelled as Indian Art, according to some old world mannerism. Let them proudly refuse to be herded into a pen like branded beasts that are treated as cattle not as cows." Rabindranath Tagore, *On Art & Aesthetics*, Calcutta 1961, pp. 60-1.

মহাভারত, পুরাণকাহিনী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গ অবিরল বিষয় হিশেবে ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই ধারার কাজেও কোনো চিরস্থির আদর্শ তিনি আঁকড়ে থাকেন নি। দেখা যাবে, ক্রমেই প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে আসা অভিজ্ঞতা প্রত্নপ্রতিমার আদর্শ বদলে দিয়েছে। চরিত্ররূপের মুখের আদল, দাঁড়াবার বা কোনো ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতে চোখে দেখা মানুষজনের প্রকট ছাপ পড়ছে। 'জগাই-মাধাই', 'কৃষ্ণ-সুদামা', 'শবরীর প্রতীক্ষা' ছবির কথা বলেছি। শিব-সতী বা কৃষ্ণ-অর্জুন বা বৌদ্ধ-পুরাণের প্রসঙ্গ নিয়ে বারে বারে আঁকা ছবিগুলির কথাও বলা চলে। চরিত্রগুলির মুখের এবং অবয়বের ছাঁদ বার বার বদলে গেছে। একটাই এর কারণ। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিপত্তি বেড়েছে এবং ছবি থেকে ক্রমেই অতিলৌকিকতার বাতাবরণ ঝরে গেছে। স্মরণীয় 'উমার ব্যথা' (১৯২১) বা 'কুণাল ও কাঞ্চনমালা' (১৯২৬) ছবি। পুরাণ সম্পর্কে পূত-মহিমা বোধ আর টিকছে না। প্রত্যাখ্যাত উমার নুয়ে পড়া তনুভঙ্গি, ঘাড়ের বাঁক —চোখে দেখা কোনো মেয়ের দেহভঙ্গি মনে রেখে আঁকা। পেন্সিল ড্রয়িংয়ে 'কুণাল ও কাঞ্চনমালা'য় কুণালের চরিত্ররূপে বাস্তব কোনো মডেলের ছাপ সুস্পষ্ট। ছবিটি অশোকের ছেলে কুণালের নামের সঙ্গে না জড়ালেও চলত। প্রত্নপ্রতিমা- সব ক্রমেই সন্নিহিত বাস্তবে নেমে এসেছে। সচেতনভাবে নামিয়ে আনা হয়েছে।

ম হা ভা র ত কাহিনীর মহিমায় তিনি অভিভূত বোধ করতেন। কুরুক্ষেত্রের সংঘাত এবং অন্তিমের বিবিক্ত বৈরাগ্য নিয়ে বার বার ছবি করেছেন। সেই নন্দলাল ১৯২০ সালে, তাঁর শিল্পীজীবনের এক বড়ো বাঁকের মুখে একটি নতুন ছবি করলেন সেই কুরুক্ষেত্রেরই পরিপ্রেক্ষিতে। রক্তে পিছল মাটিতে শুধু চারখানি পা, আর, বাঁধানো একখানা লাঠির নিচ দিক মাটিতে বসে আছে। পুরুষের ডান পায়ের আঙুল, নারীর ডান পায়ের আঙুল রক্ত-কাদার স্পর্শে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় অদ্ভুত ভাবে বেঁকে আছে। লাঠিখানা যেন পুরুষটির দেহের ভারে ঈষৎ বাঁকা। ছবির নাম 'ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী'। সন্তানদের রক্ত মাড়িয়ে চলেছেন। বেঁকে যাওয়া আঙুলগুলির উপরে চোখ পড়া মাত্র দর্শকেরও শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয়। বিহ্বল করে তোলে এই ছবি। এমন মানবিক ট্রাজিডির ছবি বেশি দেখি নি। পুরাণের মহিমায় তদ্‌গত মন থেকে এমন ছবি বেরোয় না। বেরোয় নির্মোহ আধুনিক মন থেকে, যে মন পুরাণের প্রত্নত্ব ভাঙে। ভেঙে গড়ে। নতুন শাঁস দেয়।

সমকালীন শিল্পানুরাগী মহল কি তাঁদের প্রিয় এই শিল্পীর এ দৃষ্টি বদলের তাৎপর্য ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন। 'রূপম' পত্রিকা 'ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, সোসাইটির প্রদর্শনীতে এই খামখেয়ালি রচনাটিকে অনেকেরই মনে হয়েছিল এক প্রহেলিকা— conundrum. (*Rupam*, April 1921, p. 42)। এই ছবি নর্মান ব্লান্ট প্রথম কেনেন। ছবিটি ঘরে থাকায় অস্বস্তিতে ঘুমুতে পারতেন না, তাই



কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ১৯২০ ওয়াশ



কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ১৯২০ ওয়াশ

শিল্পীকে ফেরত দিয়ে যান।

১৯১৯-এ 'শবরীর প্রতীক্ষা' এঁকেছিলেন — যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা শবরী। ১৯৪১-এ আবার আঁকলেন। দুই প্রস্থ কাজ পাশাপাশি ধরলেই শিল্পীর দৃষ্টি, মেজাজ এবং আঙ্গিকের প্রায় আমূল পরিবর্তন মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগের কাজ ছিল ওয়াশে। সে কাজে মূল চরিত্র এবং ছবির মধ্যে বিন্যস্ত বস্তুর সঙ্গে আকাশ বা স্পেসের সম্পর্ক নিয়ে খুব সতর্ক ভাবনার পরিচয় সহজেই ধরা যায়। তখনকার ধ্যান অনুযায়ী পটের জমি ভাগ করেছেন খুব হিশেব করে। চরিত্রের অবয়ব এবং বস্তুর আকার অত্যন্ত নির্দিষ্ট। সঙ্গে আছে রঙে রঙে মেলাবার দিকে সতর্ক দৃষ্টি। রঙের মিড় সযত্নে টানা তুলিতে ফোটানো ও মোলায়েম করে ছবি সারা বা ফিনিস করার দিকে এত নজর আর পরের কাজে দেখতে পাই না। ১৯৪১-এর সেটে দেখি যুবতী শবরী গাছের উপরে বসে দূরে চেয়ে আছে। টেম্পেরায় পুরু রঙের পোঁচ দিয়ে আঁকা গাছের কাণ্ড থেকে ডালপালায় যেমন, তেমনি শবরীর খোলা শরীরে কোথাও মসৃণতা নেই। তুলির ইতস্তত ছোঁয়ায় কিছু পাতার আভাস দিয়েছেন। আশপাশে মোটা আঁচড়ে কিছু গাছগাছালির বিন্যাস হয়েছে। ছবি পেলব হবেই, রঙে রঙে মিলে মিশে একটি অভিরাম দৃশ্য দাঁড়াবে— এমন চিত্রনীতি আর যে নন্দলাল মানছিলেন না, এই কাজ



দুর্যোধন ১৯৫৯ সাদাকালো

তাঁর একটি অব্যর্থ নজির। আরও লক্ষ করার বিষয়, ছবির মধ্যে স্পেসের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান নি। পটের উপর-তলের, সারফেসের মূল্যই গুরুত্ব পেয়েছে। একটু দূর থেকে দেখলে চাপানো রঙের বিন্যাস এবং স্তরে স্তরে ভাঙা আলোর প্রতিফলন সমেত ছবিটির এইসব গুণ সমগ্রভাবে নজরে আসে। নাম যদি 'শবরীর প্রতীক্ষা' নাও দেওয়া হত, তবুও এ ছবি শুদ্ধ চিত্রগুণে স্মরণীয় হয়ে থাকত। পুরাণের অনুষঙ্গ এভাবে প্রায় অবান্তর হয়ে উঠেছে তাঁর অনেক ছবিতে। এ কী এমনি এমনি হয়েছে! সজ্ঞানেই তিনি নতুন পরীক্ষায় এগিয়েছেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার সাক্ষ্য,

> চিত্র-বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে নন্দলাল একবার বলেছিলেন, সিন্ধুবাদের বুড়র মতো ছবির বিষয়ের ঘাড়ে অনেকদিন ধর্ম না-হয় আর-কেউ চেপে ছিল। চিত্রে অঙ্কন-বিষয়ের মূল্য খুব বেশী নয়, শুধু সে সাহায্য করে ছবির নামের পরিচয় দিতে। ছবির মূল্য তার রস সৃষ্টিতে।— ('নিরীক্ষা' পৃ. ১১৯)।

কোনো গল্প বলার কারণে নয়, বিশ্রুত কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যও নয়, ছবি ছবির ধর্মে মূল্য পাবে— এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (২১-৩০) আমাদের এখানে এই আধুনিক দৃষ্টি ক্রমে স্থির প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। নন্দলাল বসুর কাজেও সে চেতনার বিকাশ দেখতে পাই।

খুব সামান্য আয়োজনে অসামান্য আর-একটি ছবির কথা মনে পড়ে। অনেক পরের কাজ এটি। ছবির ভেতরে তারিখ আছে "১৬. ২. ৫৯"। সাদাকালোয় করা। ভগ্ন-উরু দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রে কোন্ এক ধারে পড়ে আছে। আকাশ থেকে শকুন নেমে আসছে। শেয়ালগুলো ঘিরে ধরেছে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ এক মহাবীর কোনোক্রমে বাঁ-হাতখানি তুলে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। সামান্য রেখায় আর কালোর রেশ,



শবরীর প্রতীক্ষা (যৌবনে) ১৯৪১ ছোপের কাজ

টোন দিয়ে সারা ছবিখানিতে প্রসঙ্গের অন্তর্গত রিক্ততা এবং প্রকরণের রিক্ততা বড়ো আশ্চর্য মিলনে মিলেছে। তিনটি ভাঙা রেখায় দেখানো দূর দিগন্তের বিস্তার ছবির মধ্যে পরাজিত ব্যক্তিত্বের অসহায় একাকীত্ব গাঢ় করে আনে।

এসব ছবিতে পৌরাণিক বিষয়-মাহাত্ম্য খোঁজা বৃথা।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে ক্রমে পুরাণ-প্রসঙ্গের দিকে তাঁর মনের টান কমে এল। বিষয়ের মহিমায় ছবির ভালোমন্দ নির্ভর করে না— এই বোধে উত্তরণ নন্দলালের শিল্পী জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনো বস্তুর রূপগত সত্য শিল্পীর কাছে সমান মহিমাময়— এই উপলব্ধিই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উত্তরজীবনের প্রসিদ্ধ উক্তিতে, "শালগাছ তালগাছ যদি আঁকি, তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব।"

শিল্পীর মনের চোখ এই পর্বে শুদ্ধ বস্তুরূপ এবং বস্তুর গঠনের তাৎপর্য খুঁজে ফিরেছে ক্লান্তিহীনভাবে। ঋতুতে ঋতুতে বাতাবরণের পরিবর্তন, আলোর মাত্রাভেদ এবং প্রকৃতির স্পষ্ট রূপান্তর তাঁর স্পর্শসচেতন মনের গ্রহণক্ষমতা দিনে দিনে বাড়িয়েছে। কলাভবনের ছাত্রদের চেয়েও অনেক বেশি পরিশ্রমে তিনি নিয়ত প্রকৃতি অনুশীলন করেছেন। এর প্রমাণ রয়েছে অজস্র ছোটো-বড়ো স্কেচে এবং স্কেচ থেকে রূপান্তরিত পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যচিত্রে। ঋতু এবং প্রহর ভেদে চার পাশের রূপাবলি তুলে নেওয়া এবং মানুষের জীবনযাত্রার গতিভঙ্গি ভলিয়ে দেখার ব্যাকুল আগ্রহ ক্রমে তাঁর মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। যেখানেই গিয়েছেন অব্যাহত থেকেছে এই অনুশীলন। এমন সর্বতোভদ্র জীবনাগ্রহ কোনো শিল্পীর মনের গণ্ডি ঘুচিয়ে দেয় এবং রূপায়ণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। নন্দলালের হাতের কাজের বৈচিত্র্যে ও বিপুলতায় বিস্মিত হতেই হয়। অনুভব করতে হয় এমন করে যে নিজেকে নানা কাজের ধারায় মেলে ধরতে পারলেন, তার মূলে ছিল বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়ার শ্রান্তিহীন উদ্যম। একই বিষয় নিয়ে একাধিক ছবি করেছেন অনেক সময়ে, কিন্তু একটি অন্যটির অনুলিপি হয় নি। নিছক থিমের দিক থেকে মিল পাওয়া গেলেও প্রতিটি ছবির গুণগত আবেদন আলাদা। একটি দৃষ্টান্ত, 'নটীর পূজা' থিম নিয়ে করা বিভিন্ন সময়ের ছবি। এ ধরনের একই পর্যায়ের, কিন্তু বিভিন্ন সময়ের ছবি তুলনা করে দেখলে তাঁর শক্তির বিচিত্রমুখী প্রকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়।

তাঁর প্রথম দিকের বহু ছবিতে আলংকারিক গুণ খুব বেশি দেখা যাবে। উত্তরকালে ছবিতে এ প্রবণতা কমে এসেছে। জটিল বিন্যাসের চাপ ক্রমেই কমিয়ে এনেছেন। ছবির জমক অনেক কমেছে। দৃশ্যচিত্র ভিন্ন অন্যত্র রঙের পর্দা নিয়ে খেলার মেজাজ দেখা যায় না তেমন। রেখার নির্দিষ্ট ছন্দিত বাঁধুনির মধ্যে কম সংখ্যক রঙের সরাসরি প্রয়োগে আয়তনের বিশিষ্টতা এবং শরীর ও বস্তুর ভর নিরূপিত করে ছেড়ে দেওয়া ক্রমে তাঁর শৈলীর মূল লক্ষণ হয়ে উঠেছিল।



ঝড়ের রাতে ১৯২৩ ওয়াশ

আলংকারিক পারদর্শিতা এবং বিভিন্ন রঙের ঐক তানে জমাটি কাজের ভালো নমুনা ১৯২২-এ করা 'বীণাবাদিনী'। দেহভঙ্গির মূল ছন্দটির রেখাগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যে মিলিয়ে বসনভূষণের বিন্যাস, কাপড়ের পাড়ের ছোটো বড়ো নকশা, বীণাযন্ত্রের গায়ের নকশার অনুপুঙ্খ ধরে ধরে করা হয়েছে। গলার দুপাশ দিয়ে নেমে আসা চুলের এবং পিঠের উপর দিয়ে নেমে আসা চুলের প্রান্ত রেখাগুলির ছন্দ-গত মিল দেখলে রেখার প্রতিসাম্য সম্পর্কে শিল্পীর সূক্ষ্ম বোধের কথা মনে আসেই। তেমনি আলোর প্রতিফলনের হেরফের এড়িয়ে গিয়ে, রঙের জেল্লা স্তিমিত করে সম্বাদী রঙের তৃপ্তিকর কমনীয়তায় বাঁধা হয়েছে ছবিখানি। এ ছবিকে মনোরম বলতে ইচ্ছে করবে, যদিও গভীর কোনো তাৎপর্যে মনে দেগে বসে যাবার মতো কাজ নয়। কিন্তু প্রায় কাছাকাছি সময়ের 'ঝড়ের রাতে' (১৯২৩) ছবির অভিজ্ঞতা সহজে ভোলা যায় না। আলংকারিক রেখা এবং রঙের সূক্ষ্ম প্রতিসাম্য রচনার তন্ময়তায় নয়, শিল্পী ভিন্ন মননের স্তরে এই কাজটি করেছেন। আবহমণ্ডলের ঝড়ের ঝাপটা এবং ঢালু জমি বেয়ে নামতে থাকা মেয়ে তিনটির পরনের কাপড়ের প্রান্তরেখার তীক্ষ্ণতা বুঝিয়ে দেয় বাস্তবের উদ্দীপনায় সাড়া দেবার সংবেদনশীলতা কত তীব্র। মেদুর আলোর পর্দার সামান্য

অদলবদলে আকাশ এবং মাটির ভিন্ন চরিত্র ফুটিয়েছেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে। এ রকম ছবিকে ঠিক কোনো প্রথাগত শৈলীর ছকের মধ্যে ধরানো যায় না। নানামুখী পরীক্ষার পরিবেশে নন্দলালও যে নিজেকে ভেঙে গড়েছিলেন— এ ছবি তা প্রমাণ করে।

১৩

১৯৩০-এর পর থেকে আমাদের ছবির জগতে দ্রুত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রতিভা অকস্মাৎ নতুন উদ্দীপনায় পরিণত শিল্পভাষার এক ভিন্ন স্তর স্পর্শ করল। আরব্যরজনী সিরিজের ৪৫ খানি ছবিতে তিনি একদিকে চেনাশোনা মানুষজনের প্রায়-প্রতিকৃতি সমবায়ে ফ্যান্টাসির পরিমণ্ডল সাক্ষাৎ দৃশ্যরূপের আয়ত্তে নিয়ে এলেন। ছায়াতপের নিপুণ ব্যবহার, রঙের মায়া সৃষ্টির কুশলতা পেরিয়ে, অর্জিত দক্ষতার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে পটের জমি ব্যবহারে স্থাপত্যের গুণ আনলেন। চিত্রবিষয়ের বিন্যাসে যে বাঁধুনি ফুটে উঠল এই সিরিজের ছবিতে তাকে দেশি ছবির আলংকারিক রীতির নমুনা বলা চলে না। দীর্ঘ বিরতির পরে আবার তিনি ১৯৩৮-'৪২-এ আশ্চর্য করে দিলেন সব রীতি ভেঙে বস্তুর গড়নের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিময় চণ্ডীমঙ্গল-কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের ছবিতে। তীব্র ত্রিমাত্রিক রূপের এই উজ্জ্বল বর্ণময়, সরল অথচ দৃঢ় অভিব্যক্তিকে লৌকিক পটের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আধুনিক শিল্পী-মনের সাহস থেকেই এই রূপের উদ্ভব।

এই দশকেই ভারতীয় আধুনিক ছবির জগৎ নাড়া খায় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রবল আবির্ভাবে। রবীন্দ্রনাথ কাজ করে চলেছিলেন এই সময়ে সমস্ত চেনাজানা রীতির বৃত্তের বাইরে থেকে। সাধারণের কাছে তাঁর ছবি তখন পৌঁছয় নি, কিন্তু সমকালীন শিল্পীদের যে তিনি সচকিত করে তুলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-যামিনী রায়ের মন্তব্যে। যামিনী রায়ের কথায়— রাজপুত আমল থেকে আমাদের ছবিতে দুশো বছর ধরে শিরদাঁড়ার দুর্বলতা বেড়েই চলেছিল, রবীন্দ্রনাথের ছবি সেই দুর্বলতার প্রবল প্রতিবাদ। (বিষ্ণু দে, 'যামিনী রায়', ১৯৮৭, পৃ. ৮৩)। এ শিরদাঁড়ার উপাদান রবীন্দ্রনাথ সংকটাপন্ন সমকালীন পৃথিবীর কলাসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন। য়ুরোপের চিত্রকলায় তখন প্রচণ্ড ভাঙাগড়া চলেছিল। প্রতিষ্ঠিত কলাবিধি ভেঙে শিল্পীরা মানুষের যন্ত্রণাবোধ প্রকাশের নতুন ভাষা উদ্‌ভাবন করছিলেন। স্বদেশের কলাসংস্কৃতির আধুনিকতায় সেই তীব্র অন্বেষণের নজির রবীন্দ্রনাথের কাজে প্রতিষ্ঠা পেল— যদিও ঠিক তখনই এর পুরো তাৎপর্য এদেশে স্পষ্ট হয় নি।

অন্যদিকে কলাভবনের পরিবেশ থেকেই একেবারে ভিন্ন স্বভাবের দুই আধুনিক

প্রতিভার অভ্যুদয় হল এই সময়ে, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং রামকিংকর বেইজ। বিনোদবিহারী মুক্তমনে বলেন, "নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হত না···।" ('চিত্রকর', পৃ. ৩৬)। কথাটা ঠিকই। নন্দলালের অভিভাবকত্বে বিনোদবিহারী ভারতীয় শিল্পের আঙ্গিকগত মর্ম, জাপান-চীনের বিশিষ্টতা মিলিয়ে শিল্পের প্রাচ্য-ভুবনের পথ ধরে এগোতে পাশাপাশি য়ুরোপীয় শিল্পের মর্মও আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরম্পরা হুবহু অনুসরণ তাঁর স্বভাবে ছিল না। নিঃসঙ্গ নিভৃত মানুষ বিনোদবিহারী তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার জন্যই যেন অনুপুঙ্খের আচ্ছাদনহীন শুদ্ধ রূপ অনায়াসে ধরতে পারতেন। রেখাপাতে এবং রঙ প্রয়োগে সেই সবল সংকার রূপের শুদ্ধতা সাক্ষাৎ করে তোলায় তাঁর কবজির জোর শিল্পনীতির প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভেদাভেদ নিয়ে সূক্ষ্ম দুর্ভাবনা অবান্তর প্রমাণ করে দিয়েছে। পাশাপাশি ছবি এবং ভাস্কর্যে রামকিংকরের দুর্ধর্ষ সাহসিকতা অভ্যস্ত ব্যাকরণ ভেঙে রূপ নির্মাণের আধুনিক দৃষ্টান্তমালা সৃষ্টি করে তুলছিল। বাবু ভদ্রজনের মানসিক দোলাচল এ মানুষটির চরিত্রে কোনো সংকট আরোপ করে নি কখনও। খাদ বর্জিত তার শুদ্ধ শিল্পী স্বভাব লৌকিক ভারতীয় বাস্তবতা এবং শিল্পের আন্তর্জাতিক আধুনিকতা— দুই বিপরীতকে জ্যাবদ্ধ করতে পেরেছিল। তাঁরই হাতে ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্যের প্রতিষ্ঠা হল। কিউবিজম্, অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, এক্সপ্রেসনিজ্ম— এসব য়ুরোপীয় কলাবিধির বেশ জোরালো ঢেউ কলাভবনে এসে পড়ছিল। বিশেষত যে ছাত্ররা উত্তরায়ণ থেকে একটিমাত্র পথের এপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সময়ে কলাভবনে কাজ করছিলেন, তাঁরা তো শুধু অ্যালবাম্ থেকে নয়, প্রত্যক্ষভাবেই ভিন্ন আদর্শের বিকাশ খানিকটা দেখতে পাচ্ছিলেন। শিক্ষক নন্দলালের দুর্ভাবনা হত ঠিকই। হাত তৈরি হবার আগেই যদি কোনো ছাত্র খাপছাড়া ভাবে ওই পরীক্ষায় মেতে যায়— তার কি খুব উপকার হতে পারে, একথা ভাবতে হত। কিন্তু সত্যিই ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে যার হাতে, তাকে বাধা দেবার মানসিকতাও ছিল না। "এঁরা ছাত্র হলেও শিল্পী, তাঁদের সৃষ্টিকর্মে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। যা আমাদের নেই তা বাইরে থেকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।" ('চিত্রকথা', পৃ. ১৬৬)। সুস্থির এই নীতি তাঁকে দ্বিধাসংশয়ের উপরে উঠতে সাহায্য করেছে। "রামকিংকর-নির্মিত মূর্তিগুলি নন্দলালের উদার শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর"। ('চিত্রকথা', পৃ. ১৭৯)। বিনোদবিহারীর এ মন্তব্যের সূত্রে 'কচ ও দেবযানী' (১৯২৯), 'মিথুন' (১৯৩১), 'সুজাতা' (১৯৩৫)— রামকিংকরের এইসব প্রাথমিক ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত মনে আসবে। প্রতিটি কাজেই তিনি 'ভাস্কর্যের' নতুন কলাবিধির সার্থকতা প্রতিপন্ন করছিলেন। "বিনোদ, গিয়ে দেখো রামকিংকর মাটির কাজ করছে, তার হাতের dexterity দেখে বুক কেঁপে যায়। একি আর এক-জন্মের সাধনায় হয়েছে! অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিংকর জন্মেছে।" (*V-B-N*,



মধ্যাহ্নস্বপ্ন (গ্রীষ্ম) ১৯৩১ ছোপের

Sept.-Oct. 1980, p. 87) — বিস্মিত নন্দলাল বিনোদবিহারীর কাছে রামকিংকরের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন।

কলকাতায়ও নতুন হাওয়া উঠছিল। আর্ট স্কুলের পরিবেশ অবনীন্দ্রনাথ চলে যাবার পর থেকে ক্রমে বদলে যেতে থাকে। অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন অবনীন্দ্রনাথের জায়গায় য়ুরোপপন্থী যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীকে উপাধ্যক্ষ পদে আনেন (১৯১৬)। ১৯২৮ পর্যন্ত স্কুলের ফাইন আর্টস বিভাগ যামিনীপ্রকাশের হাতে ছিল। যামিনীপ্রকাশ ফাইন আর্ট ডিপার্টমেণ্ট "ফাইন আর্ট" এবং "ইন্‌ডিয়ান আর্ট"— দুই ভাগে ভাগ করলেন। ফাইন আর্ট ক্লাসটি বিশেষ করে য়ুরোপীয় কলাবিধি শেখাবার জায়গা হল। যামিনীপ্রকাশের তত্ত্বাবধানে ফাইন আর্ট ক্লাসের গুরুত্ব বাড়ল ক্রমে, ছাত্রদের মূল আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠল। তুলনায় ইন্‌ডিয়ান আর্ট ক্লাসটির গুরুত্ব কমতে থাকল। বিশেষ ছাত্র হত না এ ক্লাসে। ১৯২৭-এ অতুল বসু কিছুদিনের জন্য অধ্যাপক হয়ে এলেন। ১৯২৮-এ অধ্যক্ষ হয়ে এলেন মুকুল দে। এঁরা আধুনিকতর য়ুরোপীয় শিল্প আন্দোলনের খবর ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। এঁদের প্রভাবে আর্ট স্কুলের আবহাওয়ায় সমকালীন য়ুরোপীয় শিল্পের চর্চা এবং আঙ্গিকের অনুশীলন পাকাপোক্ত হল।

এই পরিবেশ থেকে নতুন প্রজন্মের এক তরুণ শিল্পীদল বেরোলেন। এঁদের নেতা ছিলেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁর আঁকা কয়েকটি সিনেমা পোস্টারে নতুন শৈলীর প্রয়োগ কলকাতার কলাসংস্কৃতি মহলে সাড়া জাগায়। ভোলা চ্যাটার্জির ছবি এবং ইলাস্‌ট্রেশানের কাজে য়ুরোপীয় আঙ্গিকের নিপুণ প্রয়োগ ছিল। ইনি বন্ধুদের নিয়ে ইয়ং আর্টিস্টস ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জয়ন্তী সমারোহে টাউন হলে তরুণ এই শিল্পী সংঘ নিজেদের ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন। নানান্ প্রবণতার শিল্পী এই সংঘে ছিলেন, তবে মূল ঝোঁক ছিল য়ুরোপীয় আধুনিকতার দিকে। এই সংঘটি কিছু পরে 'রিবেল আর্ট সেণ্টার' নামে পরিচয় দিয়ে ২০ এপ্রিল ১৯৩৩-এ একটি বড়ো প্রদর্শনী করেন। ছবির সংখ্যা ছিল ১৮১ খানা। গোবর্ধন আশ, অবনী সেন, কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার, সুরেন দে, সমর দে— এঁরা কিছুদিন সংগঠিতভাবে একটা আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্যোগটি টেকে নি। কিন্তু সেণ্টারের দুজন শিল্পী গোবর্ধন আশ এবং অবনী সেনের কাজে অতি বিশিষ্ট প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। এঁদের দুজনেরই হাত য়ুরোপীয় আঙ্গিকে দুরস্ত ছিল। ড্রয়িংয়ের বনেদ পাকা। জল রঙ এবং তেল রঙ ব্যবহারে বিদেশি ছবির নকলনবিশি করতেন না, প্রয়োগ ছিল সৃষ্টিময়। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে আঁকতেন দুজনই। গোবর্ধন আশের ছবির অবলম্বন গ্রামজীবন, সামাজিক বিষয়। কিন্তু বাংলা-ছবির আঙ্গিকে কখনও তিনি আকর্ষণ বোধ করেন নি.! এইখানে তিনি যামিনী রায় থেকে

আলাদা। ছবির মেজাজে আত্মস্থ মানুষ মনে হয় তাঁকে। ৮০ বছর পেরিয়ে এখনও আঁকেন। তাঁর অনুপূর্ব কাজের এক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হল। (অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, ১০-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮)। খুব হালের কিছু স্কেচ রেখেছিলেন। অশিথিল চৈতন্য এবং স্নায়ুর সৃষ্টি, অত্যন্ত জোরালো কাজ। সহায়-সমর্থন তেমন কিছুই পান নি, কিন্তু বিক্ষোভের ছায়া ছবিতে পড়ে নি। তুলনায় অবনী সেনের মেজাজ ছিল প্রকৃতই বিদ্রোহীর। বাস্তবের প্রক্ষেপ তাঁর হাতে তীব্রভাবে ফুটত। রঙ ব্যবহার করতেন বিস্ফোরণের তীব্রতায়। এঁরা অবনীন্দ্র-ধারার বাইরে থেকেছেন, আর্ট স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষায়ও নিজেদের শক্তি নিঃশেষ করেন নি। বরং সেই শিক্ষার উপরে নির্ভর করে সমকালীন য়ুরোপীয় শিল্পের ভাঙাগড়া সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন। অতুল বসু এঁদের মনের প্রসারে, নানান্ পরীক্ষায় প্রেরণা দিতেন।

স্মরণ করতে হয়, এই বাঁকেই এঁদের চেয়ে বয়সে বড়ো যামিনী রায় শিল্পী জীবনের নতুন পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৯-এর শেষদিকে আর্ট স্কুলে যামিনী রায়ের বাংলা-ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়। বিনত এই শক্তিধর শিল্পীর কাজে ভারতীয় আধুনিক শিল্পের এক তাৎপর্যময় দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। য়ুরোপীয় আঙ্গিকের পূর্ণজ্ঞান এবং অর্জিত নৈপুণ্য নিয়ে তিনি বাংলার আবহমান লৌকিক শিল্পের উৎসের সন্ধানে স্থিতপ্রজ্ঞ অভিযান চালিয়েছিলেন। পট-শিল্পের পুনরুজ্জীবন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর আধুনিক মননে সংহতিহীন স্বদেশের রুচিবিভ্রাট তীব্র সংকটবোধ জাগায়। সেই সংকটের আসানের জন্যই তিনি লোকশিল্পের সংহত জগৎটির স্মৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলাবার গরজ বোধ করেছিলেন। সংকটাপন্ন আধুনিক শিল্পী মন প্রত্নবিশ্বে যে ত্রাণের উপায় খুঁজে ফেরে তার অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়বে। যেমন, পিকাসো আফ্রিকার ভাস্কর্যে ইঙ্গিত খোঁজেন, যেমন য়ুরোপের এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পীরা আদিম মানুষের হাতের কাজে অভিব্যক্তির তীব্রভাষা খোঁজেন। যামিনী রায় য়ুরোপীয় রিয়লিজমকে চরম মানতে পারছিলেন না, প্রতিরূপ সৃষ্টিই শিল্পের শেষ কথা নয়। এই বোধ নিয়েই তিনি সাদৃশ্যের উপরতল ভেঙে শুদ্ধ রূপ আয়ত্তে আনার কলাবিধি লোকশিল্প থেকে উদ্ধার করে আনেন। প্রজ্ঞাশক্তির সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে সে কলাবিধি তিনি ব্যবহার করেছেন। এও এক ভাবে 'রিয়লিস্টিক'-এর স্তর ভেদ করে 'রিয়লিটি'তে পৌছানোর, বস্তুর শুদ্ধ রূপসত্তাকে ধরার সাধনা। এই ধারায় পরিণত কাজে যামিনী রায় সীমিত সংখ্যক রঙে এবং অভিব্যক্তিময় প্রবল রেখায় এবং সতর্কভাবে নির্বাচিত মোটিফ-এর ব্যবহারে এক তাৎপর্যঋদ্ধ রূপলোক সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বর্ণদ্যুতি, প্রতিটি রেখার গতি, প্রতিটি মোটিফের ব্যবহার মননিয়ন্ত্রিত। যামিনী রায়ের ছবিতে নজর পড়তেই সৌষ্ঠব মন টেনে নেয়। কিন্তু মুহূর্তেই সে সৌষ্ঠবের, দৃষ্টিগ্রাহ্য সরল বিন্যাসের ভেতরের সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান এবং হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হয়। দ্বিতীয়বার এবং বারংবার দেখায় স্বচ্ছ

হয়, যামিনী রায় আদৌ সাদামাটা পটুয়া নন। তাঁর তুলি আবেগের বশে চালে না। কবজির চালচলনের পেছনে সর্বদা সজাগ থাকে এক আধুনিকের মস্তিষ্ক। শিল্পের স্বদেশ তিনি চেনেন এবং চেনেন শিল্পের আধুনিক বিশ্ব।

বোম্বাই-মাদ্রাজ-লখনউতেও নানা আন্দোলন উঠছিল সে সময়ে। তবে তার ঢেউ তেমন আমাদের এখানে পৌঁছয় নি। এমন কী অমৃতা শের-গিলের পরিচয়ও বাংলায় সে সময়ে কেউ জানতেন এমন প্রমাণ নেই।

১৪

শিল্পী জীবনের সব পর্বে নন্দলাল একই সঙ্গে নানা ধরনের কাজ করেছেন। পেরিয়ে আসা পর্বের আঙ্গিকের, বিষয়ের জের পরেও চলেছে। এই কারণে তাঁর বিবর্তন -উত্তরণের ধাপগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করায় অসুবিধে আছে। ঝুঁকিও থেকে যায় খানিকটা। তবুও বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে বিশেষ একটা পর্বে ঝোঁকের মাত্রায়, সজ্ঞান -সচেতন পরীক্ষার নজিরে ধরা যায় সৃষ্টির উদ্দীপনা এবং অভিনিবেশ কোন্ মুখে তাঁকে টানছে। ১৯৩০ নাগাদ শিল্পমুক্তির নতুন যে ঢেউ জেগেছিল তার প্রভাব থেকে যদি নিজেকে গুটিয়ে নিতেন তবে বলতেই হত দেশের কলাসংস্কৃতি জগতে আর তিনি প্রাসঙ্গিক ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রসিদ্ধ কলাসমা-লোচকদের নীরব সিদ্ধান্তটি এই রকমই। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি ঢেউ-এর মাঝখানেই ছিলেন এবং সচেতনভাবে যে সেই নতুন শিল্পভাবনার সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন তাঁর এই সময়ের ছবির ধারায় এর উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে।

শিল্পের আসন পাতার জন্য বিশেষ কোনো বাছাই করা জায়গা কখনও থাকতে পারে না। কিন্তু বিশেষ যোগাযোগ এক-একটি ভৌগোলিক সংস্থানের বাতাবরণ বিশেষ ধরনের উদ্দীপন যে জোগায়— এমন অনেক সময়েই হয়েছে। মনে পড়বে, ফরাসি দেশে শিল্প মুক্তির এক বৈপ্লবিক অধ্যায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তামাম য়ুরোপের শিল্পের গতিমুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল যে ইম্‌প্রেশনিস্ট আন্দোলন— তার জন্ম ও পুষ্টি স্যেন্ নদীর শাখা -উপশাখার, মোহনার ধারের খোলা প্রকৃতিতে। ক্লোদ মোনে -কামী পিসারো -এত্তুয়ার মানে -পোল সেজান্ -পিয়ের ওগুস্ত রোনেয়ার -আল্‌ফ্রেদ সিস্‌লে— এঁরা নতুন সংবেদনের খোঁজে পারি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফন্‌তেন ব্ল্যো-র বনভূমি, আর্জন্তই, পন্তোয়াজ্, দেহাতি বুজিভাল্ আলোর মায়ায়, আলোর অশেষ প্রতিসরণে এঁদের চোখে নতুন রূপলোক উন্মোচিত করেছিল। সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া সংবেদনে এবং জাপানি ছাপা ছবির প্রভাবে ফরাসি দেশের নতুন প্রজন্মের এই শিল্পী-সংঘ অকাদেমিক রীতিনীতির পিছুটান ছিন্ন করেন। ছবির প্রতিষ্ঠিত ব্যাকরণ ভেঙে

যায়, শিল্পের নতুন ভাষা তৈরি হয় এঁদের হাতে।

১৯২০ -৩০ -৪০-এর শান্তিনিকেতনে এমনি এক নতুন দৃষ্টি খুলে দেওয়া বাতাবরণে শিল্পী নন্দলালের অভিষেক হয়েছিল। রুক্ষ মাটি, গাছ-গাছালির বিশেষ ছাঁদ, হা-হা করা দিগন্ত ছোঁয়া লাল জমির বিস্তার— যার উপরে বিশাল ঝকঝকে আকাশ, অমলিন মহাশূন্য। ঋতুগুলি এখানে অতি বিশিষ্ট চেহারায় যে হাজির হত— রবীন্দ্রনাথের পাঠকেরা, রবীন্দ্রনাথের গানের সমঝদারেরা তা মর্মের মধ্যে অনুভব করেন। এইখানে, এই তীব্র আলোয় প্রকৃতির বর্ণবিভা যেমন ইন্দ্রিয়কে আকুল করে তুলত— সে বস্তু বোধ হয় কলকাতায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্যই কলকাতায়ও প্রকৃতি ছিল এবং আছে। কিন্তু ভিন্ন তার চরিত্র। এই সংবেদনের অভিজ্ঞতায় নন্দলাল বস্তুবিশ্বকে নতুন করে পেলেন। এবং সে পাওয়ার উদ্দীপনা কখনও সাদাকালোর তীব্রতায়, কখনও সম্পূর্ণ ই নতুন ধরনের রঙ প্রয়োগের পদ্ধতিতে তাঁর এই পর্বের কাজে রূপ পেয়েছে।

আলোর অভিঘাত প্রকৃতিকে ভাঙে-গড়ে নিত্য দেখেছেন। কোনো রূপ স্থির নয়। একই বস্তুরও রূপ মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায় আলোর মায়ায়। কোনো ধরাবাঁধা রীতিতে কি এ অভিজ্ঞতা ধরা যায়! রূপের এই সংবেদন ধরার তাড়না শিল্পীদের পদে পদে প্রতিষ্ঠিত, অভ্যস্ত শিল্পনীতি ভাঙতে বাধ্য করে। তুলির মুখে নতুন ভাষা জাগাতে হয়। ঝাঁপিয়ে পড়া আলোয় বস্তুর রূপসত্তা তীব্রভাবে দৃষ্টির উপরে আছড়ে পড়ছে। কী করে এ সংবেদন যথাযথ ধরা যাবে, এই তাড়নাই নন্দলালকেও নতুন শৈলীর দিকে চালিয়ে নেয়। বস্তুরূপ ধরে ধরে আঁকার শিক্ষায় নিপুণ হয়েছিলেন। এই প্রকৃতির মধ্যে বসবাসে যেন সে শিক্ষা আঁকড়ে থাকা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, একটি গাছকে গাছ হিশাবে দাঁড় করাতে প্রতিটি পাতা, শাখা-প্রশাখা বা কাণ্ডের নিখুঁত প্রতিরূপ তৈরি কেন করতে হবে। ঢালাও রোদের মধ্যে গাছটি তো বাস্তবে রঙের কতগুলি স্তর মাত্র। কখনও বা পর্দায় পর্দায় ভাঙা একই রঙের বিন্যাস মাত্র। সেই হল তার বাস্তব সত্তার চাক্ষুষ পরিচয়। শুদ্ধতর পরিচয়। চোখে পড়ছে চাপবাঁধা রঙ, রঙের ছোটো বড়ো পটি, রঙের বিন্দু-বিন্দু বিন্যাস। এই রূপসত্তা তো আলংকারিক রেখায় অনুপুঙ্খে ধরাও সম্ভব নয়। রঙই এখানে অনন্য সহায় হয়ে ওঠে। শিল্পীর প্যালেটের রঙ আলোর প্রতিনিধি। আলো প্রকৃতিতে রঙের যে বিন্যাস দীপ্যমান করে রেখেছে তেমনিভাবে পটে যদি রঙের অভিক্ষেপ ঘটানো যায় তো আলোর মহিমাটা ঠিক ঠিক ধরা সম্ভব। ১৯২৭ -৩০-এর সময় থেকে একের পর এক কাজে নন্দলালের এই নতুন রীতির পরীক্ষা দেখা যাবে। ১৯৩১-এ এক ঝাঁক ছবি পাই, 'সন্ধ্যাপ্রদীপ', 'মধ্যাহ্নস্বপ্ন' ('গ্রীষ্ম'), 'বসন্ত' ('কৃষ্ণচূড়া'), 'রাত্রি' ('শীত')। ১৯৩৪-এর 'বোলপুরের পথে'। এমনি আরও অনেক কাজ আছে। কী ঘটছে



বসন্ত ১৯৩১ ছোপের কাজ

এখানে ? মসৃণ নয়, পেলব নয় : হয় তো চাপবাঁধা রঙে, হয় তো এবড়ো-খেবড়ো মোটা রঙের ছোপে রূপটি ধরে দিচ্ছেন। পটের আচোট জমিতে তুলির চোট পড়েছে যেন ঝাঁপিয়ে পড়া আলোর তেজে। প্রখর সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণে, শক্ত কব্জিতে তুলি চালিয়েছেন। ছবিতে বস্তুর আদল ঠিক আছে, কিন্তু অনুপুঙ্খ নেই। আছে বস্তুর বর্ণগত বিশিষ্ট চরিত্র। রঙের পর্দাগুলি আলাদা থেকে যাচ্ছে। রঙে রঙে মিলিয়ে নেবার গরজ নেই। বাহারি কাজের দায় একেবারেই মানা হয় নি। ভাবাবেগে নয়, দর্শকের চৈতন্যে টান লাগে এ ছবির সামনে দাঁড়ালে। উপভোগের জন্য সজাগ বুদ্ধির সাহায্য দরকার হয়। সব আধুনিক শিল্পকাজেই সৃষ্টি এবং উপভোগ দুদিকে সজাগ বুদ্ধির উপরে নির্ভরতা ক্রমে বেড়েছে।

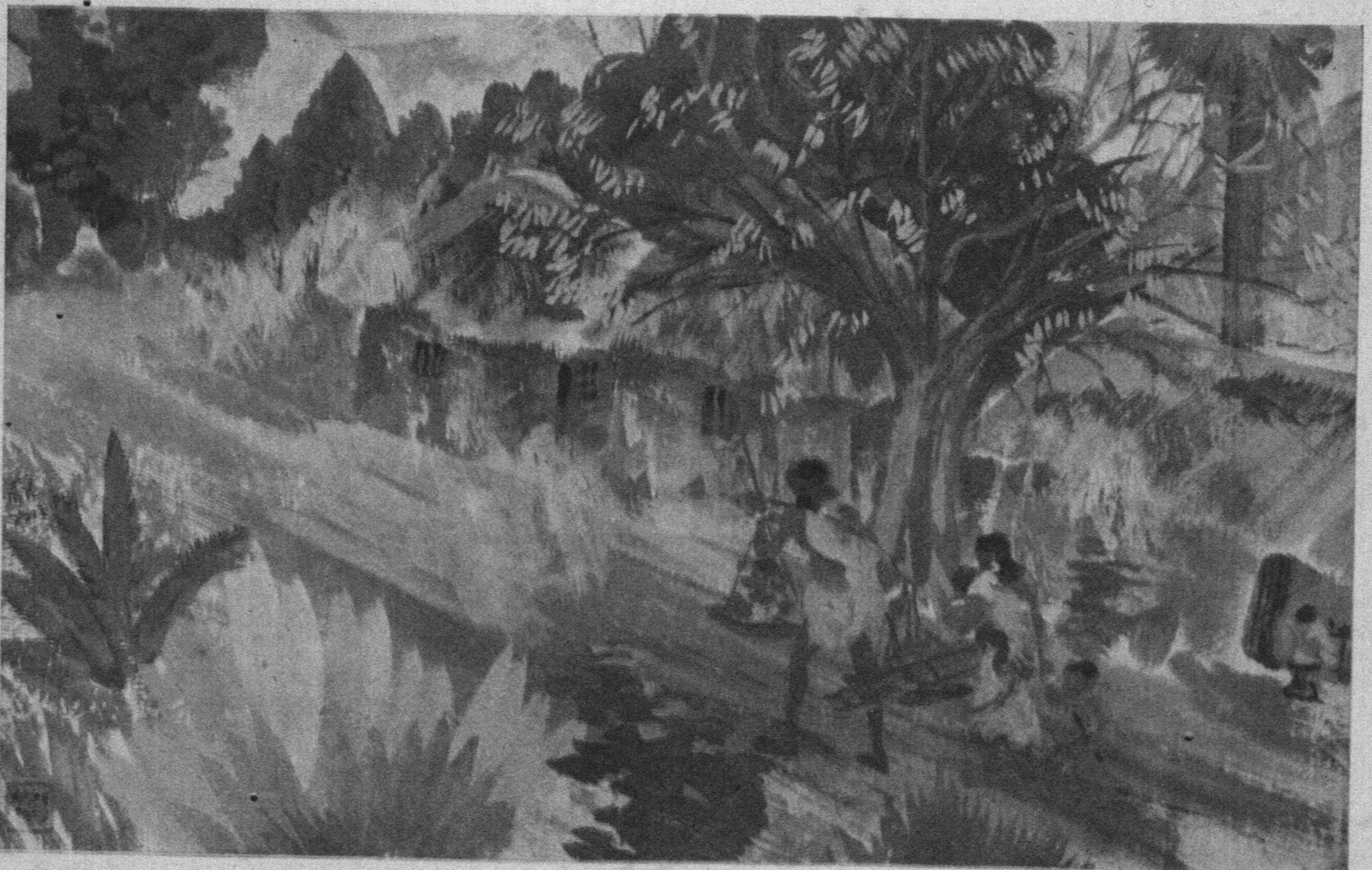
ধরা যাক 'বসন্ত' ('কৃষ্ণচূড়া') নামের ছবিটি। খাড়াইয়ে দু-ভাগ করে হিশেব করে ছবির উপরের অংশে তুলির মোটা ছোপে কৃষ্ণচূড়ার লাল দীপ্তি ধরেছেন। পাতার আভাসও মেলে একই শৈলীর তুলির টান। নিচে আছে চিঠি পড়ায় নিবিষ্ট একটি মেয়ে— যাকে রাখা হয়েছে ঘরের ফ্রেমের মধ্যে। ধরে ধরে অনুপুঙ্খ কাজ

করার মেজাজে এ ছবি হয় নি। এমন সামান্য রঙের স্পর্শে আঁকা চরিত্ররূপও নন্দলালের দীর্ঘ অতীতের কোনো কাজে মিলবে না। এই রীতির আর একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত 'মধ্যাহ্নস্বপ্ন' ('গ্রীষ্ম' নামেও ছবিটি ছাপা হয়)। ড্রইংয়ে বিষয় ছকে না নিয়ে সরাসরি তুলি টেনে করা কাজ। ছবির বাঁধুনি নিয়ে মাথা ঘামানো যেন ছেড়েই দিয়েছেন। বোধ ফোটানোরও দায় মানছেন না। সামনের গাছের রূপ যেমন টানা তুলিতে করেছেন তেমনি পেছনের ঘরের ভিত এবং খুঁটি এবং বাখারির জাফরি দ্রুত চালে শেষ হয়েছে। ঘরের নিচতলা এবং উপর তলার দেওয়ালে হলুদ আর লাল রঙের পোঁচ লক্ষ করলে তুলির চাল ধরা সহজ হবে। একাগ্র উদ্দীপনা এবং দ্বিধাশূন্য হাত থেকেই এমন কাজ সম্ভব। একে হঠাৎ আসা কোনো ঝোঁক বলাও যায় না। কারণ, পরে দীর্ঘ সময় অন্য ধরনের ছবির পাশে এই শৈলীর পরীক্ষা এগিয়ে নিচ্ছেন দেখা যায়। ১৯৩৪-এর 'বোলপুরের পথে' এই ধারার আর -একটি বিশিষ্ট কাজ। এ দৃশ্যে আলোর গতি এবং আলোর প্রতিসরণের বৈচিত্র্য ধরাই শিল্পীর লক্ষ্য। গাছপালা বা ঘরের সারি বা চলমান মানুষের গতিভঙ্গি কিছু আলাদা মনোযোগের বিষয়ই নয়। আলোর হেরফেরই লাল ধুলো ওড়া পরিবেশে আবছা আকারগুলি যেন বেরিয়ে এসেছে। দেখাচ্ছে রঙের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মতো। বড়ো গাছটির পাতায় ছড়ানো আলোর টুকরো য়ুরোপীয় ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কোনো কোনো বিখ্যাত কাজের স্মৃতি ঝল্‌কে তুলবে।

এই শৈলীকে নন্দলাল বলতেন ছোপের কাজ, টাচের ছবি। বলতেন, একাজে দরকার রূপকল্পনার সংহতি, সম্পূর্ণতা, তড়িৎগতি। তুলি ছোঁয়ানোমাত্র পটে বস্তুর "ভার-স্পর্শ (টেক্‌সচার) -ভাব" সাক্ষাৎ হয়ে উঠবে।

> ছোপের কাজ হওয়া চাই নিঃশঙ্ক, অব্যর্থ, দ্বিধাহীন ও অভিজাত। (পাদটিকা : আভিজাত্যপূর্ণ, অর্থাৎ, যাতে হঠকারিতা নেই, দোষ ঢাকবার চেষ্টা নেই, দক্ষতার ভান নেই, দর্শকের মন ভোলাবার প্রয়াস নেই, ঐশ্বর্যের পূর্ণতা -হেতু যা সহজ ও সরল)। শত্রুকে এ যেন অসিহস্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। মরণ -বাঁচন খেলা। বীরের সাধনা। ছেলেখেলা বা অলস খেয়াল নয়।
>
> …ছোপের ছবি হবে যেন প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের ইশারা ; বেশি বলার সময় নেই, প্রবৃত্তি নেই।—(দৃ-স্ব, পৃ. ২০৫)।

ছবির শৈলী ধরে নন্দলালের কাজে তালিকা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, টাচের ছবি শুরু হয়েছে ১৯২৭ থেকে। অন্য নানা শৈলীর কাজের সঙ্গে এই শৈলীর কাজ চলেছে ১৯৫৮ অবধি। অশেষ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি রীতির আশ্চর্য বিকাশ। কখনও কালিতুলিতে, কখনও রঙে। এই পদ্ধতিতে জাপানি আঙ্গিকের প্রভাব আছে। কিন্তু যত রকমের কাজ এই ধারায় পাই, জাপানি প্রভাবের মার্কা দিয়ে তার ব্যাখ্যা হয়



বোলপুরের পথে ১৯৩৪ ছোপের কাজ

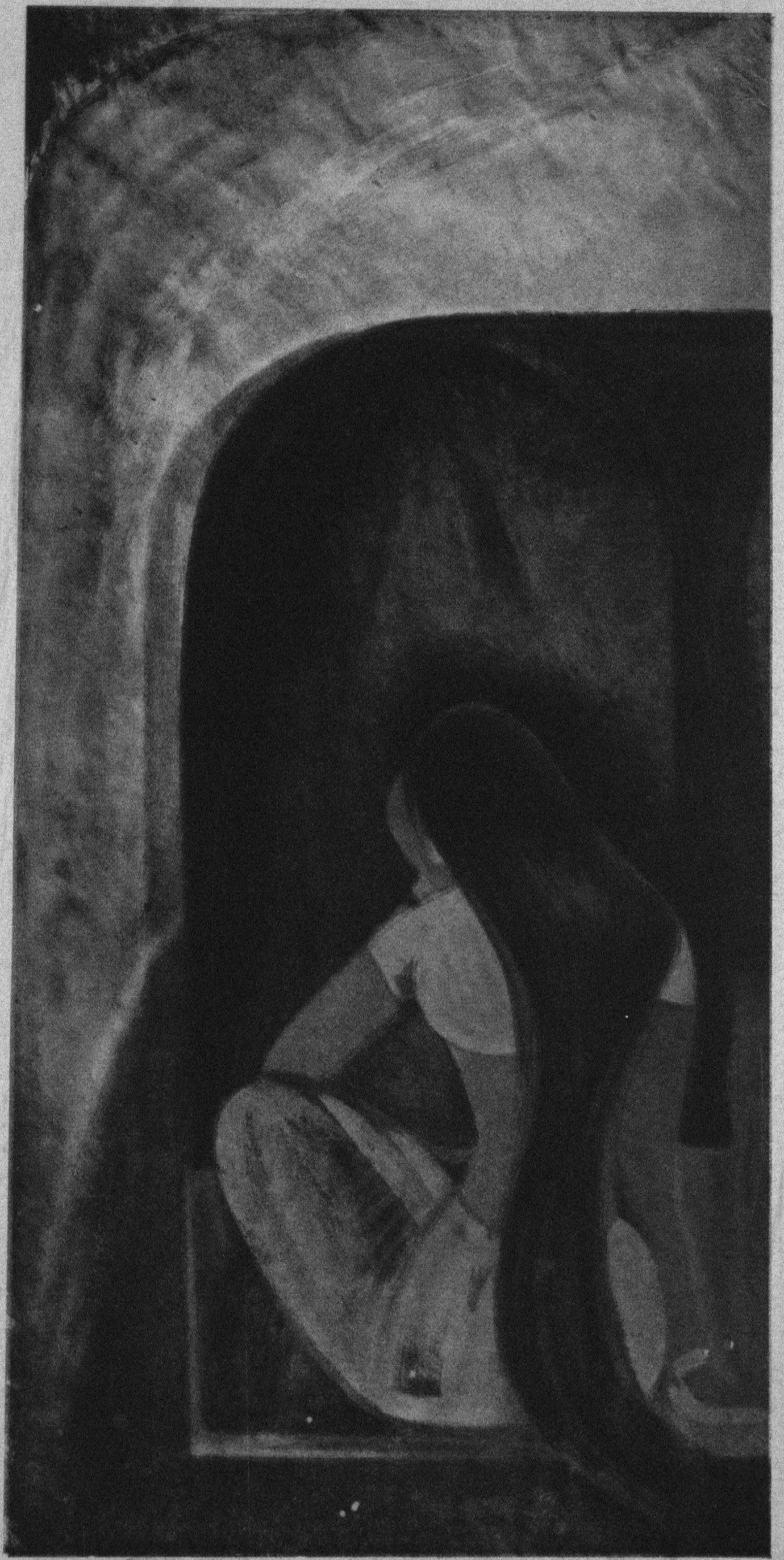
না। মনে রাখতে হয়, জাপানি তুলির অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর ছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে স্টেল্লা ক্রামরিশকে দিয়ে য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পের ইতিহাস চর্চার যে আয়োজন হয়েছিল নন্দলাল সেই চর্চার বাইরে থাকেন নি। ইম্‌প্রেশনিস্ট আন্দোলনের শিল্পীদের নবীন দৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর ৭০/৮০ দশকে শিল্পভাষার ব্যাকরণ পাল্টে দিয়েছিল। য়ুরোপ জুড়ে দীর্ঘ দিন তার জের চলেছে। আলোর প্রতিফলন, রঙের বিভঙ্গ এবং আলোর প্রভাবে বস্তুরূপের বৈচিত্র্য ধরার পরীক্ষা থেকে পাশ্চাত্য আধুনিকেরা ক্রমে বস্তুর শুদ্ধ জ্যামিতিক বাস্তবতা আয়ত্তে আনার পরীক্ষায় এগিয়েছেন। সাদৃশ্যের নীতি ভেঙে রূপের ধারণাকে নিয়ে গেছেন চরম অবচ্ছিন্নতায়, অ্যাবস্ট্রাক্‌শনে। কিউবিজম, এক্‌স্‌প্রেশনিজম বা অ্যাবস্ট্রাক্‌ট আর্টের পরীক্ষায় যাবেন, নন্দলালের কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু ইম্‌প্রেশনিস্ট-পোস্টইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের চোখে নিয়ত বদলে যাওয়া আলোর প্রভাবে একই দৃশ্য-বস্তুর নিরন্তর রূপান্তর যে উদ্দীপনা জাগালো, বস্তুর নির্দিষ্ট আকার এবং ওজন যেমন ভাবে তাঁরা রঙের গুণে ধরালেন, প্রকৃতি অবলোকনের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় নন্দলাল যেন সেই উদ্দীপনার একই স্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবিশ্ব আধুনিকতার মর্ম তিনি নিজের স্বভাবে মিলিয়ে নিয়েছেন।

নন্দলাল ভালোই জানতেন য়ুরোপীয় শিল্পে নববিধানের মূলে কাজ করেছে প্রাচ্যের প্রভাব। এডুয়ার মানে ১৮৬৭-৬৮ সালে এমিল জোলার প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। সে ছবির মধ্যে দেওয়ালে একদিকে রয়েছে জাপানি কাজ করা রেশমি পর্দা, অন্য দিকে বিখ্যাত জাপানি শিল্পী উতামারোর একটি ছাপাই ছবি। তার পাশেই এঁকে দিয়েছেন মানের নিজেরই ক্রান্তিকারী সৃষ্টি 'ওলিম্পিয়া'র (১৮৬৩) প্রতিচ্ছবি। খোলা মনে ঋণ স্বীকারের চমৎকার নজির। আর, এমিল জোলাই ইম্‌প্রেশনিজমের প্রতিষ্ঠাতা এডুয়ার মানে-র ছবিতে জাপানি প্রভাবের কথা প্রথম বলেন। জাপানি ছাপা ছবির জন্য ফারসি দেশের শিল্পীদের আকুলতা ১৮৬০ থেকে প্রবল হতে থাকে। মঁসিয় দ্য সোয়া-র জাপোনেস্‌রী নামে দোকানে এঁরা নিয়ত জাপানি শিল্পবস্তুর খোঁজে হাজির হতেন। একই বিষয়, একই দৃশ্য কত ভাবে, কত রকম আলোয় দেখা যায় সে শিক্ষা ইম্‌প্রেশনিস্টরা জাপানি ছবি থেকে পেয়েছিলেন। এই আধুনিকতায় দৃষ্টিকোণের এবং কলাবিধির দিক থেকে যে পুব-পশ্চিম একটা জায়গায় মিলে আছে এ আমরা সচরাচর মনে রাখি না। এও মনে রাখি না যে ফিরে-ফিরতি য়ুরোপীয় শিল্পীদের পরীক্ষায় অর্জিত কলাবিধি আবার জাপানকেও প্রভাবিত করে। চীনে যায়। প্রাচ্য দেশে দেশে শিল্পীদের চেতনায় আলোড়ন তোলে। বোঝাপড়ার এক ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি হয় বিশ্বময় আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে। সে বোঝাপড়া আজও যে শেষ হয় নি, ফেস্‌টিভাল অব দি ইউ-এস-এস-আর ইন্‌ডিয়া ১৯৮৭-৮৮

উপলক্ষ "আর্ট বর্ন অব দি অক্টোবর রেভলিউশন" প্রদর্শনীতে (বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড কালচার, ৩-২৯ জানুয়ারি ১৯৮৮) রাখা সোভিয়েত দেশের শিল্পী-দের বেশ কিছু সাম্প্রতিক কাজে তার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখার সুযোগ হল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত শিল্পনীতি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, সোসালিস্ট রিয়লিজমের আওতায় চোখে-মনে ধরবার মতো কাজ কতটা হয়েছে এ সংশয় অমূলক নয়। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল ৭০/৮০-র দশকের শিল্পীরা— বি. আই. শামানোভ, বি. এফ. দোমাস্‌নিকভ, য়ে. য়ে. মোইসেইয়েনকো, ভি. য়ে. প্যোপকভ, এস. এস. মুরাদীয়ান্‌— নিজেদের সমকালীন বাস্তবতার শিল্পভাষা গড়ায় রেনোয়ার-মাতিস-সেজ়ান-ভান গখ্‌-এর কাছে খোলা মনে পাঠ নিয়েছেন। বিজ্ঞানের মৌলিক আবি-ষ্কারের মতোই শিল্পভাষার মৌলিক উদ্ভাবন কোনো দেশ-বিশেষের বা গোষ্ঠী-বিশেষের একান্ত সম্পত্তি নয়। পরের পরের যুগ ধরে আবিশ্ব তার ব্যবহার চলে, প্রয়োগ চলে।

অবশ্যই স্থূল প্রভাবের কথা উঠছে না। অবশ্যই নন্দলাল নিজস্ব অভিজ্ঞতায় ইম্‌প্রেশনিস্টদের আবিষ্কারগুলি যাচাই করেছেন। এবং এও ঠিক যে তাঁর তুলির চাল য়ুরোপীয় ধাঁচা ধরে না। বরং তাঁর অভ্যাসে আসে জাপানি ধাঁচা। কিন্তু নিজের ধর্মে অবিচল থেকেও যে তাঁকে একই ভাবে আলোর এবং রঙের সম্পর্ক নিয়ে আধুনিকের শিল্পভাষা গড়ে নিতে হয়েছিল তাতে সংশয় নেই। রঙে আলোর প্রতিসরণ ঠিক ঠিক ধরার পক্ষে ক্যানভাসে তেল রঙেই সুবিধে। তেল রঙের বাড়তি উজ্জ্বলতা এবং চেকনাই আলোর খেলা জমাতে অনেকখানি সাহায্য করে। কিন্তু নন্দলালের পক্ষে তেলরঙ চালু করায় বাস্তব অসুবিধে ছিল। কাজ তো তাঁর একার নয়। গোটা কলাভবনের পরিবেশেই তখন নতুন পরীক্ষার উত্তেজনা। মাস্টারমশায় নিজে ক্যান্‌-ভাসে-তেলরঙে কাজ করবেন, ছাত্ররা সে সুযোগ পাবে না— এমন ব্যবস্থা তাঁর পক্ষে অভাবনীয় ছিল। সকলের হাতে যে উপকরণ দিতে পারবেন না তা নিজে ব্যবহার করতেন না। তখনকার কলাভবনের দীনতার পরিবেশে তাই ঢালাও বিদেশি উপকরণ চালু করার কথা ভাবা যায় নি। কেউ কেউ তেলরঙে এঁকেছেন। সে একান্তই ব্যক্তিগত চেষ্টায় সংগ্রহ করা উপকরণের ব্যবহার। যেমন রামকিংকর করতেন। কলাভবনে তেলরঙ ব্যবহার করতে দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে অদ্ভুত সব জল্পনা চালু আছে। এইসব জল্পনায় তখনকার আর্থিক কঠিন অবস্থার কথা মনে রাখা হয় না। তেলরঙে রামকিংকর যে-সব আশ্চর্য কাজ করেছেন তার তুল্য কাজ পাশাপাশি বিনোদবিহারী করেছেন টেম্পেরায়। নন্দলাল তো করেইছেন।

মাধ্যম যাই হোক, যে উপকরণই ব্যবহার করুন, ছবির বিষয়ে এবং আঁকার পদ্ধতিতে অতি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল এটাই শিল্পীর বিকাশ-উত্তরণের দিক থেকে গুরুত্ব পাবার মতো কথা। বস্তুসত্তার শুদ্ধ-রূপ কত সাক্ষাৎ করে তোলা যায়—



রাত্রি ১৯৩১ ছোপের কাজ

এই অভিনিবেশ ক্রমে প্রবল হয়েছে। ছবিতে আর গল্প বলতে চান না। যদি-বা কোনো চরিত্ররূপ আসে— তাকে ঘিরে কোনো আখ্যান দাঁড় করান না। ছবির মধ্যে যা আছে নিজের রূপসত্তার দাবিতেই আছে। এ আধুনিকতার মর্ম : সংহত প্রকাশরূপ অব্যর্থ করে তোলা। আকারণ বিস্তারে না যাওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, অবান্তর বর্জনেই আর্টের পরিত্রাণ। ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫)। এই গরজে আধুনিক কবিতায় আসে চিত্রকল্পের, প্রতীকের সংহতি। আধুনিক ফিল্মে আসে মন্তাজের দ্যোতনাময় প্রয়োগ। অবান্তর বর্জন এবং প্রকাশরূপের স্বাশ্রয়ীমূল্য অব্যর্থ করে তোলার পরীক্ষায় দেশে দেশে আধুনিক চিত্রকরদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন কলাবিধি। প্রাচ্য মেজাজ নিয়েই নন্দলাল এই আধুনিকতার সঙ্গে একভাবে বোঝাপড়ায় এসেছিলেন।

আরও একটি বিষয় তাঁর ছবির নিবিষ্ট দর্শকের চোখে ধরা দেবে। এই পর্যায়ের ছবিতে তিনি জমির দুই মাত্রাকে চরম মেনে কাজ করেছেন। কাগজ বা কাপড় বা ক্যান্‌ভাস কিংবা দেওয়াল, যার উপরেই আঁকি— পটভূমিটি অবশ্যই দ্বিমাত্রিক এবং সমতল থেকে যায়। বাস্তবিকতার মায়া রচনার জন্য পরিপ্রেক্ষিতের দূরাভাস বা ছায়াতপের খেলা কিংবা মডেলিংয়ের নীতি কেন মানতেই হবে, দ্বিমাত্রিক পটের বাস্তবতাকে আবৃত করার দায় কেন নিতেই হবে— আধুনিক চিত্রকলায় এই প্রশ্ন সর্বত্র এসেছে। পটের সমতল -ধর্মটি চূড়ান্ত মেনে কাজ করায় সত্য মানার সাহস দরকার। মায়াসৃজনের কৌশল বর্জনের সাহস। পটে বস্তুবিন্যাসের নানান্ পরীক্ষায় আধুনিক ছবিতে এই সাহসের জোর অতি বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কালের হাওয়ায় এই নতুন কলাবিধির আবির্ভাবকে নন্দলাল অভ্যর্থনাই জানিয়েছেন। তাঁর প্রচুর এবং ধারাবাহিক টাচের কাজে দ্বিমাত্রিক কলাবিধির স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ রয়েছে। পটের দ্বিমাত্রিক মৌল বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ণ না করেও আঁকার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ধারণা য়ুরোপে ছড়ায় জাপানি ছবির দৃষ্টান্তে। জাপানি ছবি সম্পর্কে নন্দলালের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত। তিনি একদা বলতেন এবং মানতেন, ভারতীয় চিত্রকলা ভাস্কর্য প্রভাবিত। এই পর্বের কাজের নজিরে মনে হয় তাঁর শিল্প ভাবনায় গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

"আধুনিকতার আওতায় তাঁকে কখনো অবসাদগ্রস্ত হতে দেখি নি।" (দেশ, ১৪ মে ১৯৬৬, পৃ. ২৫৮)। মন্তব্যটি রামকিংকরের। আমাদের ছবির পরম্পরা অভিজ্ঞতায় আছে এবং ওদেশের পরম্পরার খবর রাখেন এমন দর্শক এ পর্যায়ের ছবির সামনে দাঁড়ালে রামকিংকরের মন্তব্যে নিজেরই নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পাবেন। নতুন কলারীতির একটি ভালো দৃষ্টান্ত 'রাত্রি' ছবিটি (অন্য নাম 'শীত', ১৯৩১)। কোথায় গেছে নয়ন ভোলানো আলংকারিক বাহার! ছবির মধ্যে বস্তু বিন্যাসের সূক্ষ্ম



স্বর্ণকুম্ভ ১৯৩৬ টেম্পেরা

হিশাব নিয়ে মাথা ঘামান নি। স্তব্ধ নারীচরিত্রটির অবয়ব ঘিরে একটি নিথর পরিবেশ রচনা করেছেন। রঙের গুণের উপরেই ছবিখানি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু রঙ নিয়ে সূক্ষ্ম খেলার মেজাজ নেই। ঘষামাজা মনোহারিতায় নয়, অ-চারু প্রবলতার জন্যই এসব ছবি আমাদের টানে।

শুধু ছোপের কাজে নয়, এই সময়ের অন্য কাজেও নন্দলালের সাহস এবং আত্ম-বিশ্বাসে বিস্মিত হতে হয়। রঙের গুণ ও উদ্দীপনা ব্যবহারের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান একটি ছবি 'স্বর্ণকুম্ভ' (১৯৩৬)। সুরুলের পথে 'আমার কুঠি' সংলগ্ন একটি পুকুরের পাড় থেকে নন্দলাল কিছু নুড়ি পাথর কলাভবনে নিয়ে আসেন। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে শিলে নুড়িগুলো ঘষিয়ে যে রঙিন ক্বাথ পেলেন তাতে একটু সাদা মেশাতে গাঢ় লালচে বেগনি একটা রঙ দাঁড়াল। রঙের এই বিশিষ্টতাই তাঁকে ছবিটির পরিকল্পনায় উদ্দীপ্ত করে। এই রঙে ভরাট করে দেওয়া পটে একটা গভীর পরিপ্রেক্ষিত এসে গেছে। স্পেস-এর অনেকটা ফাঁকা ছেড়ে দিয়ে বাঁদিকে রেখেছেন ঝারি হাতে চলমান মেয়ে চরিত্ররূপ— যার গড়নে মাছের আকৃতির আভাস আসে। কম্পোজিশন একান্ত অ-স্বাভাবিক। পটের ডান দিক এতটা ফাঁকা হওয়ায় দর্শকের দেখার অভ্যাস ধাক্কা খায়। চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগে। ক্রমে চেতনায় ছবিটির ভারসাম্য স্পষ্ট হয়। ধরা যায় পরিপ্রেক্ষিতের অবকাশ অত গভীর বেগুনি বলেই, রঙে রঙে একটা গূঢ় ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। চরিত্ররূপটির অবস্থানে আর একটি অস্বাভাবিকতা আছে। বাঁ পা চলে এসেছে ছবির মূল সীমানার বাইরে। যেন গভীর অন্তঃস্তর ছেড়ে হালকা চলনে বেরিয়ে আসছে, এমন একটি মুহূর্তে ধরা হয়েছে মেয়েটিকে। গোটা অবয়বটির গড়নে, সাজসজ্জায়, সোনা ধরানোতে সূক্ষ্ম কাজের নিবিষ্ট যত্নও পরম উপভোগ্য। স্পেস-রঙের সম্পর্ক নিয়ে খেলাটা নজরে না আসা পর্যন্ত দর্শক খুব অস্বস্তি বোধ করবেন। রঙের ব্যবহার এবং অলংকরণে শিল্পীর স্থির প্রজ্ঞার নিয়ন্ত্রণ কীভাবে কাজ করছে ধরতে পারলে নান্দনিক তৃপ্তিতে ভরপুর করে দেয় এই ছবি। শ্রেষ্ঠ কোনো শিল্পের কাছে যা পরম প্রত্যাশার বস্তু।

ঠিক এমনি শিল্পপ্রজ্ঞার পরিচয় আছে 'রাধাবিরহ' (১৯৩৬) নামের টেম্পেরায় করা কাজটিতে। অজন্তায়, বাঘ গুহায় (১৯২১-এ) ছবি নকলের কাজ করতে গিয়ে নন্দলাল ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে চিত্রকলার ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করেছিলেন— সে কথা বারবার বলেছেন। ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যে ভিন্ন রীতির অস্তিত্ব বিশেষ উল্লেখ না করলেও তাঁর অজানা ছিল না। মুঘল শৈলী তাঁকে আকর্ষণ করে নি, কিন্তু রাজপুত শৈলীর ছবির বৈচিত্র্য এবং রাজপুত শৈলীতে দ্বিমাত্রিক পটের সমতল জমির ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের প্রচুর প্রমাণ আছে। নিজের বহু ছবিতে তিনি রাজপুত শৈলী সচেতন ভাবে অনুসরণ করেছেন। এই ধারায় তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ



রাধাবিরহ ১৯৩৬ টেম্পেরা

কাজ 'রাধাবিরহ'। শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য নয় যে তিনি রাজপুত শৈলীর কোনো একটি ধারার হুবহু, অতিদক্ষ অনুসরণ করেছেন। বরং এই ছবির সঙ্গে মিল খুঁজতে গেলে রাজস্থানি রাগমালা চিত্রে, পাহাড়ি বাশোলি -কাংড়া— এমন নানান্ ধারায় তল্লাশি চালিয়ে হয়রান হতে হবে। শ্রেষ্ঠতার কারণ সেইসব রীতির উপাদান প্রয়োগের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পারিকল্পনা। ছবিটি দেখার কোনো একটি স্থির দৃষ্টি -বিন্দু পাবেন না দর্শক। নানা দৃষ্টি -বিন্দু থেকে দেখতে আমাদের বাধ্য করেন শিল্পী। দেওয়ালে টাঙানো হলেও আমরা যেন উপর থেকে দৃশ্যটা দেখি। গাছে ঘেরা একটি চাতালের উপরে পালঙ্কে শোয়া বিরহাতুর রাধার পরিচর্যা করছে দুই সখী। মেঝে এবং পালঙ্ক এবং চরিত্ররূপগুলির বিন্যাসে একটা সতর্ক জ্যামিতিক হিশাব আছে। তার ইঙ্গিত আছে সুস্পষ্ট রেখার ছকে। অথচ সব হিশাব ছাপিয়ে সুতনুকা রাধা, হয়তো কাংড়া শৈলী থেকে নেওয়া, তাকে ঘিরে নরম সবুজ -লাল -হলুদ রঙের বিন্যাস এক সকাতর স্নিগ্ধতার আবেদনে অবিষ্ট করে রাখে। একেও বলতে হবে সচেতন আধুনিক মনেরই সৃষ্টি। কারণ রাশি রাশি কাংড়া কলমের কাজে বা রাজস্থানি অন্য কোনো ছবিতে আর সবই পাওয়া যাবে। শুধু পাওয়া যাবে না এই ছবির প্রয়োগকলার বুদ্ধির দীপ্ত আধুনিক মনের আভাটুকু।

১৯২০ -র ৩০ -এর দশকে ভারতীয় আধুনিকতায় নতুন ঢেউ যখন প্রবল হয়ে উঠছিল, সেই দ্বিতীয় জাগরণের দিনে শিল্প মুক্তির "মরণ-বাঁচন খেলা" যে এড়িয়ে যান নি, নন্দলালের শিল্পভাবনার এবং শিল্পকাজের এ উত্তর পর্বটি তার প্রমাণ। এবং এইখানে, গুরুত্বপূর্ণ এ ক্রান্তি কালের একজন প্রধান শিল্পীর মাননা তাঁর প্রাপ্য।

১৫

১৯৩০-এর পর থেকে দেশ বড়ো অশান্ত সময়ের ভেতর দিয়ে গেছে। গোটা দুনিয়ায়-ই নেমেছে অসময়। ৪০-এ পৌঁছনোর মুখে ঘনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ৪৩ বাংলাকে নিয়ে যায় দুর্গতির চরমে। ভয়াবহ মন্বন্তরে। প্রতারিত ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছে ৩০ থেকে। লবণ-আইন ভাঙবার জন্য ১২ মার্চ গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযান শুরু করেন। ক্ষুভিত ভারতীয় বিবেক দেশের প্রান্তে প্রান্তে বিস্ফোরিত হয়। আন্দোলনে হিংসা-অহিংসা সীমা মানা হয় নি সর্বদা। সরকারি সন্ত্রাসও ছিল নির্বিচার। সত্যাগ্রহী আর বিপ্লবী— সকলে সমান নির্যাতন ভোগ করেছে। প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব দুর্যোগে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে আসা। মানুষের বেলায় এই প্রতিরোধের আয়োজন বহুস্তর। তার মনের সৃষ্টির যে ভুবন— ছবির-গানের-সাহিত্যের-নাট্যের— সে ভুবনেও প্রতিরোধের প্রখর ভাষা জন্ম

নেয়। জীবনের দায়, আত্মমর্যাদার দায়, শিল্পের দায় একাকার হয়ে যায়। সংকল্পের, প্রতিবাদের প্রতীক সৃষ্টি হয়ে ওঠে শিল্পে-সাহিত্যে।

এম্‌নি একটি প্রতীক নন্দলাল দেশকে সেদিন দিয়েছিলেন গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের ছবিটিতে। লিনোকাট ছাপায় এই ছবি হাজার হাজার দেশের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বই আমাদের সেদিনের বাস্তবতায় মূল দ্বন্দ্ব ছিল। নিজের অবস্থান ঠিক করে বুঝে নিতে নন্দলালের ভুল হবার কথা নয়। হয়ও নি। তাঁর তখনকার ভূমিকা সম্পর্কে অনেকটা তথ্য দিয়েছেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। (দে-বি, পৃ. ৩৪-৪৭)। লুপ্ত হয়ে গেছে, এমন কিছু রাজনৈতিক পোস্টারের খবর তিনি দিয়েছেন। মোটা তুলিতে আঁকা 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' ছবিটির লিনোকাট মুদ্রণ সে সময়ে রাজদ্রোহ প্রচারের হাতিয়ার হয়েছিল। নরমুণ্ডের তিনধাপ সিঁড়ির উপরে বেদি, বেদির উপরে শিশু ও নারী-পুরুষের হাতে ধরা চরকা আঁকা জাতীয় পতাকা। প্রভাতমোহনের বিবরণে ছবিটির সরল অথচ তীব্র অভিব্যক্তিময় আঙ্গিকের আভাস পাওয়া যায়। তিনি আর একটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গচিত্রেরও উল্লেখ করেছেন, যার বিষয়বস্তু ছিল চাবুক-হাতে সার্কাসের রিঙ মাস্টার জন বুলের তাড়নায় জেগে-ওঠা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। নাম 'হাড় খাব মাংস খাব চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব'। গান্ধীজীর 'ডাণ্ডি অভিযান' (১৯৩০) ছবির সঙ্গে এইসব কাজ মিলিয়ে ভাবলে নন্দলালের স্বদেশ জিজ্ঞাসা এবং দুর্গত স্বদেশের জন্য যন্ত্রণাবোধের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে!

প্রতিরোধের একাত্মতা প্রচার-মূলক তীব্র ব্যঙ্গেই শেষ হয়, এমন নয়। এই টান শিল্পীকে দেশের মানুষের জীবনের মাঝখানে নামিয়ে আনে। দুর্গত স্বদেশের মানুষ কী প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। বেঁচে থাকাটাই যেন পৌরুষের প্রমাণ এদেশে। মাঠেঘাটে জলেজঙ্গলে খেটে খাওয়া এই দেশবাসীর জীবনযাত্রার বাস্তবতা ছেড়ে শিল্প কোথায় দাঁড়াবে, কীভাবে চরিতার্থ হবে! এই বিস্তারে যাবার জন্য নন্দলাল কালি -তুলির সবল আঙ্গিক আশ্রয় করেছিলেন। কর্মিষ্ঠ মানুষের শ্রমের গৌরব, উৎসবের উল্লাস, অবমাননার গ্লানি নিয়ত তুলে আনতেন সাদাকালোর কাজে। বাস্তবের উদ্দীপনা সরাসরি ছবির জমিতে ধরে দেবার কুশলতায় তিনি ভারতীয় শিল্পে এই একটি নতুন প্রশাখা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। এত মানুষ, মানুষের মুখ এবং গতিভঙ্গির এত বিচিত্রতা, কী করে যে তুলে নিতেন— সে এক বিস্ময়। জীবনের কত বড়ো পরিপ্রেক্ষিত তিনি অভিজ্ঞতায় ধারণ করতেন! বিশেষ করে এই কাজের ধারায় একটি নতুন আঙ্গিকের পত্তন হয়েছিল— যা পরেও অনেকে ব্যবহার করে এসেছেন।

এই সূত্রে তাঁর শক্তির আর এক বিস্ময়কর প্রকাশ হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮)

মণ্ডপের দেওয়াল সাজানোর জন্য তৈরি মিউরাল (mural) গুলির কথা মনে আসে। বলা হয় হরিপুরা পোস্টার। বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রচার মূলক ছবি নয় এগুলি। নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় দেওয়ালে পরপর রাখার উদ্দেশ্যে আঁকা হয়েছিল। তাই মিউরাল বলাই ঠিক। ১৯৩৬-এ গান্ধীজী লখনউ কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ভারতীয় শিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার দায়িত্ব নন্দলালের উপরে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭-এ নন্দলাল ফৈজপুর অধিবেশনের পুরো মণ্ডপ-নগর তৈরির দায়িত্ব পান এবং কঠিন পরিশ্রমে একটি শোভন স্থাপত্য গড়ে তোলেন। সে স্থাপত্যের উপকরণ ছিল সাধারণ কুটির তৈরির বাঁশ-খড়-দরমা। পর বৎসর আবার ডাক এল। গুজরাট প্রদেশে বারদৌলির কাছে হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ সাজানোর জন্য নন্দলালকে ডাকায় গুজরাটি শিল্পীদের মধ্যে আপত্তি উঠেছিল। সে আপত্তি গান্ধীজী অগ্রাহ্য করেন। আপত্তির জন্যই নন্দলাল গোড়ায় দায়িত্ব নিতে রাজি হন নি। স্থানীয় শিল্পীরা অন্য কাজ করবেন, কিন্তু ছবির মূল দায়িত্ব নন্দলালকেই নিতে হবে— গান্ধীজীর এই নির্দেশ শেষ পর্যন্ত মানতে হল। সময় বিশেষ ছিল না। তাই নন্দলাল নির্মল কুমার বসুকে ওড়িশার শিল্পীদের দিয়ে কিছু পট করিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ওড়িশার পট তো খুব বড়ো হয় না। চেষ্টাটা তাই সফল হল না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে দেবার তাগিদ থাকায় খুব বেশি পরীক্ষা চালাবার উপায় ছিল না। গুজরাট প্রদেশে অধিবেশন হচ্ছে ভেবেই সম্ভবত জৈন ছবির অনুকরণে শুরুতে কিছু ছবি করলেন। ও ভাবে সবটা দাঁড় করানো যাবে না দেখে ভারতীয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিফলন হবে এমন করে বিষয় বাছাই করে এক-একটি বিষয় ধরে দ্রুত ড্রয়িং করে চললেন। হাতে-তৈরি পুরু কাগজের উপরে বোলপুর বাজারে যা রং পাওয়া গেল তাই দিয়েই এই যে চিত্রমালা রচনা করে তুললেন, নন্দলালের নিজের সৃজনধারায় নয় শুধু, ভারতীয় আধুনিক শিল্পে এর তুল্য কাজ আর হয় নি।

এখন ৮৩ খানি ছবির হিশেব পাওয়া যাচ্ছে। সংগীত পর্যায়ের ১৬ খানি, খেলাধুলো পর্যায়ের ৮ খানি, গৃহস্থ জীবনের ১৬ খানি, কুটির শিল্প পর্যায়ে ২২ খানি, পল্লী ও তরুণী মেয়ে পর্যায়ের ৬ খানি এবং জীবজন্তু ও অলংকরণ মিলিয়ে ১৫ খানি। নানা জীবিকার মানুষ, গেরস্থালির নানান্ দৃশ্য, সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক রুচির নমুনা গান-বাজনার-খেলাধুলোর দৃশ্য, এই জীবনেরই পরিবেশের জীবজন্তু— এই হল ছবিগুলির বিষয়। তীব্র সংবেদনময় রূপায়ণে জীবন থেকে তুলে আনা বিষয় যেন আয়াস ছাড়াই এক মহিমাময় শিল্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অবশ্যই বহু আয়াস, বহু অভিজ্ঞতা পেরিয়ে তবে কোনো শিল্পী এমন সিদ্ধিতে পৌঁছতে পারেন যার সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকের মনে হয়, অবলীলায় সম্পন্ন কাজ।

লক্ষ করার বিষয়, প্রতিটি ছবিতেই আছে একটি নির্দিষ্ট আকারের বাঁধুনি। একটি

বাঁকা খিলানের মতো ঘেরের মধ্যে বিষয়বস্তু ন্যস্ত। প্রতিটি ছবিতেই। দেওয়ালে মিউরালের মতো পরপর রাখা হবে জেনেই পরিসীমার মিল নিয়ে ভাবতে হয়েছে। পাকা দেওয়ালে কোনো ছবি করার সময়ও এমনি একটি বিন্যাসের একতা অনাহত রাখতে হয়। এই চিত্রমালার কিছু কাজ দেখার অভিজ্ঞতা থাকলে মনে পড়বে প্রতিটি ছবিতে চরিত্ররূপ, বস্তুরূপ স্পষ্ট এবং প্রবল। ফর্মগুলির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য রং এবং রেখা সমান গুরুত্বে প্রয়োগ করেছেন। সবল রেখার বাঁধুনিতে রঙিন এলাকাগুলি বেঁধেছেন। আবার অবয়বের ভঙ্গিতে গতি আনবার জন্য পোশাক-আশাকের মধ্যে হাওয়ার দোলা খেলাবার জন্য দ্রুত ক্যালিগ্রাফিক রেখা টেনেছেন। ইতস্তত ভাঙা রেখা বা ফুটকি দিয়ে ছবির মধ্যে বিন্যাসের ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।

হরিপুরা চিত্রমালার শৈলীর মর্ম ঠিক ঠিক ধরার জন্য কাজটি কীভাবে করা হয়েছিল জানতে হয়। অনেক টুকরো খবর শ্রীবিশ্বরূপ বসুর কাছে পেয়েছি। তিনি সৃষ্টির সময়ে আর-সকলের সঙ্গে সহকারিতা করেছিলেন। আঁকা শেষ করতে হয়েছিল সময়সীমার দিক থেকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে। তাই কাগজ মাউন্ট করে দেওয়া, পটভূমির রঙ লাগানোয় ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নিতে হয়েছে। সে হিশেবে এ একটা যৌথ কাজও বটে। কিন্তু মূল ড্রয়িংয়ের বনেদ তৈরি এবং শেষ রেখার বৈদ্যুতি স্বয়ং নন্দলালেরই হাতে সারা যে হয়েছে— অভিজ্ঞ দর্শককে তা বলে দিতে হয় না। অত্যন্ত তেজোময় রেখাঙ্কনে মূল ফর্ম বা রূপটি দ্রুত অথচ অব্যর্থভাবে ধরতে পেরেছেন শিল্পী। দিনে ১৫/২০টা অমন ড্রয়িং দাঁড়িয়ে যেত। তার পরে ছিল রঙ চাপানো। রঙ তো যতো সস্তার মেটে রঙ, আর রবিন ব্লুর প্যাকেট। একাজ স্থায়ীভাবে সংগ্রহে থাকবে আদৌ ভাবেন নি। রঙের সংখ্যাও ৩/৪টিতে সীমিত। জমি রঙে ভরাট করায় ছাত্রছাত্রীরা হাত লাগাতেন। তার পরের খেলাটা আবার ফিরে নন্দলালের তুলির। এইভাবে মূল ছবি শেষ হলে সহকারীরা কপি করতে লেগে যেতেন। একই ছবির অনেককটি করে কপি। কারণ কাজ খানিকটা এগোতে ঠিক করা হয়েছিল মূল ছবি হরিপুরায় পাঠানো হবে না। অমন একটা সমারোহে একবার বেড়ায় সাঁটা হলে আর সে ছবি বাঁচানো যেত না।

ভাস্কর্যে এবং ছবিতে রেখার সামর্থ্যে বিচিত্র অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে— নন্দলাল আযৌবন অনুশীলনে জানতেন। চীন-জাপানের ক্যালিগ্রাফিতে রেখার প্রচণ্ড শক্তিময় প্রয়োগও তাঁর নিবিষ্ট অনুশীলনের বিষয় ছিল। রঙ ব্যবহারে মোটা তুলির কাজও এর আগে অনেক করেছেন। তাঁর এইসব প্রকরণগত অভিজ্ঞতার পরিচয় যদি জানা থাকে, তবেই হরিপুরার দেওয়াল চিত্রে আঙ্গিকের এমন সরলতা এবং সংশয়হীন নৈপুণ্যে উত্তরণ কী করে সম্ভব হল, বুঝতে পারা যায়। এই চিত্রমালায় নন্দলালের শিল্পীব্যক্তিত্বের ছাপ অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু তাঁর আগের পর্যায়ের



হরিপুরা মিউরাল ১৯৩৭



হরিপুরা মিউরাল ১৯৩৭

আর-কোনো কাজের সঙ্গে হুবহু মিল নেই। এখানে একটি নির্দিষ্ট উত্তরণ পর্বের দৃষ্টান্ত আমরা পাচ্ছি। নির্দিষ্ট শৈলীর কাজ।

এটা কী বাংলা পটের প্রভাবে হল ? বিশেষ করে কালীঘাটের পটের প্রভাবে—যেমন অনেকেই বলেছেন ? কালীঘাটের রীতি নন্দলালকে এক সময়ে গভীর ভাবে টেনেছিল। বাজারের পটুয়াদের মতো আঁকতেন এবং ২ আনা ৪ আনায় বিক্রি করতেন। অবনীন্দ্রনাথ রাশ টেনে না ধরলে এই চর্চাটা হয় তো স্থায়ী হত তাঁর জীবনে। কিন্তু আমরা জানি না নন্দলালের হাতে কালীঘাটের রীতি ঠিক কী চেহারা নিয়েছিল। সেসব ছবির স্মৃতি কেউই ধরে দিয়ে যান নি। অবনীন্দ্রনাথ যেগুলি কিনে নিয়েছিলেন সেগুলিই বা কোথায় গেল ? না-দেখা দৃষ্টান্ত ধরে কথা বলা চলে না। তাই হরিপুরার দেওয়াল চিত্র প্রসঙ্গে মূল কালীঘাটের শৈলীই বিবেচনা করতে হবে।

প্রচুর কথা বলা হয়েছে কালীঘাটের শৈলী নিয়ে। খুব স্থির এবং সকলে মেনে নেন এমন সিদ্ধান্ত অবশ্য বেরিয়ে আসে নি। তবে পটের ইতিহাস এবং উপাদান উপকরণের বিচার বিশ্লেষণ এবং খুব পুরানো নিপুণতা ও অভ্যাস সমকালীন তাগিদে বদলে নিয়ে ব্যবহারের প্রমাণ যতটা দেখানো হয়েছে এ-তাবত, সেই জ্ঞানের উপর ভরসা আর নিজের চোখের উপরে আস্থা রেখে এখনকার দর্শক মানতে পারেন, রেখার একটি বিশিষ্ট শৈলী কালীঘাটের পোটোদের হাতে জমে গিয়েছিল। দ্রুত কাজ করার পক্ষে, বিষয়ের অনন্যতাটি অব্যর্থভাবে ধরে দিতে এবং সেই রেখাতেই রূপের আদল ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে তুলিতে ঈষৎ চাপ দিয়ে মডেলিংয়ের কাজও সেরে ফেলায় এই রেখা-শৈলী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। 'গোষ্ঠলীলা'-র মতো জাঁকালো রঙিন পট, যাতে বিলিতি জলরঙের কলাকৌশল অনুসরণ করা হত, সেগুলির কথা বাদ দিলে পুরানো কালীঘাটের পটে মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের চরিত্ররূপ আঁকায় বাংলার পুতুল ও প্রতিমার গঠনের আদল ব্যবহার করা হয়ে এসেছে। বাংলার নানা ধরনের কারুকৃতির সঙ্গে পটের এ মিলের দিকটি অশোক মিত্র দেখিয়েছিলেন (ভা-চি, পৃ. ২৪৯-৫৭)। সত্যিই বাংলা শিল্পকাজের এই একটি অক্ষয় ধারা আছে, আজও যার বিলয় হয় নি। বেশ বেলনাকার হাত পা, গোল বা পানপাতা ভারি মুখ, ভাব লাগা টানা টানা চোখ। এই আকৃতি পটে তো বটেই, এমন কী কাঁথার কোঁড়ে, ছুঁচের নানান্ কাজে, গঙ্গাজলির বা আমসত্বর ছাঁচেও দেখতে পাওয়া যায়। পটুয়ারা অনেকে তো পটে আঁকা চরিত্ররূপকে আজও পুতুলই বলেন। কালীঘাটের পটের রেখার দৃষ্টান্তটির সঙ্গে হরিপুরা মিউরাল থেকে নেওয়া দৃষ্টান্ত দুটি মেলাবার চেষ্টা করলেই রেখাপাতের ভিন্নতা চোখে ধরা দেবে। কালীঘাটের পটুয়াদের হল তুলি যতটা সম্ভব না তুলে একটানে রূপ ফোটানো। হরিপুরার ছবিতে তুলির এই চাল নেই। এখানে সেখানে অতি ক্ষিপ্র টানে ক্যালিগ্রাফিক রেখা ফেলে



কালীঘাট- পটের রেখা

যাওয়া। নন্দলালের ভাষায় শরপাতি (শর পাতার মতো) রেখা। কবজির গতিভঙ্গি একেবারেই আলাদা। একটানা নয়, ভাঙা লাইনেরই ব্যবহার বেশি। কালীঘাট বা অন্য বাংলা পটের সঙ্গে হরিপুরার ছবি আরও একজায়গায় একেবারেই মিলবে না। হরিপুরার ছবিতে আছে গতির তীব্রতা, যেটা ওভাবে পটে থাকত না। ছুটন্ত বা নৃত্যপর মেয়ে-পুরুষের বেলায় নয় শুধু, কান পরিষ্কার করছে যে লোকটি, জুতো শেলাই যে করছে, কাঠ সাইজ করছে যে ছুতোর— প্রত্যেক শরীরেই কাজের ছন্দটি গতি-প্রাণ রেখায় অব্যর্থ ভাবে ধরা। এ কলাকার পুত্‌লি বানায়া— বলা যাবে না। ওই কাজের ছন্দেই, ক্ষিপ্র রেখায় সচল জীবনকে ধরেছেন। যদিও সে ধরার কৃৎকৌশল বাস্তববাদী নয়, অনুপুঙ্খে সাদৃশ্যময় কখনওই নয়। এই একটি স্বতন্ত্র শৈলী আমাদের ছবিতে রয়েছে, যার কোনো অনুবর্তন দেখি নি। নন্দলাল নিজেও আর করেন নি।

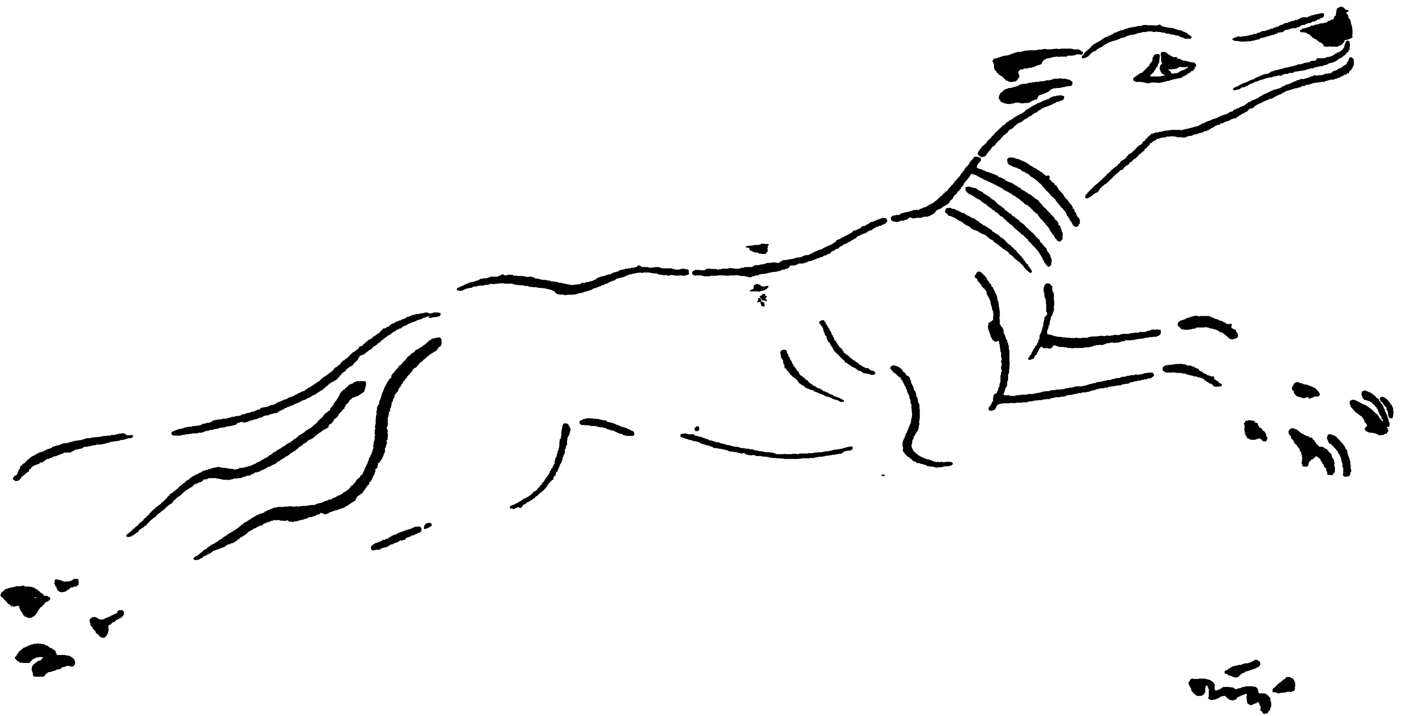
পেন্সিল ড্রয়িংয়ে চিত্রবিষয়ের শরীর, পোশাক-আশাকের ধরন, বস্তুর আকার ছকে নিয়ে তারপরে রঙ চাপানো হয়েছে। বিভিন্ন রঙের বা একই রঙের হাল্কা-গাঢ় পোঁচ পরস্পরে মিলিয়ে দেওয়া হয় নি। মোটা তুলির ছোপ, মোটে চিকন নয়। রঙিন এলাকা কালো লাইনে বেঁধে স্তরভেদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিশেষ করে আদুড়



হরিপুরা মিউরালের রেখা

গায়ের মাংসপেশির সংস্থানের শরীরের মোচড়ের গতিময়, সংবেদন তীক্ষ্ণ করে তোলার জন্য যে ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত রেখা ফেলে ফেলে ছবি সেরেছেন, তার মূল চালটা ক্যালিগ্রাফিক। এই চালের রেখা নন্দলালের কালিতুলির কাজে হামেশা দেখা যাবে। নজর করে দেখলে নন্দলালের এই রেখার সঙ্গে জাপানি লিপিকলার মিল পাওয়া যায়। তেমনি ছন্দোময়, নমনীয়, গতিপ্রাণ রেখা। আর, সস্তার মেটে রঙে করা এই টেম্পেরা কাজগুলিতে কী করে যে এত আলোর তেজ এনেছেন! সবুজ এত উজ্জ্বল! ভারতীয় মানুষের রোদ খাওয়া চামড়ার বাদামি রঙের কত রকমফের এই ছবিতে। চরিত্রগুলির পোশাকের দিকে, একটু-আধটু গাছ গাছালির আভাসের দিকে নজর গেলেই অনুভব করা যায় কেমন হাওয়া খেলছে ছবির মধ্যে।

বস্তুত এই চিত্রমালার প্রতিটি কাজই থমকে থমকে দেখতে হয়। ছবির জমিকে চূড়ান্ত দ্বিমাত্রিক ধরা আধুনিকতর শিল্পনীতির ভিত্তি। নন্দলাল এই ছবিতে কোথাও সে নীতি ভাঙেন নি। ক্যালিগ্রাফিক রেখায় তাঁর সিদ্ধাই প্রসিদ্ধ, জমাট রঙ ব্যবহারের পরীক্ষাও আগের আলংকারিক কাজে বার বার দেখা গেছে। সে নিপুণতা এই মিউরালগুলিতে যে উদ্দীপনায়, স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করেছেন তার উৎস ব্যাপক



হরিপুরা মিউরালের রেখা



নবম শতাব্দীতে শিল্পী কুকাই চীনালিপির অনুকরণে এই
লিপিতে জাপানি সোশো বা টানা লেখা প্রবর্তন করেন

জীবনাগ্রহে, গভীর সামাজিক দায়িত্ব চেতনায়। একে বলতেই হবে আঙ্গিকের বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ, অথচ এ ছবির আবেদন নিছক মননের স্তরে আবদ্ধ নয়। দর্শকের সংবেদনে সহজে পৌঁছে যায় এই শিল্পিত বাস্তবের আবেদন। লৌকিক ছবির মতো বিষয়ের মূল সত্য প্রত্যক্ষ করে তোলার উদ্দীপনার সঙ্গে মিউরালগুলিতে মিলেছে আধুনিক মননের আলোয় শুদ্ধ রূপের গড়ন ধরার নিপুণতা। প্রকাশ শৈলীর ঋজুতা কত প্রবল হতে পারে, কত অব্যবহিত সংবেদন সঞ্চার সম্ভব আমাদের আধুনিক ছবির জগতে, হরিপুরা চিত্রমালা তারই স্মরণীয় শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত। এই সেই নন্দলাল যিনি একদা ইতিহাস-পুরাণে স্বদেশ খুঁজতেন; কত অভিজ্ঞতায়, কত পরীক্ষার পথ ভেঙে ভেঙে আজ একেবারেই ধুলোমাটির মানুষের মধ্যে তাঁর স্বদেশকে পেলেন— হরিপুরা চিত্রমালার সামনে দাঁড়ালে এই কথাটা মনে ওঠে। আর মনে করে বিস্ময় লাগে যে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর মতো শিল্পজগতের "অভিভাবকেরা" এসব কাজ করানোকে শিল্পাচার্যের মতো ব্যক্তির অবমাননা মনে করেছিলেন!

একা নন্দলাল নয়, সমকালীন তরুণ অনেক শিল্পীও জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে দূরে বসে শিল্পের মানে পাওয়া যাবে ভাবতে পারছিলেন না। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ভয়ংকরতা শুধু আমাদের দেশের নয়, সারা পৃথিবীতেই সংস্কৃতিকর্মীদের চেতনায় নতুন দায়বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। বিশ্বজোড়া সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের শৃঙ্খলায় আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও সামিল হন। এক আলাপনে প্রাণকৃষ্ণ পাল



"অন্নপূর্ণা যার ঘরে   সে কাঁদে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ."—ভারতচন্দ্র

অন্নপূর্ণা ও রুদ্র ১৯৪৩ ওয়াশ-টেম্পেরা

সেই দুর্যোগের দিনগুলির কথায় বলেছিলেন, ইন্‌ডিয়ান্‌ সোসাইটিতে ক্ষিতিনবাবুর কাছে শিখতেন আদি বাংলা ঘরানার কাজ। আর বাইরে তখন মারিমড়কে চারপাশে মানুষ উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে। পথেঘাটে প্রকট সেই ভয়ংকর বাস্তব এড়ানো আর সম্ভব ছিল না। তাই সব ভাবভাবুকতা ছেড়ে দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল শিল্পীদের। একা প্রাণকৃষ্ণ নন। ১৯৪৩-এর দুর্দিনে শক্তিমান এক তরুণ শিল্পীদল একজোট হন, যার মধ্যে ছিলেন সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, প্রদোষ দাশগুপ্ত, নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন। শিক্ষায়-চর্চায় এবং শিল্পরুচিতে আলাদা ব্যক্তিত্বের মানুষ হলেও কঠিন সেই দুর্যোগের দিনে সংঘবদ্ধ আত্মানুসন্ধানে এঁরা একত্র মিলেছিলেন। সে বন্ধুগোষ্ঠী 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নামে পরিচিত। এঁদের সঙ্গে পরে যোগ দেন রামকিংকর বেইজ, গোবর্ধন আশ, অবনী সেন। যুদ্ধের, মন্বন্তরের ধাক্কায় এক চরম সংকটের মুখে এই শিল্পীরা সাহিত্য-নাট্য-সংগীতের সমকালীন স্রষ্টাদের মতোই প্রখর মানবিক দায়িত্ববোধে শিল্পে নতুন সারবস্তু সঞ্চার করতে চাইলেন। বিপন্ন অস্তিত্বের মুখে শিল্পের মূল্যগৌরব কোন্‌ ভিতে প্রতিষ্ঠা পাবে, এ জিজ্ঞাসা তখন একই জায়গায় সকলকে জমাট করে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। এইভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মোর্চা 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পীসংঘ' জন্মেছিল। (২৮ মার্চ ১৯৪১)। আপদ্‌কালের সতর্ক সচেতনতায় কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সকলকেই বোঝাপড়া করতে হয়েছে। জীবনের বাস্তব উৎসে যাওয়া এবং জীবনের সংকট ও বিপন্নতার শিল্পরূপ রচনার সংকল্পে তরুণ শিল্পীরা নিজ নিজ স্বভাবে সে সময়ে অসামান্য কাজ করেছেন। বাস্তব জীবনাগ্রহে এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে আমাদের শিল্পের ইতিহাসে ৪০-এর পর থেকে জাগরণের আর-একটা তরঙ্গ এসেছিল, তৃতীয় তরঙ্গ।

শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার এই পর্বে কত রকমের যে কাজ হয়েছে আজও তার পুরো সমীক্ষা হয় নি। কিন্তু জয়নুল আবেদিন, সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গোবর্ধন আশ, অবনী সেন, গোপাল ঘোষ, অতুল বসু— এই নামগুলি মনে ওঠা মাত্র যেন পুরানো ক্ষত টাটিয়ে ওঠে। শোষিত ভারতবর্ষের দুর্গতি বোধ হয় আমাদের স্মৃতি-কালে চরম অবতলে পৌঁছেছিল বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে। সে দুঃসময়ের তীব্র চাপে অধীর এই তরুণ শিল্পীরা সরাসরি পথে নেমে গিয়েছিলেন, উপোসি কাঙাল স্বদেশকে চিনেছিলেন গ্রাম ছেড়ে শহরের উদ্দেশে ধাবমান শুধু চামড়ায় মোড়া নারী-পুরুষ-শিশুর ভিড়ে, খাদ্যের জন্য ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের দুঃসহ দৃশ্যে, মড়া ছড়ানো নগরীর পথে পথে। দুঃসময়ের এই শিল্পের প্রধান মাধ্যম ছিল কালিতুলি বা শুধুই কলম। স্মরণ হবে, কালিতুলির মাধ্যমটিকে নন্দলাল নিয়ত ব্যবহারে ভারতীয় আধুনিক ছবির এক সম্ভাবনাময় মাধ্যমে দাঁড়

করিয়ে দিয়েছিলেন। সে সম্ভাবনার চূড়ান্ত বিকাশ হল মন্বন্তর চিত্রমালার অসাধারণ এবং মর্মান্তিক সৃষ্টিতে। তীক্ষ্ণ তীব্র রেখায় সোমনাথ হোড়ের হাতে মুমূর্ষু মানুষের আর্তির প্রকাশ, চিত্তপ্রসাদের স্কেচে-গ্রাফিক্‌সে মানুষের দুর্গতির বিশদ প্রতিফলন, জয়নুল আবেদিনের সবল তুলির মোটা রেখায় ধরা ক্ষুধার্তের মরিয়া বা বিবশ দেহ-ভঙ্গি নন্দলালের দেখানো পথেই শিল্পকে দুর্গত স্বদেশে মিলিয়েছিল।

এই আকালের বীভৎসতার চাপে নন্দলালের প্রিয় শিব-পার্বতীর পুরাণপ্রতিমা এক তীব্র সংবেদনময় প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। ওয়াশ এবং টেম্পেরা পদ্ধতির মিলিত ব্যবহারে আঁকেন 'অন্নপূর্ণা ও রুদ্র' (১৯৪৩) রঙিন ছবি। হলুদে বাদামিতে মেশানো গাঢ় পটভূমির উপরে নীল একটি বৃত্ত। পদ্মে বসা অন্নপূর্ণার হাতে অন্নপাত্র। তার সামনে ভিক্ষাপাত্র মেলে ধরা হাত কঙ্কালময় শিব। কাঙাল নটরাজ, যার কঙ্কালময় শরীর ঘিরে রয়েছে খিদের জ্বালার প্রতীক চিহ্ন। নন্দলালের নিজস্ব ছন্দোময় রেখাশৈলী এই ছবিতে বিপন্ন বাস্তবকে ধারণ করে আছে।

সময়ের জটিলতা এবং দ্বন্দ্বে সংঘাতে দীর্ণ জীবনের ব্যস্তবতা এড়িয়ে গেছেন, নন্দলাল সম্পর্কে এমন কোনো সিদ্ধান্ত টেকে না। না মেনে উপায় নেই যে, যে-কোনো দুরূহ পরিস্থিতি শিল্পের নিয়মে বশে আনার সামর্থ্য নন্দলালের স্বভাবগত হয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নপ্রয়াণে আত্মপ্রতারণার কোনো প্রশ্রয় ছিল না তাঁর জীবনে। সময়ের স্রোতে বাঁক এবং ঘূর্ণির মুখে দাঁড়িয়ে সচেতনভাবে জীবনের সত্যাসত্য বুঝতে চেয়েছেন। নিজের অবস্থান থেকে সব আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন শিল্পের ভাষায়।

১৬

বড়ো মাপের কাজে আমাদের আধুনিক শিল্পীদের সাহসের অভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করতেন। তুলনায় জাপানি শিল্পীদের সাহসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। নিজে এবং ছাত্রদের দিয়ে একের পর এক ফ্রেস্কো পরিকল্পনা করে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ মোচন করেছিলেন। সামান্য অভিজ্ঞতা সম্বল করে তিনি ১৯১৬-১৭-য় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম দেশের এই অবলুপ্ত শিল্পধারা আবার প্রবর্তনের উদ্যোগ করেন। শান্তিনিকেতনে এই ধারায় পরীক্ষার অফুরন্ত সুযোগ পেলেন। ফ্রেস্কোয় নিরন্তর যে পরীক্ষা চালিয়েছেন তাতেও আঙ্গিক বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামিমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশি ভিত্তিচিত্রের নৈপুণ্য কোন্ চূড়া স্পর্শ করেছিল, একদা অজন্তা এবং বাঘ অনুশীলনে তিনি সে অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন হয়েছিলেন। নরসিংলালকে আনিয়ে নিজে তার জোগানদারের মতো কাজ করে জয়পুরি ধারায় হাত পাকিয়েছিলেন। অন্য দিকে তাঁরই ছাত্রী প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে ইতালীয়





চীনাভবনে নটির পূজা:
মিউরাল ১৯৪২

পদ্ধতি আয়ত্ত করতে বাধা বোধ করেন নি। শান্তিনিকেতনে পুরানো লাইব্রেরি বাড়ির নিচতলায় দেওয়ালে জয়পুরি কাজ যেমন দেখা যায়, তেমনি শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ উৎসব'-এ ইতালীয় পদ্ধতির কাজে তাঁর পারদর্শিতার আভাস আজও কিছুটা পাওয়া যায়। কিন্তু নান্দনিক তৃপ্তির বিরল স্মরণীয় অভিজ্ঞতা চীনাভবনের সামনের দেওয়ালে 'নটীরপূজা' (১৮ ফাল্গুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৪২ খৃঃ) দেখা।

রেখার ভাষাই ভারতীয় শিল্প-প্রতিভার শ্রেয়ত্বের ভিত্তি, সারা জীবনের অনুশীলনে নন্দলাল এই স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলেন। ভারতীয় ছবির গড়নের রেখা অনুশীলনের সঙ্গে, বিশেষ করে আরাই কাম্‌পোর সান্নিধ্যে আসার পর থেকে, নন্দলাল জাপানি ও চীনা লিপিকলা, ক্যালিগ্রাফির মর্ম আত্মস্থ ও ব্যবহার করে এসেছেন। তাঁর ছোটো-বড়ো সব কাজে গড়নের রেখা এবং লিখনের রেখার মিশ্রপ্রয়োগে অর্জিত অনায়াস সপ্রাণতা স্বতন্ত্র অভিনিবেশের বিষয়। এই কলানৈপুণ্য যেন চূড়ান্ত পর্যায়ে, অখণ্ড এক উদ্দীপনার চরমে পৌঁছেছে 'নটীর পূজা'র ট্র্যাজিডি রূপায়ণে। মনের ঝুলিতে জমে থাকা অভিজ্ঞতার কোন্ সঞ্চয় যে কখন কাজে এসে যাবে সে বোধহয় কোনো শিল্পীর জানাও থাকে না। কোথায় খড়্গপুরে এক অদ্ভুত প্রকৃতির শিল্পীকে ন্যাকড়া ভাঁজ করে ছুঁচালো কোণটি তুলির মতো ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। করণের সরলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এত বড়ো একটি দেওয়াল জোড়া কাজে নন্দলাল সেই সরলতম করণ কাজে লাগালেন। রঙে-ভেজা ন্যাকড়ায় চাপের তারতম্যে সরু মোটা রেখার প্রবাহ যেমন, তেমনি একই সঙ্গে ছোপছাপের প্রয়োজন মিটিয়ে চলায় হাত কোনোই বাধা পাবে না ভেবেছিলেন সম্ভবত। কাজটি দেখতে দেখতে এই রকমই মনে হয়। পর্বভাগ আছে ভিত্তিচিত্রটিতে। ধাপে ধাপে ভাবগত টেন্‌শনের সঙ্গে রেখার টেন্‌শনের মাত্রা চড়িয়ে যাওয়ার ধরন অনুসরণ করেন দর্শক, যাব শীর্ষতম মুহূর্ত নটীর আরতি নৃত্যের দৃশ্যে। ছন্দিত রেখার গতি দিয়ে গড়া নৃত্যপর নটীর প্রতিমায় নাট্যমুহূর্তের উঁচু পর্দাটি তিনটি আশঙ্কায় স্থির নারীদেহের বৈপরীত্যে অব্যর্থ হয়ে ওঠে। তার পরেই আসে রেখাগতির স্তিমিত চলন— যা বিবশ পরিণামে স্থির হয়ে আছে মাটিতে লুটিয়ে পড়া নটীর স্থির শরীরে, ক্যাথারসিসের প্রশান্তিতে। বিষয়ের অনুষঙ্গ কারো না জানা থাকলেও এই রেখায় বাঁধা তীব্র ট্র্যাজিডির মহিমা অনেকটাই যে অনুভবের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায় তার কারণ, অসামান্য অভিব্যক্তিময় রেখা প্রয়োগের শক্তি। আঁকবার সময়ে শিল্পীর অনুভূতি হয়েছিল যেন চলমান রেখাকে অনুসরণ করছে তুলি, যেন তিনি রেখা টানছেন না। "হঠাৎ মনে হল রেখা স্বয়ং এগিয়ে চলেছে আর আমার তুলি যেন তার অনুসরণ করছে মাত্র।…এটা একটা সিদ্ধাই বলা যেতে পারে…।" (কানাই সামন্ত ধৃত উক্তি)। কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই এই উপলব্ধিতে। কার্টুন না করে সরাসরি দেওয়ালে এঁকেছিলেন 'নটীর পূজা'। বহু অনুধ্যানে পর্যায়ানুক্রমিক

রূপকল্পগুলি মনে এতই দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল, মনঃসংযোগ এতই 'তৈলধারাবৎ' এবং মন ও স্নায়ু এমন একতানে বাঁধা হয়েছিল যে রেখাই যেন হাত টেনে নিচ্ছে—এমন উপলব্ধি হল।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে নন্দলাল বরোদার কীর্তিমন্দিরে চারদফায় 'গঙ্গাবতরণ', 'মীরাবাঈয়ের জীবন', 'নটীরপূজা' এবং মহাভারতের চারটি দৃশ্য আঁকেন। মোট পরিসর ছয় শো বর্গফুট এবং তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে মাপে বড়ো।

১৯৪৫-এর মধ্যে এই ভিত্তিচিত্রগুলি যখন করেন নন্দলাল সেই সময়ের বেশ কিছুটা আগে থেকে শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায় শিল্পভাবনার পালাবদলের সূচনা হয়েছিল। এই হাওয়া বদল সম্পর্কে নন্দলাল অবহিতও ছিলেন। আধুনিকতর মনের শিল্পভাষা অন্বেষণ কোন্ ধারায় কোন্ চরিতার্থতায় পৌঁছেছে আজ, তা আমাদের চোখের সামনে ধরা রয়েছে। তার মূল লক্ষণটিকে বলা যায় আবেগের সাক্ষাৎ প্রক্ষেপের পরিবর্তে বুদ্ধির তির্যক পথে সংহত এবং ধারালো রূপকল্প নির্মাণ। এম্প্যাথির (empathy) রেশ পূর্ণত বিলুপ্ত করে দেওয়াই আধুনিক শিল্পের জোরের দিক। সেজন্য চিত্রগত বস্তুর গড়নের আয়তন ভাঙতে হয়, পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক অনুপাতে হেরফের ঘটানো অনিবার্য হয়ে ওঠে। কম্পোজিশনের বাঁধুনি গড়ে ওঠে জ্যামিতিক বিন্যাসের ন্যায়ক্রম অনুসরণ করে। চীনাভবনের 'নটীর পূজা' দেখে হিন্দিভবনে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের তিন দেওয়াল ভরা ভিত্তিচিত্রের (১৯৪৭) সম্মুখীন হওয়া মাত্র আমরা অনুভব করি, রূপ নির্মাণের ভিন্ন ব্যাকরণ এই কাজটি নিয়ন্ত্রণ করছে। তফাতটা ঠিক কোথায়? 'নটীর পূজা'য় পর্ব-পর্বান্তর জুড়ে কম্পোজিশনের বাঁধুনি গড়ে উঠেছে রেখাগতির ছন্দোময়তায়। রঙের স্পর্শনগুলো যদি মনে মনে মুছে ফেলা যায় তবুও রেখার ছন্দ-বন্ধন অটুট থাকে যেন। রেখার ইঙ্গিতময় ভাষাটা যেন অনুভবের মধ্যে বাজতে থাকে। বিনোদবিহারীর কাজের আকারগত বিশালতায় অভিভূত হবার মতো অভিঘাত কেটে গেলে নিবিষ্ট অবলোকনে উন্মোচিত হয়, দৃশ্যবস্তুর প্রত্যাশিত পারস্পরিক অনুপাতের অভ্যস্ত ধারণায় শিল্পী আঘাত করছেন। সন্তদের দীর্ঘায়ত আকৃতি এবং সাধারণ মানুষজন ঘরবাড়ি গাছপালার মধ্যে অনুপাতের বিষমতা কম্পোজিশনের ভিন্ন গুণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। প্লাসটি-সিটি বা স্পৃশ্যতা যেন শুধু দৃষ্টির মায়ায় নয়, অবয়ব ও বস্তুপুঞ্জ ছুঁয়েও অনুভব করা যায়। সর্বতোভদ্র জীবনের অনিঃশেষ প্রবাহের মধ্যেই আছেন সন্ত পুরুষেরা। প্রাত্যহিকে সংলগ্ন, অথচ তাঁদের সাক্ষাৎ উপস্থিতি সকলকে ছাড়িয়ে ওঠে। এই তাৎপর্য প্রক্ষেপের জন্য শিল্পী বাস্তবতার মানপরিমাণ ভেঙেছেন। দৃশ্যবস্তুময় অংশ এবং ছেড়ে দেওয়া জমির, আলোকিত এবং ছায়াময় অংশের প্রতিসাম্যের, পারস্পরিক বাঁধুনির দিক থেকেও নন্দলালের এবং বিনোদবিহারীর কাজ দুটির নীতি আলাদা। ভারতীয়



চীনাভবনে নটীর পূজা
মিউর‍্যালের অংশ
১৯৪২



অর্জুন ১৯৩৬ ড্রাইপয়েন্ট

১৭

নন্দলাল যে শিল্পের আধুনিক বিশ্বের দিকে পিছন ফিরে বসে থাকা মানুষ ছিলেন না তা আরও একবার মানতে হয় তাঁর ছাপাই ছবির দৃষ্টান্তে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের দেশে গ্রাফিক্‌সের চলন হয়েছিল। সব আর্ট স্কুলে অল্পসল্প লিথোগ্রাফ -এচিং -এনগ্রেভিং শেখানো হত। কিন্তু সে ছিল ফরমায়েসি কাজ করার কারিগরি শেখানোর মতো। সে শিক্ষায় ছাপাই ছবির শিল্পত্ব ছাত্রদের বোধে সঞ্চারের লক্ষ্য ছিল না। ছাত্রবয়সে যে নন্দলালের এই বিদ্যায় খুব একটা আর্কষণ ছিল এমন খবর পাওয়া যায় না। তবে গ্রাফিক্‌সের চর্চার বিকাশ চোখের সামনে দেখেছেন। ওকাকুরার জাপানি ছাপা ছবির সংগ্রহ দেখা ছিল। মুকুল দে-র পারদর্শিতা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। গগনেন্দ্রনাথের লিথো প্রেসের কাজ তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল। রতন পারিমুর গবেষণায় ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে কলকাতায় য়ুরোপীয় কিউবিস্ট-এক্‌সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছাপাই ছবির প্রদর্শনীর খানিকটা নির্দিষ্ট বিবরণ এখন পাওয়া যাচ্ছে।* এই প্রথম কলকাতায় য়ুরোপীয় সমকালীন ছবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। কান্‌ডিন্‌স্কির লেখার উদ্ধৃতি পাই অবনীন্দ্রনাথে, আবার কিউবিজম্‌কে কুব্জাইজম্‌ বলে তাঁর ঠাট্টারও বিবরণ আছে। জানা নেই নন্দলালই বা কেমন ভাবে নিয়েছিলেন এই প্রদর্শনী। উদাসীন থাকা কলাসংস্কৃতি জগতের কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না মনে হয়। অভিব্যক্তির প্রবলতা কতদূর যেতে পারে এই

* "There was indeed an exhibition of the Bauhaus— in Calcutta in 1922 which was arranged following a suggestion of Rabindranath Tagore. This exhibition was sponsored by the Indian Society of Oriental Art. The exhibition consisted of 19 drawings and 16 woodcuts by Lyonel Feininger, 23 drawings by Johannes Itten, 4 aquarelles by Wassily Kandinsky, 9 aquarelles by Paul Klee, 20 woodcuts by Gerhard Marcks, 9 etchings by Georg Muche, 7 graphical works by Lothar Schreyer, 2 aquarelles by Sophie Korner and a few drawings and aquarelles by Margit Tery-Adler." বউহাস আরকাইভ থেকে পাওয়া বিবরণ, ডক্টর পারিমুকে লেখা ফেডারেল রিপাবলিক অব জর্মানির কন্‌সাল জেনারেলের চিঠিতে উদ্ধৃত। দ্র. Dr Ratan Parimoo, *The Paintings of Three Tagores*. Baroda 1973. P. 169.

প্রদর্শনীতে তার শিক্ষাপ্রদ নমুনা নিশ্চয়ই অনেক ছিল। সে ছবিগুলি আর জর্মানিতে ফেরত যায় নি, কোথায় যে গেছে কেউ আজও জানে না। তবে এইসব শিল্পীর অন্য কাজ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, প্রদর্শনীটি আমাদের জিজ্ঞাসু শিল্পীদের নিশ্চয় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। একটি ভিন্ন তাৎপর্যও ছিল এই প্রদর্শনীর। প্রদর্শনীর ক্যাটালগে বলা হয়েছিল, "আজকের য়ুরোপের নির্ধারণ অনুযায়ী সত্যিই যদি সভ্যতার বিলয় হয়, তবুও একথা বলতেই হবে যে শিল্পীরা বীরের মতো তাঁদের শেষ মরিয়া লড়াই লড়ছেন। কিন্তু সর্বদাই মৃত্যুর অর্থ পুনরুত্থান এবং শিল্প স্বভাবে অমর।"* নাৎসী জর্মান প্রশাসন এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রতিবাদ সহ্য করে নি। তাদের দেশছাড়া করেছিল, ছবি বাজেয়াপ্ত করেছিল। ক্রমে গাঢ় হয়ে আসা সভ্যতার সংকটের ছায়ায় এই শিল্পীরা ক্ষুভিত বিবেকের অব্যর্থ ভাষা পাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিধি ভাঙছিলেন তখন। তাঁদের হাতে ছাপাই ছবির আঙ্গিক তীব্র সংবেদন সঞ্চারের উপায় হয়ে উঠেছিল। এঁদের কাজে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের তাৎপর্য বোঝা যায়। কিন্তু আর কে কতটা এই সংকটকালের কলাবিধির ইঙ্গিত চেতনায় তুলে নিতে পেরেছিলেন বলা কঠিন। শুধু এইটুকু ভাবা যায়, নন্দলালের মতো সজাগ মনের শিল্পীর পক্ষে গ্রাফিক্সে সংবেদন সঞ্চারের এই শক্তিমন্ত কলাবিধি স্মরণে ধরে রাখাই স্বাভাবিক। কলাভবনে আঁদ্রে কার্পেলে কাঠের উপর এনগ্রেভিং শেখান, সেও ১৯২১-২২-এ। সুরেন্দ্রনাথ কর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত বিষয়টি খুব আগ্রহে চর্চা করলেন। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাজ মূল্যবান সম্পদ আমাদের গ্রাফিক্সে। এঁদের সঙ্গে নন্দলাল জড়িয়ে থেকেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে অল্পসল্প হাত লাগিয়েছেন।

'বিচিত্রা'য় থাকার সময় থেকে নন্দলালের গ্রাফিক্সের কাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৯১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যেই লিথোয়, এচিংয়ে, সিমেন্ট খোদাই ব্লকে, ড্রাইপয়েন্টে এবং রঙিন কাঠ খোদাইয়ে কিছু কাজ করেছিলেন। কিন্তু কলাভবনের পরিবেশেই গ্রাফিক্সে তাঁর সামর্থ্য উৎকর্ষের একটা নির্দিষ্ট মান ছুঁয়েছে।

নন্দলালের হাতের গ্রাফিক্সের হিশেব থেকে দেখা যাবে ড্রাইপয়েন্টে বেশ কিছু ভালো কাজ করেছেন। এ মাধ্যমটি যেন খুব দুরস্ত হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইপয়েন্টের কাজে একটা মজাও আছে। ধাতুর পাতের উপরে আঁচড় দিয়ে রেখা টানতে গেলেই দুপাশে ছিলা জমে। ছিলাগুলো পরিষ্কার করে ফেলে না দিয়ে যেমন আছে তেমনি

* "If the end of civilization foretold by Europe of the present day is to come true, it must be said that the artists are fighting heroically their last forlorn fight. But all death means resurrection and art in itself is immortal." *ibid* P. 168

রেখে দেওয়া এবং ছাপ নেবার সময়ে রেখার পাশে পাশে এই ছিলার ছাপে নানান্ মাত্রার রোঁয়া রোঁয়া ছুটকো রেখার কারিকুরিতে ছাপাইয়ে একট আকাঁড়া ভাব আনা হয়। গাছগাছালির শিকড়-বাকড়, জীবজন্তুর রোমশ গা বা মানুষের শরীরের খাঁচ, কোঁচকানো চামড়া— এসব খুব বাস্তবিক ধরা যায়। নন্দলালের হাতে ড্রাই-পয়েন্টের চমৎকার প্রয়োগে বেশ কিছু ভালো প্রকৃতিচিত্র হয়েছে। তালকুঞ্জ (১৯৩৭), 'পাইন বন' (১৯৩৮), 'কোপাই নদী' (১৯৪৯), নানা ধরনের গাছের স্টাডি। তেমনি হয়েছে সেই বিখ্যাত ছবি 'ছাগ-অবতার' (১৯৩৭) যেটি উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্বশীর সহোদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে," (বি-ভা-প ১৩৭৩, পৃ. ৪)। এবং এই আঙ্গিকেই অবিকল সিংহের অবয়বের রেখায় করেছেন 'অর্জুন' (১৯৩৬), উত্ত্যক্ত হয়ে এক ঝট্কায় ঘাড় বাঁকিয়ে ওঠার ভঙ্গি। আর উল্লেখ করতে হয় অতি পরিচ্ছন্ন একটি কাজ, যেটি ন্যাশানাল গালারির শতবার্ষিকী-প্রদর্শনী-ক্যাটালগে 'ম্যান ইন 'এ ল্যাণ্ডস্কেপ' (১৯৩৮) নামে ছাপা হয়েছিল। গাছের তলায় অবসাদে নুয়ে বসা একটি মানুষ।

এসব ছাপাই মাধ্যমের ছবি করার আগে অনেক সময়ে একই বিষয় স্কেচ করেছেন বা রঙে এঁকেছেন এমন দেখা যায়। আগে আঁকা ছবি পরে ছাপাই মাধ্যমে আনতে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কাঠ বা লিনোনিয়াম বা কোনো ধাতুর পাতে রেখা কাটায় একটা কারিগরির দিক থাকেই। কলম বা তুলির কাজের চাল বাধা পায়। কঠিন বস্তুমাত্রেই আঘাত প্রতিহত করে। শিল্পীর ধ্যানের রূপ কঠিন বস্তুর উপরে আরোপে তীব্র দ্বন্দ্বের পথে এগোতে হয়। বস্তুর আদত পুরো মারা যায় না। তার সঙ্গে সমঝোতায় আসতে প্রতিপদে টেন্‌শন। মূলত গ্রাফিক্‌সের লোক না হলেও নন্দলাল এই দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্যে একান্ত অভিনিবেশে নেমেছিলেন। জয়ী যেখানে হয়েছেন, বস্তু এবং করণকে যেখানে বশে আনতে পেরেছেন সেখানে তাঁর উৎকর্ষ আমাদের ছাপাই ছবিতে স্থায়ী কীর্তির মাননা পায়।

এম্‌নি একটি কাজ লিনোকাটে খান আবদুল গফ্‌ফর খান-এর অসাধারণ প্রতিকৃতি (১৯৩৬)। লিনোয় কাটার আগে এই প্রতিকৃতি স্কেচ করেছিলেন। স্কেচটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মহাদেব হরিভাই দেশাইকে লিখেছিলেন, "এ ডিলাইটফুল পেন্সিল স্কেচ।" (১৫ এপ্রিল ১৯৩৫ তারিখের চিঠি)। ছাপাইয়ে কালোর পটে সাদা রেখার ছন্দোময় তরঙ্গে খানসাহেবের সমুন্নত অনমনীয় অথচ সরল বিনত চরিত্র অব্যর্থভাবে ধরা রয়েছে। গান্ধীজীর ডাণ্ডি যাত্রার প্রতীকী প্রতিকৃতিটির চেয়ে এ কাজ অনেক সমৃদ্ধ। আর আশ্চর্য হল, এই অসামান্য শিল্পগুণের ভিত্তি আরবি হরফের কুশলী বিন্যাস। আরবি-ফারসি ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা আমাদের কলাসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অঙ্গ। এই শৈলীর চর্চায় অবনীন্দ্রনাথ খুব আগ্রহী ছিলেন,



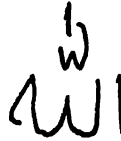
আবদুল গফ্‌ফর খান ১৯০৫ রেখাচিত্র



আবদুল গফ্‌ফর খান ১৯৩৬ লিনোকাট

কিন্তু নন্দলাল কখনও বিশেষ চর্চা করেন নি। আরবি লিপিকলায় শৈলীবৈচিত্র্য আছে। লিপিকলাবিদ্ কাতিবদের হাতে খাড়া রেখা প্রয়োগে কুফি, কোণাকুণি রেখার কাজে নস্‌খি, সুন্দর বাঁকা রেখায় তুঘরা— এইসব পরিশীলিত শৈলীর জন্ম হয়েছিল। কলম না তুলে একটানা লেখাঙ্কনে 'আল্লা', 'মহম্মদ'— এ রকম পবিত্র শব্দ বা কোরানের কোনো আস্ত বয়েত এঁকে তোলা হত।

নন্দলালের করা আবদুল গফ্‌ফর খানের এই লিনোকাট মাধ্যমের অনবদ্য প্রতিকৃতিটি ঠায় দেখতে দেখতে কিছু আরবি হরফ নজরে আসে। ভালো করে পরীক্ষায় ধরা যায় কলম না তুলে গোটা লেখাঙ্কন সম্পূর্ণ করার নিয়ম নন্দলাল মানেন নি। আরবি লিপিকলার প্রসিদ্ধ কোনো শৈলীর সঙ্গে তাই এ কাজ হুবহু মেলানো যাবে না। একে বরং আরবি লেখাঙ্কনের স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ বলা যায়। নন্দলাল আরবি-ফারসি ক্যালিগ্রাফির ঢেউ খেলানো রেখার ঋজুতা, নমনীয়তা ও নানা চিহ্নের খোঁচ নিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে এই ছন্দোময় প্রতিকৃতিটি সৃষ্টি করেছেন। রেখার তরঙ্গে বিভিন্ন আরবি-ফারসি হরফের আভাস নজরে এলেও মাত্র একটি শব্দ "আ ল্লা হ্" নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।



হ্ ল্লা আ

বিশ্বভারতীর ইসলাম-বিভাগের অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিন সুন্দর করে "আল্লাহ্" শব্দটি লিখে দিয়েছিলেন। বার বার অভ্যাস করে এই শব্দের হরফ— আলিফ, তশদিদ (ш : দ্বিত্বচিহ্ন) ও যবর (। : দীর্ঘস্বর চিহ্ন) যুক্ত লাম এবং হে— তিনটি নানা-ভাবে এই প্রতিকৃতি রচনায় ব্যবহার করেছিলেন। ১০৪ পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রটির গলার নিচে, বুকের বাঁ পাশে, ডান হাতের কব্জির উপরে, কুর্তার নিচের দিকে বাঁ পাশে "আল্লাহ্" শব্দের বিন্যাস স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। হরফগুলির রেখাভঙ্গি কোথাও বিবৃত কোথাও সংবৃত। এই কৌশলে কুর্তা এবং গায়ের কাপড়ের ভাঁজগুলিতে দেহভঙ্গির ছাঁদ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রয়োজনে নানা জায়গায় আরবি স্বরচিহ্ন প্রয়োগ করেছেন। ১০৫ পৃষ্ঠায় লিনো ছাপাইটিতে হরফগুলির ছাপ স্বভাবতই উল্টো হয়ে পড়েছে।

কোনো শৈলীগত বাধ্যতা না মেনেও আরবি লিপিকলা অনুসরণে এই বিশিষ্ট কাজটিতে নন্দলাল বাদশা খানের অনন্য ব্যক্তিত্ব রূপবদ্ধ করেছেন। নন্দলাল জাপানি লিপিকলা রীতিমতো অনুশীলন করেছিলেন। আরবি-ফারসি লিপিকলায় তাঁর আকর্ষণের এই একটিই দৃষ্টান্ত। কিন্তু রচনার নিপুণতায় এটিকে লিপিকলার আর-

এক ধারায় সার্থক কাজই বলতে হয়।*

গ্রাফিক্‌সে বিশেষ ব্যক্তি-চরিত্রের বিশিষ্টতা ঠিক ঠিক ধরে দেওয়ার দৃষ্টান্ত হিশেবে গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের এবং বাদশাখানের এই ছবির কথাই মনে আসে। কিন্তু আরও একটি নিপুণ কাজ আছে, লিথোয় করা বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি। (দ্র. ন্যাশনাল গ্যালারির ক্যাটালগ, পৃ. ১৮৭)। ক্ষীণদৃষ্টি বিনোদ-বিহারীর মাটিতে বসে ডেস্কে ঝুঁকে কাজে নিবিষ্ট চেহারা পেছন থেকে ধরেছেন।

আর, লিনোলিয়াম কেটে করা 'সহজ পাঠে'র ছবি (১৯৩১) আমাদের আধুনিক গ্রাফিক্‌সের বিশিষ্ট সম্পদ। এ সাধারণ ইলাস্‌ট্রেশন নয়। নন্দলাল আরও কিছু বইয়ের জন্য দৃষ্টান্ত-চিত্র করে দিয়েছিলেন যার মধ্যে স্মরণীয় সিস্টার নিবেদিতার 'মিথস্‌ অব দি হিন্দুজ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস্‌' (১৯১৩) এবং রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি অ্যান্ড ফ্রুট-গ্যাদারিং' (১৯১৮) বই। সেসব ছবি বিশেষ কোনো পরিকল্পনা মাফিক করা হয় নি। তাঁর সমকালীন ছবি থেকে যেন লাগসই কিছু কাজ বইয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রচনা এবং ছবি একই পরিকল্পনায় অঙ্গাঙ্গী নয়। কিন্তু 'সহজ পাঠ' বইয়ে লেখা এবং ছবি, একটিকে ছেড়ে অপরটি দাঁড়ায় না। লেখার বস্তুটুকু সর্বদা যে হুবহু ছবিতে আনা হয়েছে তা নয়। সর্বত্র হুবহু প্রতিচ্ছবি না থাকলেও লেখার বিবরণের অনুষঙ্গ সব ছবিতেই অত্যন্ত সাক্ষাৎ ভাবে জড়ানো। এইজন্যে লেখা এবং আঁকা অবিচ্ছেদ লাগে। শিল্পীর কাজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। শিশুর কাছে সদ্য চেনা বর্ণমালা আকার-মাত্র। তার চেনা জগতে দেখা রূপের সঙ্গে বর্ণমালার আকৃতির কিছু মিল পায় না। বর্ণমালাকে বাস্তব সংসারের চেনা রূপের সম্পৃক্ত করে দেবার জন্যেই ছবির দরকার হয়েছে। প্রথম ভাগে ছবির বিষয় সব বাঙালি শিশুর নিত্য দেখা, অতি চেনা জগৎ থেকে নেওয়া। এই অনুষঙ্গ বর্ণমালার "রূপ"-হীন আকারকে চেনা রূপের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্তর থেকে ধারণার স্তরে মেধাশক্তির বিকাশ ঘটানো শিক্ষার লক্ষ্য। বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যোগ করে তৈরি শব্দগুলি ধারণার প্রতীক হয়ে উঠবে। সেই শব্দ-প্রতীক গঠনের উপাদান বর্ণগুলিকে চেনা বস্তুর অনুষঙ্গে স্থায়ী করে দিতে হয়, যাতে ধারণার শরীরস্বরূপ শব্দগুলিও শিশুর অভিজ্ঞতার জগতে মিলে মিশে যায়। এইভাবে শব্দের এক নতুন ভুবনে মানুষের মানসিক জীবন-যাপন শুরু হয়। স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং ধারণা নিয়ে নন্দলাল 'সহজ পাঠে'র ছবিতে হাত দিয়েছিলেন। শিশুর চোখের সামনে সর্বদা থাকবে ছবিগুলি। ছবির অনুষঙ্গে হরফ মাথায় আসবে, হরফের অনুষঙ্গে আসবে

---

* ছবিটির হরফ বিন্যাস এবং শৈলীগত বিশিষ্টতা যত্ন করে পরীক্ষা করেছেন মৌলবি আবদুল কুদ্দুস, শ্রীগৌতম ভদ্র, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, মুহম্মদ কলিমুদ্দিন এবং লখনৌয়ের মৌলবি আফতাব আহ্‌মেদ।



ডাক পাড়ে ও ঔ

ভাত আনো বড়ো বৌ

ছবি। খুব কারুকাজের দরকার পড়ে নি। ছাপাইয়ের ছোটো টুকরো জমির মধ্যে সাদাকালোর দুই বিপরীত টানকে নির্দিষ্ট এলাকায় এলাকায় বেঁধেছেন। পরস্পরের সংঘাত বশে রেখে ঘনত্বময় রূপ ওই জমির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। ছোটো টুকরো জমির মধ্যে ধরা রূপগুলি ইচ্ছে করলে বহুগুণ বাড়িয়েও নেওয়া যায়। চরিত্র-রূপ এবং দৃশ্য— দুই রকম কাজেই এ বিশিষ্টতা রয়েছে। আশ্চর্য হল সাদার ব্যবহার। সাদা কখনও দূর পরিপ্রেক্ষিত দিচ্ছে (যেমন 'কখগঘ'-র নৌকা বাওয়া, 'ঞ'-র ছবিটি কিংবা চতুর্থ পাঠের ওপরের ছবি); কখনও কাছের পরিপ্রেক্ষিত, দেওয়াল (যেমন 'ও ঔ'-এর বড়ো বৌয়ের ভাত রাঁধার ছবি); আবার নশ্বর শরীরের ঘনত্ব ধরা হয়েছে সাদায় (যেমন 'যরলব'-র ছেলেটি)। 'ন'-এর ছবিতে সাদার ধাক্কা রাখাল ছেলে আর অনিচ্ছুক বাছুরটিকে যেন ফ্রেমের বাইরে এনে ফেলেছে। এমনি আর-একটি জোরালো কাজ 'চছজঝ'-র প্রকৃতি-দৃশ্যটি। আকাশ এবং জলে সাদাই সাদার বিবাদী। সাদায় সাদায় বিপ্রকর্ষ কত তীব্র — নিচের সাদাটা একবার ঢেকে, আবার খুলে ছবিটি দেখলে বোঝা যাবে।

সাদারই খেলায় জমজমাট এ ছবিগুলি। কালো তো স্থির পট। লিনোর সমতল জমিটাই কালোতে আসে। সেই জমির কাটা অংশে, সাদায়— শিল্পীর চৈতন্যের স্থিরতার এবং হাতের নিপুণতার মাত্রা ধরা যায়। অনুকণা খাস্তগীরের সাহায্য নিয়ে অতি সামান্য সময়ে শেষ করা এই ছাপাই ছবি শৈলীর অনন্যতায় আমাদের গ্রাফিক্‌সে এক স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে। এমন বাংলা মেজাজের ছবি, অথচ বটতলার ছাপাইয়ের তুলনায় কত পরিশীলিত। নতুন রুচির কাজ। 'সহজ পাঠে' রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতোই এ ছবি আলোর ছটায় ঝক্‌ঝকে।

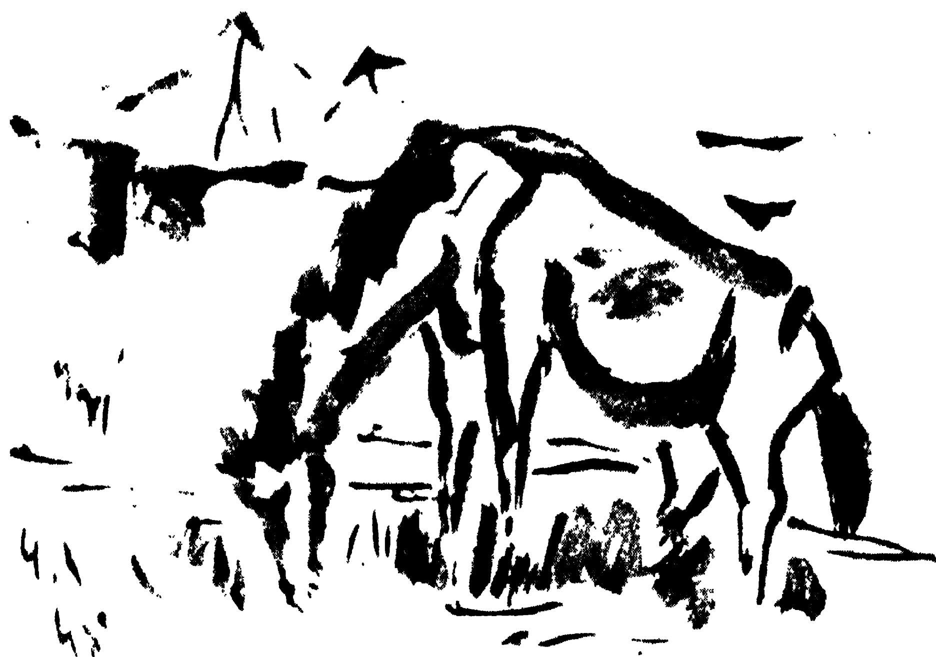
শিল্পকর্মে অভ্যন্তর-শৃঙ্খলার ভিত্তি নক্‌শা, এই বোধ নন্দলালের অনেক দিনের। এইজন্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধিতে নক্‌শা এবং মণ্ডনশিল্পের চর্চায় তিনি কিছুটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন। কারুশিল্পের বিকাশের প্রয়োজনেও নক্‌শার পাকা



হেলাফেলার কাজ



চ ছ জ ঝ দলে দলে
বোঝা নিয়ে হাটে চলে।



রাজগির পর্যায়   ১৯৪৫   কালিতুলির কাজ



রেগে বলে দস্যু ন
যাব না তো কক্ষনো

বুনিয়াদ প্রয়োজন হত। এর সঙ্গে যুক্ত করেন আলপনা চর্চা। অবনীন্দ্রনাথই প্রথম 'বাংলার ব্রত' বইয়ে আলপনায় বাংলার লৌকিক শিল্পরুচির আবহমান অভিব্যক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। বস্তুরূপ নির্ভর এবং প্রতীকধর্মী আলপনার নক্‌শায় বাংলার সংস্কৃতির মৌল স্তর, আদি মানসিকতা ধরা রয়েছে। নন্দলাল দেখিয়েছেন, বাংলার আলপনার সঙ্গে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর অলংকরণ রীতির যোগ আছে। মানুষের সুস্থ কামনা -বাসনার অভিব্যক্তি এই বিশিষ্ট শিল্পরূপটিকে নন্দলাল সুকুমারী দেবীর সহায়তায় একটি নতুন ধারায় বিকশিত করেন। আলপনা এবং অলংকরণের নতুন নক্‌শার জন্য প্রকৃতি থেকেই উপাদান নিতেন। সেই উপাদান বাঁধা পড়ত রেখাবিন্যাসের নতুন নতুন পদ্ধতিতে। প্রকৃতি থেকে রেখার প্রাণময় গতিভঙ্গি তুলে আনতেন নতুন নক্‌শায়। এইভাবে বাংলার প্রাচীন আলপনাকে তিনি সৃজনশীল আঙ্গিকে পরিণত করেন। মণ্ডনশিল্পে নতুন রুচির মান আনেন, যার ফলে কারুশিল্পের উৎপাদনেও নান্দনিক আবেদন ফুটে উঠত।

এইখানেই তাঁর শেষ বেলাকার হেলাফেলার কাজের কথা বলি। অবনীন্দ্রনাথ বুড়ো বয়সে কুটুম-কাটাম গড়তেন। কুড়িয়ে পাওয়া তুচ্ছ-সব জিনিশের মূল রূপের ছাঁদটি অবিকল রেখে তৈরি ভাস্কর্য। নন্দলালের বুড়ো বয়সের খেলা ছিল ফেলে দেওয়া কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবজন্তু কি মানুষের আকার দাঁড় করানো। তারপরে সেটি অন্য রঙের কাগজে সেঁটে দু-চারটি রেখা দিয়ে একটি সম্পূর্ণ রূপ দিতেন। একে কোলাজ বলাই সঙ্গত। অনেক এ রকম কোলাজ করেছিলেন যার মধ্যে চোখে ধরে যাবার মতো কাজ কম নয়।

শেষ বিচারের ভার মহাকালের হাতে। স্রষ্টা মানুষের কোন্ সুকৃতি স্থায়ী মূল্য পাবে নিশ্চিত ভাবে কোনো সমালোচনায় কখনও বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও শিল্পী বিশেষের নানান্ রকমের কাজ বার বার দেখতে দেখতে খানিকটা ধরা যায়, কোথায় সেই সৃষ্টি-বিভোর ব্যক্তিত্ব নিজের ক্ষমতার চূড়া স্পর্শ করছে। নন্দলাল্ বসুর ছবির জগতের মধ্যে যেতে যেতে কেবলই মনে হয়, তাঁর প্রতিভার সামর্থ্য প্রত্যয়ে-নিশ্চয়তায় অব্যর্থ হয়ে ওঠে, অবলীলায় নিজের ক্ষমতার চূড়ায় উঠে যায়, পূর্ণ চরিতার্থতার স্বাদ পায়— প্রকৃতিচিত্রে। মনে হয় প্রকৃতিচিত্রে তাঁর মার নেই। বৌদ্ধ-শৈব-পৌরাণিক, আর-সব বিষয় মহিমার ছবি, কিংবা জীবন থেকে তুলে আনা অতি বিচিত্র সব বিষয়ের ছবি— এসব কীর্তির স্থায়ী মূল্য নিয়ে একমত হওয়া সহজ নয়, হওয়া যাবেও না। কিন্তু প্রকৃতিচিত্রে নন্দলাল সংশয়ের আড়াল ভেঙে মুহূর্তে দর্শককে নিজের মুঠিতে নিয়ে নেবার ক্ষমতা ধরেন।

"অবলীলায় নিজের ক্ষমতার চূড়ায় উঠে যায়" বলাটা অবশ্য ঠিক হল না। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়ায় তিনি কী বিপুল শক্তি ও সময় দিয়েছেন তার নজিরের পরিমাণ বিস্ময়কর। কোনো দৃশ্য বা বস্তুর ঠিক ছন্দটি ধরার জন্য নাছোড় হয়ে লেগে থাকতেন। বলেছেন, একটি গাছ কি ফুলের সত্য পরিচয় পেতে হলে, তার 'রিয়লিটি' ও 'ক্যারেক্টার' উপলব্ধি করতে হলে, সকাল-দুপুর-রাতের আলোয় ছায়ায় বার বার দেখা চাই। ধরা চাই একটা প্রাণ-ছন্দ কীভাবে নির্দিষ্ট রূপের বাঁধনে পূর্ণতা পেয়েছে। চীন-জাপানের ছবি এবং শিল্পনীতি বিশ্লেষণ করে দেখার সুযোগে নন্দলালের এই প্রকৃতি-চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। চীন-জাপানের শিল্পীদের অসাধারণ রেখা নৈপুণ্য, ভঙ্গিল গতিময় ক্যালিগ্রাফিক রেখায় পারদর্শিতা নিবিষ্ট অনুশীলনে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। প্রকৃতির রূপময়তায় প্রাণশক্তির গতিশীল প্রকাশ রূপবদ্ধ করায় তাঁর এই রেখা-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে ছোটো বড়ো অসংখ্য কাজে। নন্দলালের প্রকৃতি অনুশীলনের পদ্ধতি পাশ্চাত্য নেচার স্টাডি থেকে আলাদা। সরাসরি প্রকৃতির সামনে বসে আঁকার নীতি তিনি মানতেন না। বলতেন, "নেচারকে সামনে রেখে যে ছবি হয় তা যেন মুখে চিবনো জিনিস।" (শি-শি-ন পৃ. ৯)। যা দেখলেন, ছোটো ছোটো করে সামান্য রেখায় টুকে রাখতেন। সেই নোট থেকে পরে পুরো স্কেচ বা ছবি করতেন। শান্তিনিকেতনের জীবনে এইভাবে প্রকৃতি অনুশীলন তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতীয় ঐতিহ্যে নিছক প্রকৃতি কখনও চিত্রবিষয় হয় নি। পরিপ্রেক্ষিত রচনায় প্রকৃতির ব্যবহার মুঘল-রাজপুত ছবিতে চলে এসেছিল। কিন্তু তার থেকে অনুসরণ করবার মতো নির্দিষ্ট আদর্শ পাওয়া যায় না। আমাদের আধুনিক ছবিতেই বিষয়

হিশাবে প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে বোধোদয়ের শুরু, বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথে। অবনীন্দ্রনাথের হাতে নিসর্গচিত্রের বিলেতি এবং জাপানি আদর্শ মিলে মিশে গিয়েছিল। নন্দলালের সামনে এই একটি সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত ছিল এবং নন্দলাল বিশেষ করে চীন -জাপানের কলারীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন। চীনের ঐতিহ্যে নিসর্গচিত্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এমন স্তরে গেছে যেখানে দৃশ্যতা ছাপিয়ে ছবিতে রূপকার্থের দ্যোতনা আনাই রীতি। নন্দলালের মনের যেমন গড়ন তাতে এই শুদ্ধতার দিকে টান বোধ করা স্বাভাবিক। অবশ্য রূপক তৈরিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ ঘের থেকে নিজেকে বাইরের বড়ো জগতে মুক্ত করার উপায় প্রকৃতির সহযোগ— এ শিক্ষা তিনি চীনা ঐতিহ্য থেকে আকর্ষণ করে নিতে পেরেছিলন। বিশেষত, এ শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের -গানের নিসর্গ চেতনায় কোনো বিরোধ না থাকায় নন্দলাল কোনো দ্বন্দ্ব-সংশয়ে পড়েন নি। নিজের প্রকৃতি চেতনায় রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব নন্দলাল মানতেন। রবীন্দ্রনাথের লালনের সঙ্গে চীন ও জাপান— প্রাচ্যের দুই বড়ো শিল্প -ঐতিহ্যের পরিপোষণে বিশ্বপ্রকৃতি নন্দলালের কাছে অস্তিত্বের আশ্রয়, পুষ্টি -রসের উৎস এবং চেতনার মলিনতা মোচনের উপায় রূপে নিছক একটা ব্যবহারযোগ্য চিত্রবিষয়ের চেয়ে অনেক বড়ো মর্যাদা পেয়েছিল। তিনি ভাবতে পারতেন, আলোয় এবং অন্ধকারে এ বিশ্বপ্রকৃতি রিয়লিটি বা সত্তার শত বিচিত্র যে রূপ দেখায়, কোনো গূঢ় যোগে নিজের সত্তা তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তাঁর আস্তিক স্বভাব এই চেতনায় অটুট প্রতিষ্ঠাভূমি পেয়েছিল।

একে কি বলব আধ্যাত্মিকতা? ঠিক তা নয়। এমন একটা গভীর একাত্মতার বোধ না এলে শিল্পে কোনো বড়ো কাজ করাই যায় না। বিশ্ব-সাথে যোগেই শিল্পীর মুক্তি। নিজেকে নিজের বাইরে এনে যে বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বস্তু তাঁর আত্মভূত হয়। চৈতন্যস্পৃষ্ট হয়। অনন্য তাৎপর্য পায়। মূল্যগৌরবে সে বস্তু মহীয়ান হয়ে ওঠে শিল্পীর কাছে। একটি ঘাস কি গাছ কিংবা সমুদ্রের ঢেউয়ের বা পাহাড়ের সমুচ্চ চূড়া এই মূল্যগৌরবে সমান মর্যাদা পায়। এবং শিল্পী উপলব্ধির এই স্তরে ভাবতে পারেন একটি গাছ আর শিব বা বুদ্ধয় কোনো তফাত নেই। বলতে পারেন, "গাছের মধ্যেই শিব আঁকব", "সবই বুদ্ধ"।

বিষয় হিশাবে আমাদের আধুনিক ছবিতে প্রকৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে'। নন্দলালের কাজ দেখতে মনে রাখতে হয়, তাঁর দীর্ঘ শিল্পী জীবনের পর্বে পর্বে অন্য শিল্পীদের হাতেও প্রকৃতিচিত্রের উজ্জ্বল সম্ভার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। গোড়ায় ছিল অবনীন্দ্রনাথের কাজ, মধ্যকালে গগনেন্দ্রনাথ -রবীন্দ্রনাথের, এবং উত্তরকালে সমসাময়িকদের মধ্যে স্মরণীয় রামকিংকর -বিনোদবিহারী -গোপাল ঘোষ। সমকালীন এই শিল্পীদের প্রকৃতিচিত্রের তুলনায় উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনার কথা উঠছে না। প্রত্যেকে

কাজ করেছেন নিজের স্বভাবে, অনন্য শৈলীতে। তুলনায় তবু এই ধারণা দাঁড়ায়, অভিনিবেশে এবং কাজের পরিমাণে প্রকৃতিচিত্রে নন্দলাল আর-সকলকে ছাড়িয়ে যান। তাঁর পরে আছেন গোপাল ঘোষ। আরও বড়ো কথা, নন্দলালের প্রকৃতিচিত্রেও একটা ধারাবাহিক বিকাশ দেখতে পাই। অক্ষুণ্ণ আগ্রহে বিশ্বের প্রকাশরূপের তাৎপর্য তিনি বুঝতে চেয়েছেন। এই বোঝার পদ্ধতি, চিন্তা করার ধরন থেকেই প্রকৃতির ছবিতেও শিল্পীচরিত্র ফোটে, তিনি মানতেন। (শি-শি-ন, ৫৬)।

পশ্চিমি ল্যান্ডস্কেপ বিশ্লেষণে গোটা ক্যানভাস খাড়াই এবং আনুভূমিক রেখায় ভাগ করে কম্পোজিশনের ছকটি বিশদ করে দেখানো যায়। ওদেশে রিয়লিজমকে ভেঙে যারা ভিন্ন আঙ্গিক এনেছেন তাঁরাও কম্পোজিশনের এই জ্যামিতিক ভিত মেনে কাজ করেছেন। নন্দলালের প্রকৃতিচিত্রের বিশ্লেষণে ঠিক এই জ্যামিতিক বাস্তব ভিত দেখানো যায় না। তিনি গোটা জমির মধ্যে বস্তুর বিন্যাসে ভারসাম্য আনেন পরস্পরের ছন্দোগত সম্পর্কের আশ্রয়ে। কিছুই অবিচল নয়, স্থাণু নয়। একটা পাথর যখন আঁকেন, তার প্রান্ত রেখার গতিতে, রঙের উদ্দীপনায় সে পাথরও সত্তা পায়। এবং তারই পাশের গাছগাছালি স্থিরতা এবং গতির টানাপোড়েনে ছন্দিত প্রতিসাম্য রচনা করে। বিশেষভাবে লক্ষ করে দেখতে হয় সেইসব ছবি, যেখানে জমির অনেকখানি অলাঞ্ছিত, ফাঁকা রেখে দিয়েছেন। শূন্যতা এবং বস্তুর আয়তনের মধ্যেও একটা সম্পর্ক তৈরি করে দিচ্ছেন। ভারসাম্য অটুট রাখতে পারছেন। পরীক্ষার উৎসাহ তাঁর মধ্যে অফুরান। তাই জলরঙে, টেম্পেরায় অতি ঐশ্বর্যময় কাজ করার পাশে পাশে সাদাকালোয় কঠিনতর কাজের পরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। এবং প্রকৃতিচিত্রে তাঁর নিজস্ব উত্তরণ সাদাকালো কাজেই চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছেছিল।

টেম্পেরাতে হিমালয় দৃশ্যমালায় নন্দলালের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় আছে। রঙ সর্বদা একটু নিচু পর্দায় রেখেছেন। কিন্তু তারই মধ্যে আলোর দ্যুতি জমজমাট। বিশেষ করে বড়ো মাপের ছবিতে, যেমন 'অলকানন্দায়' ('মায়াবতীর পথে'), রঙের ঐশ্বর্য অসামান্য। কখনও কখনও একই রঙের বিভিন্ন পর্দার হেরফেরে দর্শকের দৃষ্টিবিন্দু নিয়ন্ত্রণ করেছেন। দৃশ্যগুলি বার বার দেখায় নতুন তাৎপর্য উন্মোচিত হয়। মর্মের মধ্যে চলে আসে। তাঁর ছবিতে প্রকৃতিকে নির্বিকার মনে হয় না, কোথাও আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে যে যোগ রয়েছে এই প্রকৃতির— ছবিগুলির সামনে দাঁড়ালে এই অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে উঠতে হয়। হাজারিবাগের, তাগদার অরণ্য এঁকেছেন। সে অরণ্যও মানবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়ানো। নন্দলাল প্রকৃতিকে কখনও ভয়ংকর, উদাসীন ভাবেন না। এমন কী সমুদ্রও পরিপূর্ণ উত্তালতা সত্ত্বেও ভয় জাগায় না। বিশেষ করে গোপালপুর পর্যায়ের অত্যন্ত জোরালো সাদাকালো কাজে সমুদ্রকে নন্দলাল মানুষের জীবনযাপনের সীমার মধ্যে এনে দিয়েছেন। নুলিয়া চরিত্ররূপগুলির



রাজগির পর্যায়   ১৯৪৫   কালিতুলির কাজ



গোধূলি ১৯৪৩ টেম্পেরা

স্থাপনায় সমুদ্র মানবিক অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সত্তা পেয়েছে। এই মানবিক তন্ময়তায় নন্দলালের প্রকৃতিচিত্র অতি বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা পাবে।

ছবি দেখার মুহূর্তগুলির স্মৃতি ফিরে ফিরে মনে আসে। যেমন 'গোধূলি' (১৯৪৩) ছবিটি। সে তো নিতান্ত উদাসীন দর্শককেও কাছে টেনে নেয়। রাঙা ধুলোয়, পাটে বসা সূর্যের রাঙা আলোয় চেনা বাংলার এই দৃশ্য কেমন বিহ্বল করে তোলে। আলোর তন্তু যেন গাছপালা, গোরুগুলি এবং আমাদেরও জড়িয়ে জড়িয়ে আবেশ বিস্তার করতে থাকে। টেম্পেরার প্রয়োগ কত নিপুণ হতে পারে 'গোধূলি' তার দৃষ্টান্ত। কিংবা একবারও 'জ্বলন্ত পাইন' (১৯৪২) যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষে এ দৃশ্যের সরল বিন্যাসে সমূহ এক ট্র্যাজিডির রূপায়ণ বিস্মরণ অসম্ভব। প্রসঙ্গটি অনেকেরই জানা। কে এক পথচারী পাইন গাছটিতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে দিয়ে চলে গিয়েছিল। গাছটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ভেতরে পুড়ে চলেছে। "এই হল আমাদের জীবন। ভিতর থেকে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি তবু দাঁড়িয়ে আছি।" (বিনোদবিহারী ধৃত উক্তি। 'চিত্রকথা' পৃ. ২৭৫)। এ কথার সূত্র ধরে রূপকত্ব খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। তেমন রূপক সব ছবিতেই ইচ্ছে করলে আরোপ করা যায়। মন্তব্যটি বরং প্রমাণ করে, প্রকৃতিকে নন্দলাল "চরিত্র"-সম্পন্ন করে তোলেন। এই চরিত্রই শিল্পীর মনন -কল্পনার সৃজন। দৃশ্যরূপের এই চরিত্র আরও প্রবল আঙ্গিকে নন্দলাল ১৯৩১ থেকে রূপ দিয়ে এসেছেন। মোটা টানের সেই কাজগুলির কথা আগে বলেছি— যাকে শিল্পী নিজে বলতেন ছোপের কাজ।

ক্রমে তিনি ছোপের কাজে শুধু কালো কালি আশ্রয় করেছিলেন। সত্যি সত্যি অসংখ্য কাজ করেছেন কালি -তুলিতে। আমাদের আধুনিক চিত্রকলায় এভাবে তাঁর হাতে একটি নতুন শৈলী যুক্ত হয়েছে। সাদা এবং কালো— বর্ণমালার দুই বিপরীত চরম সীমা। সাদায় সব বর্ণ মিশে আছে, কালো মানে সম্পূর্ণ নেতি। এই দুই সীমার মধ্যে জাগে মূল রং এবং মিশ্র রঙের নানান্ পর্দা। রঙের সাহায্য না নিয়ে দুই চরমের খেলায় রূপসিদ্ধি খুব কঠিন কাজ। নন্দলাল সাদাকালোয় চৌচাপটে কাজ করেছেন, যার বহু স্মরণীয় দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্যতর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত গোপালপুরের সী -স্কেপ, সমুদ্রদৃশ্য। বিশেষভাবে তাঁর কাজের এই এলাকাটিতে চীন-জাপানের প্রেরণা ফলবান্ হয়েছিল।

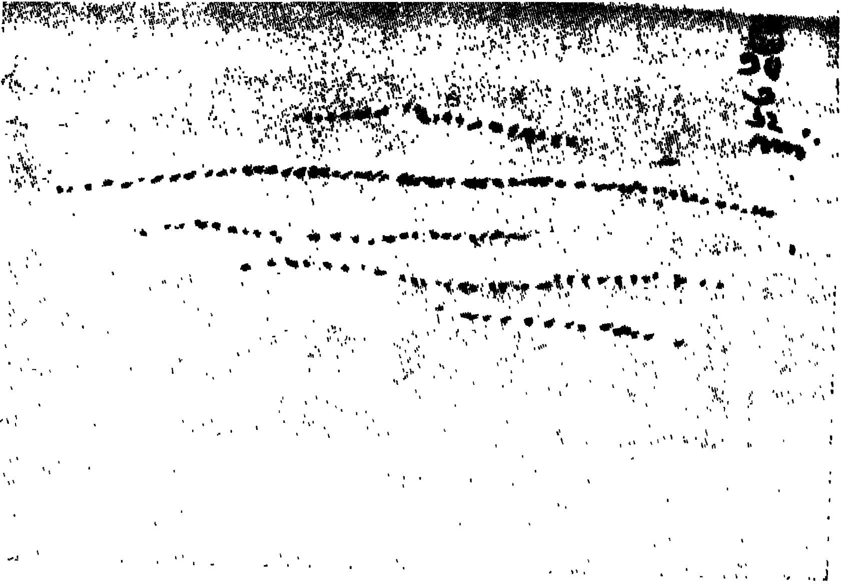
"আমার এ গানে ছেড়েছে তার সকল অলংকার"— রূপময় এ ভুবনের পথে দীর্ঘ যাত্রার শেষে বোধহয় সব শিল্পীই নিজের ভিতরে এই গুঞ্জন শুনতে পান। সাজের অহংকারে কী বা প্রয়োজন আর। সব সাজ মোচন করো, শুদ্ধতম উপলব্ধির সামনে লক্ষ্য অবিচলিত রাখো, একটি রেখা বা বিন্দুই হয়ে উঠতে পারে সেই উপলব্ধির ভাষা। রঙের জমক ছেড়ে সাদাকালোর ছোপছাপ ধরেছিলেন। তাও ছেড়ে যেতে



চাইছেন যেন। তাই এমন নিরাভরণ, শুধু দু-চারটি রেখার প্রতিসাম্যে রূপটি নির্দিষ্ট করে ছেড়ে দিয়েছেন। অবান্তর বর্জনই যদি আধুনিক শিল্পের মূল লক্ষণ হয় তবে এই ছবি তার একটা চূড়ান্ত সীমা ছোঁয়া কাজ। (৩. ২. ৬২ তারিখের ছবি)। তারপরে আরও এক ধাপ। রেখাও ছেড়ে দেন। রেখার শৃঙ্খলা মানার দায় ছেড়ে বিন্দুর বিন্যাসে যেন দৃশ্যের সারাৎসার ধরে দিয়েছেন (৩০. ৩. ৬২ তারিখের ছবি)। শিল্পীর নিজের ভাষায়, "ছবি যেন ক্রমশ অক্ষরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।" (শি-শি-ন, পৃ. ৬)। এর পরের ধাপে আর ছবি হয় না। অরূপ।

১৯

স্থিতি ভেঙে দেওয়া সংঘাতের মধ্যে নন্দলাল আত্মপ্রকাশের শিল্পভাষা সন্ধান শুরু করেছিলেন। সমাহিত স্থৈর্য অম্বিষ্ট ছিল, কিন্তু তার জীবনকালের ভারতীয় বাস্তবতায় সে স্থৈর্যের কোনো বাস্তব ভিত ছিল না। ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের মহিমাময় প্রশান্তিতে মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত চরিতার্থতার পথ তৈরি করতে হয়েছে বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত সমকালীন বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়ার দায় মেনে। কোনো অভিঘাত থেকে সরে দাঁড়ান নি, আড়াল খোঁজেন নি। গুরুর পাশে বসে শিল্পের স্বদেশ সম্পর্কে এক পবিত্র দায়বোধ অঙ্গীকার করেছিলেন। কোনো সংকটেই সে দায় থেকে ত্রাণ পাবার কথা মনেও আনেন নি। বরং ক্রমে কঠিনতর দায়িত্বের ভার নিয়ে শক্তি পরীক্ষায় এগিয়ে গিয়েছেন। আধুনিক শিল্পের ভারতীয় চরিত্র কী দাঁড়াবে, এই ভাবনা তাঁকে



জীবন ভরে ভাবতে হয়েছে। পশ্চিমি আধুনিকতার ভাসন্ত তরীতে কোনোক্রমে উঠে বসা তাঁর কাছে সম্ভবপর মনে হত না। শিল্পে কোনো পুনরুজ্জীবনও যে বাস্তব নয়, ক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন। নিজের অবস্থান ঠিক ঠিক পাওয়া নিয়ে তাই তাঁর এত পরীক্ষা, এত বোঝাপড়া। অভিজ্ঞতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে নীতিগত অবস্থান সম্পর্কে তাঁকে নিরন্তর বিচার করতে হয়েছে। মনে কোনো অবিচল সিদ্ধান্তের বেড়ি পরান নি। কলাভবন পরিচালনায় কখনও কখনও দ্বিধা-সংশয় যদি প্রমাণ হয়ও, নিজের শিল্পকাজে কোথাও কোনো আবদ্ধতা প্রশ্রয় যে পায় নি, সে সাবুদের কমি নেই কোনো। এই আলোচনার মধ্যে তার অনেকটা আমরা দেখেও এলাম।

নন্দলালের মুক্ত শিল্পমতির কথায় একটি তুলনা মনে ওঠে। য়ুরোপে যাবার সুযোগে পশ্চিমি শিল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে অভিজ্ঞ শিল্পী অসিতকুমার হালদার বলেছিলেন, ওদের আধুনিক ছবি সব তমোগুণে ভরা, অদ্ভুত-বীভৎস-ভয়ানক রসের আধার। ও শিল্পে আঙ্গিকের শিক্ষা বা শৃঙ্খলারও নাকি দরকার হয় না। এর পাশে বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর স্মৃতিধৃত নন্দলালের কথা শুনি,

> ঐ শিল্পীর [পিকাসোর] কিছু ছবিতে বিষয় নেই। রূপ আছে তাই ভাব ও রস আছে। ঐ ছবি রস দিয়েই বোঝা যায়, বিষয় দিয়ে নয়। ঐ শিল্পসৃষ্টি খারাপ নয়, একটা নতুন জিনিস।
>
> ...
>
> ঠিক যেটা শিল্প সেটা ব্যক্তিগত।. কিন্তু তা যেমন একদিকে individual হচ্ছে আর-একদিকে universal হচ্ছে। Science universal.

টেকনিক্‌ও science, টেক্‌নিক হল করবার কায়দা। আর্টে যেটা টেক্‌নিক সেটা universal.—(শি-শি-ন, পৃ. ৭০, ৭২)।

আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় এই কথাটা এখন স্বতঃসিদ্ধ, টেক্‌নিকের কোনো জাত নেই। শিল্পে আধুনিক বিকাশের মাঝখানে থেকে এ হল নন্দলালের স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি। ধুলোমাটির মানুষ নন্দলালে এই আধুনিক উপলব্ধি এল। অসিত-কুমার হালদারদের চেতনায় এল না!

বুদ্ধিমার্গ অনুসরণ করার প্রয়োজন এবং নৈর্ব্যক্তিকতার ভূমিকা শিল্পে কতটা— এ নিয়ে নন্দলালের মনে প্রশ্ন এবং সংশয় ছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে ছোটোখাটো মতভেদের কারণও এই সংশয়বোধ। কবিতার রীতিনীতিতে আধুনিকদের পরীক্ষার মূল্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনেও ঠিক একই ধরনের সংশয় ছিল। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ নয়, কবি রবীন্দ্রনাথের সেই মানসিকতার তুলনায় নন্দলালের দ্বিধার স্বরূপ বোঝা যায়। আবার রবীন্দ্রনাথ যেমন কবিতায় আধুনিকদের দাবি পূর্ণত মানতে না পারা সত্ত্বেও নিজেকে অবিরত বদলেছেন দৃষ্টি এবং বিশ্বাসের মূল লক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও চিত্রকল্পের, প্রতীকের সংহতিতে তাঁর কবিতায় আধুনিক তাৎপর্য এসে গেছে, তেমনি নন্দলালের কাজেও রয়েছে উত্তরণের প্রগতি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা কবিতার আধুনিকতার বিচার অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনি নন্দলালের পর্বে-পর্বান্তরে বিস্তৃত কাজের সমীক্ষা এড়িয়ে শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার ধারণা দাঁড় করানো যায় না।

আন্তর্জাতিক আধুনিকতার বড়ো রাস্তায় উত্তরণেই শিল্পের মুক্তি, এ নিয়ে তো কিছু বিবাদ-বিতর্ক নেই। কিন্তু য়ুরোপীয় আধুনিকতাকেই আন্তর্জাতিক আধুনিকতা বলা আজ আর সম্ভব নয়। প্রাচ্য দেশগুলির আধুনিকতার চরিত্র আলাদা এই চেতনা ক্রমে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। বিশেষত দৃশ্য-শিল্পে দেশগুলি, মহাদেশগুলি ক্রমে পরস্পরের অনেক কাছে চলে এসেছে। জাপানের কলাবিধির প্রভাব য়ুরোপীয় শিল্পে আধুনিকতার নতুন হাওয়া তুলেছিল। ভাস্কর্যে আধুনিকতার জনক রদ্যাঁ ভারতীয় নটরাজ মূর্তির "বীর্যবান উদাত্ত মাধুর্যে" অভিভূত বোধ করতেন। আফ্রিকার ভাস্কর্যে য়ুরোপীয় শিল্পীরা সত্তাসংকটের অধীরতা এবং বিপন্নতা প্রকাশের প্রবল ভাষা পেলেন। এসব অভিজ্ঞতায় মানুষের কলাসংস্কৃতিতে আধুনিকতার বড়ো রাস্তার দিশা শুধু য়ুরোপের দৃষ্টিবিন্দু থেকে নয়, এশিয়া-আফ্রিকার দৃষ্টিবিন্দু থেকেও খোঁজার দায় অর্সায়। পশ্চিমের আলোয় প্রাচ্যকে বিচারের অভ্যাসে অনেক গুরুতর বিবেচ্য আমাদের নজরেই আসে নি, ভুল বুঝেছি, ভুল ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের জাতিসত্তার বিন্যাস-বিবর্তনটাও ঠিক ঠিক বুঝি নি। খাস ইতিহাস-বিদ্যার এলাকায় ঘাড় থেকে তুলনার ভূত নামানো প্রধান কাজ বলে মানা হচ্ছে এখন, কিন্তু শিল্পের নিরিখ বিচারে

এখনও ঘোর কাটে নি। য়ুরোপীয় প্রতিমাণের বদলে নতুন দৃষ্টিবিন্দু পাবার জন্য ইয়োকোইয়ামা তাইকান বা নন্দলাল বসুর মতো প্রবল প্রাচ্য ব্যক্তিত্বের শিল্পীর ভুবনে ফিরে আসতে হয়। তাঁদের ধ্যান-সংকল্প গঠনের বিঘ্নবিপত্তির, উত্তরণের তথ্য জানতে হয়। ভেবে দেখতে হয়, জাপানি আধুনিকতার প্রতিনিধি শিমোমুরা কান্‌জান্‌ বা চীনের শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিল্পী জ্যু বিহঙ (জু পেয়ঁ) কেন আঙ্গিকের শিক্ষায় য়ুরোপ-সিদ্ধ হয়েও দেশের জমি ছেড়ে যান না। কেন দেশি ধারার আধুনিক উত্তরণের জন্য আজীবন মেহনত করেন। কলাসংস্কৃতির ইতিহাসে আন্তর্জাতিক আধুনিকতার অধ্যায়টি শুধুই য়ুরোপীয় সৃষ্টির তথ্যে সম্পূর্ণ হতে পারে না। এশিয়ার আফ্রিকার আধুনিক সৃষ্টির তথ্যও হিশাবে আনা ইতিহাসের দায়। নতুন এই ইতিহাস বোধের চর্চায় ভারতীয় আধুনিক শিল্পী নন্দলাল বসুর হাজার দশেক কাজের সঞ্চয় এক মহামূল্য আকর।



৩

জাপানের প্রেরণা

প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক সুপ্রাচীন। বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এশিয়ান মোড বা এশীয় পন্থ্-এর যে বিশিষ্টতা, তার বিকাশ ঘটেছিল ইতিহাসের পর্বে পর্বে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে। কিন্তু ইতিহাসের আধুনিক পর্বে আবহমান অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। একটির পর একটি দেশ পশ্চিমি সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হল। বিভিন্ন য়ুরোপীয় শক্তির স্বার্থের পাঁচিলে ঘেরা এশীয় দেশগুলির বৈষয়িক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ধারার স্বাভাবিক বিকাশও রুদ্ধ হয়ে গেল। এই দুর্যোগ থেকে বাঁচবার জন্য জাপান বাইরের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল। এতে পরাধীনতা এড়াতে পারল, কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক থাকল না। এশিয়ার ইতিহাসে নামল দীর্ঘ অন্ধকার।

সেই "কালরাত্রির অন্ধকার" পেরিয়ে প্রাচীন আত্মীয়তার সম্পর্ক নতুন করে উপলব্ধির আগ্রহ জাগল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। জাপান স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা ঘোচায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৮৫৩/৫৪-য় শিমোদা এবং হাকোদাতে বন্দর দুটি খুলে দেয়। আমেরিকা এবং ক্রমে য়ুরোপের অন্য-সব দেশের সঙ্গে তার বৈষয়িক লেনাদেনা বাড়তে থাকে। এতকালের বন্ধ সমাজে বাইরের হাওয়া খেলল প্রবলভাবে। দ্রুত জাপানি সমাজের ধ্যানধারণায় রূপান্তর দেখা দিল। সে রূপান্তর সংহত এবং একমুখী হল মেইজি শাসনের সূচনায়, ১৮৬৮-তে। য়ুরোপের তুলনায় প্রাচ্যের দেশগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে যে ঘাটতি, জাপান সেই ফাঁক পেরিয়ে গেল মাত্র ৫০/৬০ বছরের মধ্যে। এমন রুদ্ধশ্বাস দৌড়ের প্রভাবে তার সমাজের ভিত পর্যন্ত নাড়া খেল। সমৃদ্ধির নতুন যুগে দেশের কর্তৃত্ব যে নব্য ধনিক-শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল, তাঁদের য়ুরোপমুখী মানসিকতাই প্রতিফলিত হত শিক্ষা-সংস্কৃতির সরকারি নীতিতে। ফলে সমাজের সমস্ত স্তরে পশ্চিমি প্রগতির খর স্রোত বয়েছিল। এর পরিণাম কী দাঁড়াবে, আবহমান ঐতিহ্যের জমি থেকে কি উন্মূল করে



কাকুজো ওকাকুরা তেংশিন্
শিল্পী : শিমোমুরা কান্‌জান্

দেবে এই প্রগতি, জাপানি জাতি কি আত্মপরিচয় হারাবে— সমাজের মধ্যে এসব প্রশ্নও উঠছিল। কলাসংস্কৃতি জগতের কিছু মানুষ ঐতিহ্যমুখী আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক জুড়ে বিচার-বিতর্ক, মত-সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে ঐতিহ্যমুখী আন্দোলন সংহত হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে নেতা ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষী কাকুজো ওকাকুরা তেন্‌শিন (১৮৬৩-১৯১৩)। তাঁর প্রভাবে অন্তত শিল্পকলার এলাকায় পাশ্চাত্যরীতি অনুকরণের প্রবণতা বাধা পায়, জাপানি শিল্পীসমাজ ঐতিহ্য-নিষ্ঠ আত্মস্থতা ফিরে পায়।

জাপানে শিল্পকলার চর্চা ছিল বংশানুক্রমিক। শিল্পীর ঘরের ছেলে বাপ-ঠাকুর্দার ধারায় কাজ শিখে শিল্পী হতেন। আধুনিক পর্বে এই প্রথা ভেঙে গেল। তোকিয়োয় প্রথম আর্ট স্কুল খোলা হয়েছিল ১৮৭৬-এ। ইতালির শিল্পী আন্তোনিও ফোন্‌তানেসি (১৮১৮-৮২) এখানে তেলরঙের কাজ শেখাতেন। বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, যে কেউ ছাত্র হয়ে আসতে পারত। ছবিতে যেমন, তেমনি ভাস্কর্যের কাজেও পশ্চিমি রীতির অনুশীলন হত। পুরানো প্রথায় কাঠের কাজের বদলে কংক্রিট ও পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। শেখাবার পদ্ধতিতে, উপকরণ ব্যবহারে রীতিমতো য়ুরোপীয় আঙ্গিকে দক্ষ করে তোলার আয়োজন গড়ে ওঠে। ছাত্রদের সামনে য়ুরোপীয় মাস্টার পেইন্‌টারদের ছবি ধরা হত আদর্শ হিশেবে। নিয়ত চর্চার মধ্যে এল ওদেশের শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস, আঙ্গিকগত উদ্ভাবনের তাৎপর্য। ফোন্‌তানেসির ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন আসাই ছু (১৮৫৬-১৯০৭)। আর-একটু বড়ো আকারে শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৮৯-এ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিজুৎসু-গাক্‌কো। সমকালীন সরকারি নীতি অনুযায়ী এখানকার শিক্ষাবিধিতেও পাশ্চাত্যরীতিই প্রাধান্য পায়। ওকাকুরা তেন্‌শিন রাজকীয় সংগ্রহশালার প্রধান পদে বিজুৎসু-গাক্‌কোয় যোগ দিলেন। জাপানি চিত্রকলার অধ্যাপক হয়ে এলেন প্রবীণ শিল্পী হাশিমোতো গাহো (১৮৩৫-১৯০৮)। ১৮৯০-এ তেন্‌শিন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হলেন। পরিচালন কর্তৃত্ব হাতে আসার পর তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। এর অনেক আগেই, ১৮৮৫-তে তিনি ঐতিহ্যমুখী শিল্প আন্দোলন সংগঠনের জন্যে কান্‌গাকাই শিল্পীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন শিল্পকীর্তি বাঁচানো এবং ঐতিহ্য-গত শিল্পকলা বিষয়ে চর্চা। এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তিনি সেই নীতি রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। নিহোন্‌-গা বা চিত্রকলায় জাপানি শৈলী চর্চার আন্দোলন কান্‌গা-কাই সংঘের উদ্যোগে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তেন্‌শিন বোঝাতেন, জাপান এশিয়ার মনন-সম্পদ ও সংস্কৃতির মঞ্জুষা, জাপানেই রক্ষা পেয়েছে এশীয় সভ্যতার দুই প্রধান উৎস চীন ও ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আধুনিক জাপান যদি তার ঐতিহ্যের মাটি ছেড়ে যায়, গোটা এশিয়ার পক্ষেই সে হবে সমূহ সর্বনাশ।

বিজুৎস্মু -গাক্কোয় বিরোধ চরমে পৌঁছল। সরকারি বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কিছু করা যাবে না অনুভব করে তেন্শিন ১৮৯৮-এ পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন সংস্থা নিপ্পোন বিজুৎস্মু -ইন্। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন মান্য শিল্পী হাশিমোতো গাহো এবং ছাত্রদের একটি দল। নতুন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব নিলেন ইয়োকোইয়ামা তাইকান (১৮৬৮-১৯৫৮), হিশিদা শুন্সো (১৮৭৪-১৯১১), সেইগো কোগেৎস্মু, শিমোমুরা কান্জান (১৮৭৮-১৯৩০), এবং কোকেরি তোমাতো। এঁরাই তখন ছিলেন তরুণ শিল্পী সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ।

১৮৯৮-তেই বিজুৎস্মু -ইন্য়ের প্রথম প্রদর্শনী করা হল। এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি তাইকানের আঁকা চীনের এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ কুৎ-স্মু-গেন্ -এর প্রতিকৃতি। কর্তৃত্বচ্যুত কুৎ -স্মু -গেন্ অসাম মানসিক শক্তি নিয়ে একাকী চলেছেন— এই হল ছবিটির বিষয়। আসলে তাইকান এই ছবিতে প্রকাশ করেছিলেন ওকাকুরা তেন-শিনের প্রতিবাদ, পদচ্যুতি এবং দৃঢ় সংগ্রামের রূপকার্থ। অসামান্য এই কাজটির জন্য বিজুৎস্মু -ইন্য়ের মর্যাদা বাড়ল, তাইকানও আধুনিক জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের দৃষ্টিতে তেন্শিনের ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এযুগের ছাত্র হিশাবে তাইকান্রা পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যার মর্ম আয়ত্ত করেছিলেন। এই ছবিটি থেকে বোঝা যায়, সে শিক্ষা— অস্থি-সংস্থান বা অ্যানাটমির জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান, বর্ণপ্রয়োগে বিষয়ের মেজাজ এবং টোন্ ঠিক ঠিক আনবার মাত্রাজ্ঞান কত গভীর তাইকানের। এই শিক্ষা তিনি ব্যবহার করেছেন স্বদেশের ছবির ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাঁদের গুরু তেন্শিন এই সামর্থ্যই জাগিয়ে তুলতে চাইতেন। নিজের জমিতে অবিচল থেকে গ্রহণ করো, ব্যবহার করো নতুন শিক্ষা, তাতেই যথার্থ দেশীয় আধুনিকতার অভ্যুদয় হবে— এই ছিল তেন্শিনের শিক্ষানীতির মূল কথা।

বিজুৎস্মু-ইন্য়ের শিল্পীদল নতুন উদ্দীপনায় আঙ্গিকের দিক থেকে একের পর এক সাহসী পরীক্ষা করেছেন। মাথার উপরে ছিলেন তেন্শিনের মতো প্রাজ্ঞ অভিভাবক, সংকটে সাহায্য করতেন গাহোর মতো প্রবীণ শিল্পী, সুতরাং এঁরা আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে কাজ করে যেতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিজুৎস্মু -ইন্ জাপানের চিত্র-কলার ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। পর পর এঁদের প্রদর্শনীতেই চিত্রকলায় জাপানি আধুনিকতার ভিত্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিজুৎস্মু -ইন্য়ের বাইরে অনেক শিল্পী ছিলেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিলেন কোবোরাই তোমোনে, তেরাসাকি কোগিয়ো, কাওয়াই গিয়োকুদো (১৮৭৩-১৯৫৭), কোনো পক্ষেই যোগ দেন নি এমন নিরপেক্ষ শিল্পীরাও ছিলেন, যেমন, কাবুরাগি কিয়োকাতা (১৮৭৮-১৯৭২), কিক্কাওয়া রেইকা (১৮৭৫-১৯২৯)। এঁরা নিজেদের মতো কাজও করছিলেন। কিন্তু নতুন যুগের

সমস্যার স্বরূপ বোঝা এবং সে সমস্যা উত্তরণের উপযোগী পরীক্ষা -নিরীক্ষার সাহস এঁদের ছিল না। একমাত্র বিজুৎস্যু -ইন্ গোষ্ঠীই পরম্পরা আগত সমস্ত শৈলী এবং বাইরে থেকে পাওয়া প্রকরণ -জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের পরীক্ষায় নতুন চিত্রভাষা উদ্ভাবন করতে পারলেন। তেন্শিনের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা যথার্থ জাপানি আধুনিকতার প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন।

১৯০২-এ তেন্শিন ভারতে আসেন। পরের বছর আসেন তাইকান এবং হিশিদা শুন্সো। বলা যায়, সমকালীন জাপানি শিল্পকলার জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাধ্যমেই ভারত -জাপান যোগাযোগের নতুন সেতু বাঁধা হয়েছিল।

২

ছাত্রবয়সে নন্দলাল সরাসরি কোনো জাপানি শিল্পীর কাছে কাজ শেখেন নি। জাপানি শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং আঙ্গিকের জ্ঞান যা পাবার পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। কাজের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা, পবিত্র কোনো অনুষ্ঠান উদ্যাপনের মতো করে পটে তুলি ছোঁয়ানো, সামান্য রঙের ব্যবহারে ছবিতে বর্ণাঢ্যতা আনার নৈপুণ্য, আবেগ -উদ্দীপনা সংহত করে ধ্যানদৃষ্টিতে পটের সঙ্গে তন্ময়তা— এসব অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিলেন তাইকানের সাহচর্যে। তাইকানের আচরণে ছবি সম্পর্কে অদ্ভুত সম্ভ্রমবোধ প্রকাশ পেত— যা জাপানি মানসিকতার সহজাত গুণ। একটা ফুলের তোড়ার বিন্যাস পরীক্ষা করার আগেও তাঁরা ফুলদানির সামনে একবার নত হয়ে দাঁড়াবেন। সৌন্দর্য সৃজন এবং আস্বাদন লঘু বিলাসিতা নয়; আধ্যাত্মিক নিবিষ্টতা, শুচিতা নিয়ে সৌন্দর্যের সম্মুখীন হতে হয়। ওকাকুরা তেন্শিন বলতেন, কোনো ছবির আবেদনের পবিত্রতা পবিত্র ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আঁকা -না -আঁকার উপরে নির্ভর করে না। নির্ভর করে শিল্পীর উপলব্ধির মহত্ত্ব এবং গভীর আত্মোৎসর্জনের মানসিকতার উপরে। শিল্পচর্চায় এই গভীর ভাবাবহের গুরুত্ব নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সারাজীবন এই উঁচু পর্দায় বাঁধা মানসিকতা নিয়ে কাজ করেছেন। প্রথমবারে তেন্শিনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আলাপে কী বিষয়ে কতটা মত বিনিময় সম্ভব হয়েছিল বিশেষ জানা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যেভাবে পরিচালনা করতেন তার সঙ্গে বিজুৎস্যু-ইনয়ে তেন্শিনের পরিচালনা পদ্ধতির খুব মিল পাওয়া যায়। ধরে ধরে বিশেষ কোনো আঙ্গিকে ছাত্রদের দক্ষ করে তোলার পদ্ধতি দুজনই বর্জন করেছেন। নিজের রুচি, প্রবণতা এবং স্বভাবগত দক্ষতার পথ ধরে ছাত্র এগোবে, ঠেকে ঠেকে নিজের পথ তৈরি করে নেবে— দুজন এই একই নীতি অনুসরণ করতেন। আঙ্গিকের অনুশীলনের সঙ্গে বেশি জোর দিতেন ভাব-

কল্পনার সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার উপরে। মনের জমি তৈরিতে স্বদেশের আবহমান ধ্যানধারণার সারবস্তু ব্যবহার করতে চাইতেন। ইতিহাস এবং জাতীয় পুরাণ থেকে ছাত্ররা যাতে পুষ্টি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতেন। কারণ পৃথক হলেও দু দেশেই সে সময়ে প্রবল পশ্চিমি প্রভাবের মুখে প্রতিরোধ তৈরির প্রয়োজন ছিল। মূলহীন উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের মানুষ শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা হতে বাধ্য— যতই সে প্রকরণজ্ঞানে পাকা হোক। দু দেশের দুই শিল্পগুরু তাই তরুণ শিল্পীদের মনের শিকড় স্বদেশের ঐতিহ্যে সংলগ্ন করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিয়ে বসে রামায়ণ -মহাভারত -পুরাণের কাহিনী শুনতেন। তাঁর অপরূপ কথন ভঙ্গিতে বিশেষ কাহিনীর তাৎপর্য মনে গেঁথে দিতেন। তেন্‌শিনের কাছেও কোনো ছাত্র ছবির থীম নিয়ে আলোচনা করতে এলে তিনি ইতিহাসের, পুরাণের প্রসঙ্গ তুলে থীমটির তাৎপর্য ধরিয়ে দিতেন। ভাবের ঘর ভরাট করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ঐতিহ্যের মর্ম ছোঁয়ার পরেই তেন্‌শিন গুরুত্ব দিতেন নেচার স্টাডির উপরে। অবনীন্দ্রনাথও বলতেন যোগীর ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে তফাত আছে, শিল্পীর ধ্যান চোখ মেলে। এমন কী পৌরাণিক কোনো চরিত্রের অবয়বের আদল স্থির করার জন্যে পথেঘাটে মানুষজন দেখে বেড়াতে পরামর্শ দিতেন। দৃক্‌শক্তির অনুশীলন ভিন্ন চরাচরের রূপের গড়ন ও বৈচিত্র্যের ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। তেন্‌শিনের সূত্র হল, "আর্ট ইজ নো লেস্ অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন অব নেচার দ্যান্ নেচার ইজ এ কমেন্টারি অন আর্ট।" আর দুই শিল্পগুরুই অশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিল্পী ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতার উপরে। দু-জনেই সকল আরোপিত বিধিবিধানের বাইরে এসে নিজের সামর্থ্যের উপরে একান্ত-ভাবে নির্ভর করতে শেখাতেন। তেন্‌শিনের ভাষায়, "আর্ট ইজ দ্য স্ফীয়ার অব ফ্রিডম।" শিল্পীকে এই স্বাধীনতার দায়িত্ব বুঝতে হয়। বিষয়ের সমস্যা, আঙ্গিকের সমস্যা পূর্ণত তার নিজেরই সমস্যা। বাইরে থেকে কেউ এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে না। এটা শিল্পী ব্যক্তির একক সংগ্রামের ক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথেরও অনেক লেখায় এই একই ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিও বলেন, স্বভাবের পথে গ্রহণ -বর্জনে শিল্পীর শিল্প-মতি পূর্ণতার দিকে এগোতে যেন বাধা না পায়। নিজ নিজ দেশে আদর্শের, রুচির বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এঁরা আশ্রিত তরুণদের শিল্পচৈতন্যের শুদ্ধতা বাঁচাতেই এমন-ভাবে শিল্পীর স্বাধিকারের, রুচির এলাকায় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন। সর্বব্যাপী ভাঙন এবং আবর্জনার স্রোতের মধ্যে আত্মস্থ শুদ্ধাচার ভিন্ন নতুন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই শিল্পের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, তাদের আগলে রেখে, প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করে যাবার সাহস দিতেন। যে ভাবনা নিয়ে, যে নীতি মেনে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে তৈরি করেছেন তার মধ্যে জাপানি শিল্পগুরুর ভাবনা ও নীতির প্রতিফলন যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং নন্দলালের শিল্পীচরিত্রের গড়নে, তাঁর ধ্যান-

ধারণায় পরোক্ষে হলেও আধুনিক জাপানের শিল্প -আন্দোলনের প্রেরণা অনেকটাই বর্তেছিল নিশ্চিত।

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের কাজে জাপানি আঙ্গিক অনুসরণ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর মন্তব্য দেখা যায়। একথা ঠিক যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত আঙ্গিক উদ্ভাবনে জাপানি শিল্পীদের প্রিয় প্রকরণগুলির দৃষ্টান্ত থেকে গভীর প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও হুবহু কোনো জাপানি আঙ্গিক অনুসরণ করেন নি। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ওয়াশ পদ্ধতি জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি থেকে অনেক আলাদা, যদিও তাইকানের কাজ দেখেই তিনি ওয়াশ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন।

জাপানে ওয়াশ পদ্ধতির চর্চা দীর্ঘদিনের। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কানো ধারার শিল্পীরা চীনা ভূদৃশ্য নকল করার চলতি রীতি ছেড়ে দেশি বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টায় ওয়াশের করণকৌশল নিয়ে মৌলিক পরীক্ষা করেন। কানো তান উয়ু-র (১৬০২-৭৪) মতো শিল্পীর হাতে ভিজে কাগজের রঙ শুষে নেবার ক্ষমতার মানপরিমাণবোধ, কালি কিংবা প্রাথমিক রঙের প্রলেপ ভিজে কাগজের গুণে কতটা চারিয়ে যাবে সে বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান, কাগজে বসে যাওয়া রঙের গাঢ়তা এবং চারিয়ে যাওয়া হাল্‌কা বিস্তারের মধ্যে ভারসাম্য রাখার কৌশল আশ্চর্য পরিণতি পেয়েছিল। এই চর্চার বিস্তার ঘটেছিল আড়াই শো বছর ধরে। জাপানের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে তাইকান প্রাচীন ওয়াশ আঙ্গিকের উত্তরাধিকার আয়ত্ত করেছিলেন। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথ এই ধারায় সবচেয়ে শিক্ষিত শিল্পীর হাতে পুরানো একটি জাপানি আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলা যায়। কিন্তু জলরঙে তাঁর মৌলিক শিক্ষা বিলিতি রীতিতে, চার্লস পামারের কাছে। সে শিক্ষার ভিত জীবনে কখনওই বিশেষ বদলায় নি। চওড়া তুলিতে জল টেনে টেনে কাগজ বা কাপড়ের স্যাঁতা ভাব রেখে কাজ করা বা একবার রঙ দেবার পরে জলের প্রলেপে রঙ মোলায়েম করার জাপানি পদ্ধতি থেকে অবনীন্দ্রনাথের মাথায় যা এসেছিল সে হল ছবির বিষয়বস্তুর অন্তর্গত আলোর বিন্যাস যথাযথ করায় এবং কাগজের জমিতে রঙ জমিয়ে বসিয়ে দেওয়ায় এই পদ্ধতির সুযোগ নেওয়া। সেজন্যে তিনি তুলিতে জল বুলিয়ে দেওয়া ছাড়াও গোটা ছবি জলে ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে রঙ মজাতেন। আবার এইসব প্রক্রিয়ার মধ্যেও কাগজের মূল সাদা বাঁচিয়ে আলোর উজ্জ্বলতা আনার বিলিতি পদ্ধতিটি সমানে অনুসরণ করতেন। নন্দলাল দেখেছেন, নরুন দিয়ে কাগজ একটু ছিঁড়ে আশ্চর্য হাইলাইট বের করলেন বৈষ্ণবীর ছবির খঞ্জনিতে। শুনলেই মনে পড়ে ইংরেজ শিল্পী টার্নারের কথা, যিনি ন্যাকড়া বা স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে তো বটেই, দরকার বোধ করলে আলোর মাত্রা বাড়াবার জন্যে ছুরি চালিয়ে রঙের পর্দার নিচের কাগজের সাদা বের করে নিতেন। অবনীন্দ্রনাথের হাতে ওয়াশের প্রয়োগ

প্রয়োজনে বদলেছে এবং একে জাপানি প্রভাবে উদ্‌ভাবিত তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি বলাই সঙ্গত। এই বিলিতি-জাপানি প্রক্রিয়ায় মেশানো ওয়াশ পদ্ধতি নন্দলাল গুরুর কাছে শিখেছিলেন এবং সমর্থ প্রয়োগও করেছেন অনেক ছবিতে। এই রীতিতে তাঁর ভালো কাজের মধ্যে 'পার্থসারথি' (১৯১২, ৪৪ পৃ. দ্র.) এবং 'শীতের পদ্মা' (১৯১৫) স্মরণীয়। 'পার্থসারথি' ছবিতে পেছনের রথের কাঠামোর দৃঢ়তা এবং মূল চরিত্রের অবয়বের গড়ন মিলিয়ে বিন্যাস বেশ জটিল, কিন্তু ওয়াশেই এই জটিল বিন্যাস ফোটানোর ক্ষমতায় শিল্পীর নিপুণতা বোঝা যায়। অন্যপক্ষে 'শীতের পদ্মা'য় শূন্যতার দূর বিস্তার এবং উড়ে চলা পাখিদের গতির বৈপরীত্য সুদূরের ডাকে যে উদাস করে তোলে— ওয়াশের রীতিতে রঙের পর্দার ঈষৎ হেরফেরে সেই অনুভূতি চিত্রস্থ করেছেন। ছবি দুটির সারফেস কোয়ালিটির জোর বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পী বলে পরিচিত অনেকেই জাপানি ওয়াশের মোহে আবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাজে রঙ মজানোর এমন দক্ষতা বিশেষ ফোটে নি। ওয়াশ পদ্ধতিতে অর্জিত নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই আঙ্গিকে নন্দলালের আগ্রহ অবশ্য ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে। রঙের সূক্ষ্ম কাজে অবনীন্দ্রনাথ যেমন নিবিড় তৃপ্তি পেতেন সে মেজাজ নন্দলালে তেমন জমে নি। ধীরে ধীরে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের আকার-নিষ্ঠ, নির্মাণধর্মী বড়ো মাপের কাজের দিকে ঝুঁকেছেন, টেম্পেরা পদ্ধতি আশ্রয় করেছেন।

ড্রইং ছাড়াই সরাসরি তুলিতে রেখা বিন্যাসের জাপানি পদ্ধতি কি নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনুশীলন করেছিলেন? অনেক পরে তাঁর অজস্র ছবিতে এই ধরনের করণ-কৌশল দেখা যায়। সেটা আরাই কাম্‌পোর কাছে অনুশীলনের ফলও হতে পারে। উল্লেখ করার মতো আর-একটি জাপানি রীতি, পটের বড়ো এলাকা ফাঁকা রেখে দিয়ে ব্যঞ্জনা-বিস্তারের কৌশল, তিনি অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে অনেক ছোটো বড়ো কাজে এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

১৯০৭-এ জোড়াসাঁকোয় অতিথি হয়ে আসেন ইয়োশিও কাৎসুতা নামে আর-একজন বিখ্যাত জাপানি শিল্পী। কাৎসুতা একবছর এখানে ছিলেন। নন্দলাল তখনও সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র। কাৎসুতার কাছে কে কতটা শিখেছিলেন জানা সম্ভব হয় নি। তবে ইনি অজন্তায় গিয়েছিলেন এবং কলকাতায় থাকার সময়ে বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। এঁর সব ছবি জাপান সরকার পরে দেশে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন। কাৎসুতার একটি স্মরণীয় কাজ 'এ গ্রুপ অব অপ্সরাস' 'রূপম'-এ (অক্টোবর ১৯২১) যত্ন করে ছেপে আলোচনা করা হয়েছিল। রেশমের কাপড়ের উপরে জলরঙে করা ছবিটিতে ভারতীয় পোশাকে আটটি মেয়ে চরিত্র

রয়েছে। সামনে দুটি, পেছনে ছ'টি। ছবির প্রেরণা 'মেঘদূত' কাব্যের একটি শ্লোক ("পূর্বমেঘ", ১৬)। অজন্তা শৈলীর খুব নিপুণ কাজ, কিন্তু চরিত্রগুলির মুখের আদলে, ছবির পরিবেশে জাপান এসে গেছে— যা একান্ত স্বাভাবিক। এঁর আরও দুটি ছবি 'বুদ্ধ ও সুজাতা' এবং 'টেম্পটেশন অব দ্য বুদ্ধ' 'রূপম'-এ (এপ্রিল, ১৯২২) ছাপা আছে। কাৎসুতা খুব নিষ্ঠায় প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পের মর্ম আয়ত্ত করেছিলেন। বিষয় ব্যবহার করেছেন ভারতীয় দৃষ্টিবিন্দু থেকে, কিন্তু আঁকার ধরন তাঁর দেশের। শুন্‌সো এবং তাইকানও এখানে ভারতীয় বিষয় নিয়ে কিছু ভালো কাজ করেছিলেন। হিশিদা শুন্‌সোর পদ্মাসনা 'সরস্বতী' এই ধারায় চমৎকার ছবি— জাপানি তুলির নিপুণতায় আঁকা, জাপানি আদলের মুখ কিন্তু সাজসজ্জায় ভারতীয় এক দেবীমূর্তি। ইয়োকো-ইয়ামা তাইকান এঁকেছিলেন কালী। মেঘের উপরে দাঁড়ানো। খাঁড়া হাতে, গলায় মুণ্ডমালা এবং মানুষের হাতের কটি আবরণ। খুবই স্নিগ্ধ এক দেবীর কল্পনা। আমাদের চেনা কালীমূর্তির জিব বের করা ভঙ্গিটি তাইকানের ভালো লাগে নি। মুখ স্বাভাবিক রেখেছেন। তাইকানের 'রাসলীলা' অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ('জোড়াসাঁকোর ধারে') প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বড়ো মাপের ছবি। কৃষ্ণ এবং গোপিনীদের নাচের পরিমণ্ডল জ্যোৎস্নায় আর ফুলের সাদায় আলোময়। তাইকানের আর একটি কাজ 'রিয়িয়ু তো'-(দীপ ভাসানো)-তেও জাপানি মেয়েদের শাড়ি পরিয়েছেন। তিনিটি মেয়ে ঘাটে এসেছে তর্পণের অনুষ্ঠানে। এইসব কাজের মধ্যে এক তাইকানের হাতেই জাপান-ভারত মিলনের একটি স্থির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বলা যায়। ভারতের কাছে জাপানের প্রাচীন ঋণের স্মৃতি ওকাকুরা এবং তাঁর ছাত্ররা নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন। দেওয়া নেওয়ার একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমাদের শিল্পীরা ওঁদের হাতের কাজ দেখেছেন, কিছু শিখেছেন, আত্মস্থ করে নিয়েছেন ; ওঁরাও শিখেছেন। যেমন তাইকান অবনীন্দ্রনাথের কাছে মুঘল ছবির নানান্ টেক্‌নিক চর্চা করতেন।

১৯১২-র সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ওকাকুরা তেন্‌শিন দ্বিতীয় এবং শেষবার কলকাতায় আসেন। একমাসের কিছু বেশি এখানে ছিলেন। প্রথমবারে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে একলা কাজ করতে দেখে গিয়েছিলেন। এবারে এসে দেখলেন অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে একদল তরুণ শিল্পচর্চার পথে এসেছেন। ইন্‌ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্‌টাল আর্টেও শৃংখলার সঙ্গে কাজ চলছে। জোড়াসাঁকোর স্টুডিওয় এসে প্রায়ই তেন্‌শিন নন্দলালদের সঙ্গে বসে ছবি নিয়ে আলোচনা করতেন। এসব আলোচনার বিস্তারিত কোনো বিবরণ কেউ রেখে যান নি। কানাই সামন্তমশায় নন্দলালের মুখে শুনেছেন, তেন্‌শিনকে দেখে তাঁর, "জ্ঞানের সাগর মনে হত, অপার, অগাধ। পঞ্চাশটা কথা শুনে একটা উত্তর দিতেন, তাতেই খুব ইম্‌প্রেস করত।" কম কথা বলা কি ভাষার অসুবিধের জন্যে ? অন্যত্র প্রমাণ পাওয়া যায় তেন্‌শিন বেশ নাটুকে স্বভাবের মানুষ

ছিলেন, বাক্‌পটুতার অভাব ছিল না। তবে তাঁর সম্ভ্রম জাগানো ব্যক্তিত্বে নন্দলালের মতো তরুণের অভিভূত বোধ করা স্বাভাবিক। ততদিনে তেন্‌শিন ভারতেও একজন মান্য মনীষী এবং এশিয়ার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তরুণ শিল্পীদের ফেলে দেওয়া ছবি, স্কেচ সব একদিন তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। নন্দলালের "কালাদিঘির পাড়ে ইন্দিরা" ছবি দেখে মন্তব্য করেন, "ভালো, মেয়েটি সুন্দর, ভাব ফুটেছে, কিন্তু রঙ ডার্টি— " বলে ফেলে দিলেন। আদৌ অপরিচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত পরিমার্জিত কাজও কিন্তু তখন নন্দলালের অনেক। তবুও, মন্তব্যটি তরুণ শিল্পীর মনে গেঁথে গিয়েছিল। এই পরিচ্ছন্নতার, শুচিতার বোধ নন্দলাল ছাত্রজীবনের শুরুতেই তাঁর গুরুর কাছেও পেয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই অবনীন্দ্রনাথ ও তেন্‌শিনের রুচির মিল জিজ্ঞাসু, শ্রদ্ধাশীল ছাত্রটির মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। গুরুর শিক্ষার মর্মই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তেন্‌শিনের মন্তব্যে।

সুরেন গাঙ্গুলীর 'কৃষ্ণযশোদা' ছবি দেখে তেন্‌শিন মন্তব্য করেন— রেপটাইল, এ রকম ছবি কেটে দুখানা ছবি করা যায়। উক্তিটির তাৎপর্য, সরীসৃপের মতো কম্পোজিশন শিথিলবদ্ধ। ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাঁধুনির অনিবার্যতা এলে সে ছবি হয়ে ওঠে মানুষের শরীরের মতো, পরস্পর নির্ভর প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যে সুঠাম। দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে তেন্‌শিন কম্পোজিশনের মর্ম বুঝিয়ে দেন। তাঁর এই উপদেশে চীনা ও জাপানি শিল্পের একটি মূল নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর চীনা শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিক সিয়েন হো, জাপানে এঁর নামের রূপান্তর শাকাকু, ছবির ষড়ঙ্গ সূত্রবদ্ধ করেন। ছবির ছয় অঙ্গ সম্পর্কে শাকাকুর সূত্র জাপানের শিল্পীরাও মেনে এসেছেন। এর দ্বিতীয় সূত্র 'অস্থি-বিন্যাস এবং তুলির কাজের বিধি'তে শাকাকু ছবির কম্পোজিশন এবং রেখাপাতের রহস্য উন্মোচন করেন। 'আইডিয়লস্ অব দ্য ইস্ট' বইয়ে তেন্‌শিন বিধিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেছেন, সৃষ্টির উদ্দীপনা ছবির রূপকল্পে আকার পাবার জন্যে জৈব-অবয়বত্ব আশ্রয় করে। মহৎ সেই সংকল্পনা যেন শিল্পকর্মটির অস্থিময় বিন্যাসে পরিণতি পায়। রেখা তার স্নায়ু ও শিরা। সমস্ত অবয়বটি আচ্ছাদিত হয় রঙের ত্বক দিয়ে।* সুরেন গাঙ্গুলীর ছবি ধরে তেন্‌শিন এই তত্ত্বই

---

* "His second cannon deals with composition and lines, and is called 'The Law of Bones and Brushwork'. The creative spirit, according to this, in descending into a pictorial conception must take upon itself organic structure. This great imaginative scheme forms the bony system of the work ; lines take the place of nerves and arteries, and the whole is covered with the skin of colour."—Kakasu Okakura, *The Ideals of The East*, Calcutta 1973, p, 38.

বুঝিয়েছিলেন বোঝা যায়। জৈব অবয়বের মতো প্রাণ-ছন্দোময় যে কাজ— তার কোনো অংশই ছাঁটকাট করা যায় না, তাতে গোটা ছবিখানি আঘাত পায়। প্রত্যঙ্গ-গুলির এই প্রতিসাম্যকে জাপানিরা বলেন 'ইছি', আর প্রত্যঙ্গ বিন্যাসের ছককে বলা হয় 'ইশো'। 'ইশো'র মর্ম বোঝাতে তেন্‌শিন দেশলাই কাঠি ব্যবহার করে থাকবেন। শুধু ছবিতে নয়, জাপানের স্থাপত্যেও এই নীতির প্রয়োগ ঘটেছে যুগ যুগ ধরে। কোনো স্থাপত্য-প্রকল্প ত্রুটিহীন বিন্যাসে রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন বোধ করলে আশ-পাশের প্রাকৃতিক পরিবেশটিকে পর্যন্ত বদলে নেওয়া হত। গাছপালা কাটছাঁট করা হত। পরিমণ্ডলের বিরূপ প্রভাবে স্থাপত্যের অন্তর্গত ধ্যানটি যেন আঘাত না পায়। এমন কী মণ্ডন শিল্প বা ডেকরেটিভ আর্টেও জাপানি শিল্পীরা জৈব সংগঠনের নীতি মানতেন। ১৯১২-র শেষ দিকে নন্দলাল তেন্‌শিনের মুখে ছবির নির্মাণগত এই তত্ত্ব যখন শোনেন তার আগেই তিনি ১৯০৯-এ নিজ হাতে অজন্তার ভিত্তিচিত্রের প্রতি-লিপি করেছেন। ফলে তাঁর নিজের কাজে চিত্রগত বিষয়বিন্যাসে অংশগুলির মধ্যে প্রতিসাম্য স্থাপনের দক্ষতা এসে গিয়েছিল। স্নায়ু-শিরার বিস্তারের মতো রেখার বিস্তারে গোটা ছবিতে প্রাণ-ছন্দ স্পন্দিত করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। নিজের বোধবুদ্ধি নিয়ে তিনি যে পথে এগিয়ে চলেছিলেন তার সমর্থন পেলেন, তার তাৎপর্য ভালো করে বুঝবার সুযোগ পেলেন জাপানি শিল্পগুরুর কাছে। বিভিন্ন স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়; অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল দুজনই ছাত্রদের ছবি কেটে দু-তিন টুকরো করে ফেলে কম্পোজিশনের দুর্বলতা বুঝিয়ে দিতেন। তেন্‌শিনের শিক্ষা এঁরা কখনও বিস্মৃত হন নি।

তেন্‌শিন নন্দলালের 'অগ্নি' ছবিখানি দেখে মন্তব্য করেন, "এতে সবই আছে নেই শুধু আগুনের তাপ।" উক্তিটি সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "যতদূর অনুমান করা যায় বস্তুসত্তার প্রকৃতিভেদে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে ওকাকুরা ইঙ্গিত করেছিলেন।" ('চিত্রকথা', পৃ. ১৩১)। আর একটা কথা বলেন তেন্‌শিন, "ভারতবর্ষ ভাস্কর্যের দেশ, বিশেষভাবে চিত্রের নয়। ভাস্কর্য ধরলে খুব বড়ো কাজ হবে।"

তেন্‌শিনের ছোটো ছোটো মন্তব্যে চিত্রনীতির যেসব গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পেত, নন্দ-লালের জীবনে তার প্রেরণা স্থায়ী হয়েছিল। বস্তুর প্রতিরূপ রচনা নয়, বস্তুর গুণ চিত্রগত করায় তাঁর আয়াস অন্তহীন। ছাত্রদেরও বলতেন, গাছ আঁকবে তো গাছের সামনে গিয়ে প্রার্থনা করো— তার স্বরূপ যেন প্রকাশ করে তোমার কাছে। বার বারই বলেছেন, যা আঁকবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। শুধু আকার-আকৃতির বোধ নিয়ে ছবি করা যায় না, বস্তুর নিহিত প্রাণ-ছন্দ, তার গড়নের মৌল প্রকৃতি উপলব্ধিতে না আসা পর্যন্ত আঁকতে চেষ্টা করা বৃথা। ফুল হোক, গাছ হোক, কোনো প্রাণী হোক,

সবেরই মৌল প্রাণধর্ম আছে এবং সেই গুণ তাঁর মতে ছবির বিষয়। সেই গুণটুকু ধরার জন্য ওই বস্তুর মধ্যের প্রাণশক্তির ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া করতে হয় তুলির, রঙের ব্যবহারে। তিনি বলতেন, গাছের মাথা থেকে গাছ আঁকা ঠিক নয়। গাছ তো মাটি ভেদ করে নিচ থেকে উপরে বাড়ে। তার বাড়ার গতি-ছন্দ ধরার জন্য নিচ থেকেই আঁকতে হয় (সত্যজিৎ রায় ধৃত উক্তি)। নন্দলালের ছোটোখাটো স্কেচ থেকে বিরাট আকারের কাজ পর্যন্ত কোথাও এমন ছবি প্রায় নজরে আসে না যার বিন্যাস শিথিল। ভারতীয় শিল্পের অনুশীলনে ভাস্কর্য সম্পর্কে তেন্‌শিনের উক্তির মর্মও নন্দলালের উপলব্ধির গভীরে প্রতিভাত হয়েছিল। বলতেন, "চিত্রের আগেই এদেশে ছিল ভাস্কর্য, তাই ভলিউম দেখিয়েছে তারা ছবিতেও" (কানাই সামন্ত ধৃত উক্তি)। "ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক বড়ো জিনিস। ওতে যা করেছে আর-কোনো দেশ আর-কোনো যুগে তা করে নি (দৃ-স্ব, পৃ. ৪৬)। তিনি ভাস্কর্যের পথে যান নি, কিন্তু ছবিতেই এনেছেন ভাস্কর্যের গুণ। কারো পরামর্শে উপদেশে নয়, নিহিত স্বভাবে নন্দলাল যে পথে এগোচ্ছিলেন, সেই পথে পরিণতির একটা পর্যায়ে তাঁর প্রবণতা এবং বোধ যেন বড়ো সমর্থন পেল সমকালীন জাপানের শ্রেষ্ঠ মনীষীর কাছ থেকে। এই সমর্থনের গুরুত্ব তাঁর কাছে কতো গভীর, বোঝা যায় যখন দেখি, চিত্রনীতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বার বার ওকাকুরা তেন্‌শিনকে স্মরণ করেছেন।

ভারত থেকে বস্টন হয়ে তেন্‌শিন দেশে ফেরেন এবং ১৯১৩-র ২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ভারত-জাপান যোগাযোগের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যায় তাঁর মৃত্যুতে।*

৩

ভারত-জাপান যোগাযোগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং উদ্যোগে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যকালে তিনি জাপান ভ্রমণে যান। ১৯১৬-র ২৯মে জাপানে পৌঁছন। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতু রচনার প্রয়োজন বোধ তাঁর চিন্তাতেও ছিল, কিন্তু জাপানে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সে দেশের পরিস্থিতি দেখে গভীরভাবে আহত হলেন। জাপানের মাটিতে দাঁড়িয়েই সে দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ, সমরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যলিপ্সাকে কবি ধিক্কার দেন। অসম্মানিত হন। তাঁকে বলা হয়— পরাধীন জাতির অক্ষম কবি। কোথায় সেই জাপান, যে দেশে তেন্‌শিনের মতো আদর্শবাদীর জন্ম! তাঁর মনে হল, জাপানের বড়ো মাপের মানুষদের মধ্যে ওকাকুরা তেন্‌শিনের মতো কোনো প্রতিভা আর নেই। "ওকাকুরাকে তাঁর

---

* দ্র. সত্যজিৎ চৌধুরী, "ওকাকুরা তেন্‌শিন ও অবনীন্দ্রনাথ", 'অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব', কলকাতা, ১৯৭৭।

দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারে নি।"

এই দুর্যোগের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছিল শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিশাবে তাইকানের প্রতিষ্ঠা দেখে। বিস্মিত হয়েছিলেন শিমোমুরা কান্‌জানের কাজ দেখে। এঁরা তেন্‌শিনের শিক্ষা আঁকড়ে আছেন, তাঁর প্রবর্তনাকে প্রসারিত করেছেন। "জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্য ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চলছে তার ঠিক নেই।" ('জাপান যাত্রী', গ্রন্থপরিচয়)। কবি তাইকানের বাড়িতেই উঠেছিলেন। ফলে সমকালীন শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর জানবার সুযোগ অবারিত হয়েছিল। খুব তৃপ্তি পেলেন কান্‌জান তাঁর কাছে ছবি করার মতো বিষয় পেতে চাওয়ায়। কান্‌জানকে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মনে করতেন। তাই তাঁর এ বিনীত প্রার্থনায় সম্মানিত বোধ করেন।* এঁদের সঙ্গে সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তবু জাপানের শুদ্ধতর পরিচয় অনেকটা উপলব্ধি করতে পারলেন। জাপানের "সর্বজনীন রসবোধের সাধনা", দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের মহিমা ও মর্যাদা তাঁকে বিস্মিত করেছিল। মনে হয়েছিল, শিল্পের এ সামাজিক মূল্য ভারতে স্বীকৃত নয়। খুব আক্ষেপ বোধ হল, গগনেন্দ্র -অবনীন্দ্র এঁরা একবারও এদেশে এলেন না! বাংলার শিল্পীদের সম্পর্কে দায়িত্ববোধে তাইকানের সঙ্গে পরামর্শ করে শিল্পী আরাই কাম্‌পোকে বছর দুয়েকের জন্যে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তাইকান বা কান্‌জানের কাজ দেখে তাঁর মনে হচ্ছিল "নব্যবঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে।" (পূর্বোক্ত সূত্র)। জাপানি শিল্পীদের সাহচর্যে সেই জোর, সাহস

* কান্‌জানের মেজো ছেলে শিমোমুরা হিদেতোকির লেখা বাবার জীবনী 'শিমোমুরা কান্‌জান দেন' (১৯৮১, পৃ. ১৮৮) বইয়ে উদ্ধৃত কান্‌জানকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি—

Hakone

My dear Mr. Shimomura, Aug. 10, 1916.

Your kind letter has given me very great delight. Indeed I should consider it as an honour if you accept from me some subjects for your painting for your works have stirred in me the deepest admiration for you as one of the greatest artists of the world.

I shall go back to Yakohama on the 14th of this month and I shall be glad if I can meet you there on the 15th and have a talk about this matter.

Very sincerely Yours

Rabindranath Tagore

ইয়োকোহামায় হারাতোমি তারো-র বাড়িতে কান্‌জান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন। বিখ্যাত 'ইয়োরো বউস' ('দুর্বল তাপস', অন্ধের সূর্য প্রণাম) ছবির জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তমসো মা জ্যোতির্গময় মন্ত্রটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত
আরাই কাম্পো
সুহৃদ্বরেষু

বন্ধু,

একদিন
তোমার ঘরে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

আয়ত্তে আসতে পারে। শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-কে তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর মনে পড়ছিল নন্দলালের কথা। "নন্দলালরা যদি এঁর কাছে থেকে খুব বড়ো আয়তনের পটের উপরে জাপানি তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে···।" (পূর্বোক্ত সূত্র)।

রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাবার আগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা নামে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। এখানে আঁকা শেখাবার দায়িত্ব ছিল নন্দলালের উপরে। আরাই কাম্‌পো বিচিত্রায় যোগ দিলেন। তাঁর জন্য একশো টাকা মাস মাইনের ব্যবস্থা করা হল। কাম্‌পো যে বড়ো শিল্পী ছিলেন তা নয়, কিন্তু শিক্ষক হিশেবে খুব নির্ভরযোগ্য। তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কান্‌জান এবং তাইকানের দুখানি বড়ো ছবি কপি করিয়েছিলেন, সে দুটি কলাভবন (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহে আছে। বিচিত্রার কর্মী হিশেবে নন্দলাল এবং কাম্‌পোর মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এই প্রথম নন্দলাল একজন জাপানি শিল্পীর কাছে হাতেকলমে কাজ শেখার সুযোগ পেলেন। নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে কাম্‌পো যত্ন করে নানারকমের জাপানি তুলির ব্যবহার নন্দলালকে শেখাতেন। কাম্‌পো নন্দলালের সঙ্গে পুরী-কণারক যান, কণারকেও এই অনুশীলন চলে। জাপানি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা কাম্‌পো জানতেন না। তাতে শেখানোয় কোনো অসুবিধে হত না। প্রায় দু বছর নন্দলাল এই জাপানি শিল্পীর সঙ্গ পেয়েছিলেন। ১৯১৮-য় কাম্‌পো দেশে ফিরে যান। বিদায়ের সময়ে তাঁরই তুলি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন—

শ্রীযুক্ত আরাই কাম্‌পো
প্রিয়বরেষু

বন্ধু
একদিন
অতিথির
প্রায়
এসেছিলে ঘরে,
আজ তুমি যাবার বেলায়
এসেছ অন্তরে।

২৫শে বৈশাখ
১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, জয়া আপ্পাস্বামী— সকলেই বলেছেন, আরাই কাম্‌পোর কাছে জাপানি শৈলীর অনুশীলন নন্দলালের নিজস্ব আঙ্গিকে গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। একথা সত্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু কাম্‌পোর সঙ্গে পরিচয়ের আগের কিছু কাজেও, বিশেষ করে কালি -তুলির কাজে এমন পরীক্ষার নজির আছে যা জাপানি শৈলীর সঙ্গে খুব মিলে যায়। এখান থেকে যাবার সময়ে তাইকানরা প্রচুর আঁকার সরঞ্জাম গগনেন্দ্রনাথের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। সেই কালি তুলি কাগজ নন্দলাল ব্যবহার করতেন। জাপানি তুলির চালে অবনীন্দ্রনাথ তাইকানের কাছে হাত পাকিয়েছিলেন। জাপানি তুলিতে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা নন্দলাল নিশ্চয়ই অবনীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলেন। তাই কাম্‌পোর সঙ্গে পরিচয়ের আগে ১৯১২।১৩ থেকে এই ধারায় কাজের চেষ্টা দেখা যায়। আদরা না ছকে সরাসরি তুলিতে কালির টোন বা রেশ -এর হেরফের বা স্বল্পতম রেখা বিন্যাসে ছোটো আয়তনের (পোস্ট কার্ডে) এই-সব কাজের নজিরে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে একটা নতুন পথ তৈরির গরজ জমে উঠছিল। এ রকম কাজের নমুনা আরো পাওয়া যায় ১৯১৩ -য় করা আম, শিশু, তেঁতুল, খেজুর, কাঁটাল, কদম, আতা— এইসব গাছের স্টাডিতে। (কলাভবন সংগ্রহ)। তখনও জাপানি তুলির উপকরণগত সুযোগ কাজে লাগাবার কৌশল পুরো জানা ছিল না। টাচ মেথডে যাকে নন্দলাল বলতেন ছাপ -ছোপের কাজ, হয়তো সেই পদ্ধতিতে বস্তুর ভর ও স্পর্শগুণ এক ঝোঁকে ধরে দেবার জন্য তুলির ডগায় চাপের তারতম্য ঘটানোর দক্ষতা তখনও আয়ত্তে আসে নি। কিন্তু প্রবণতা এসে গিয়েছিল। সেই সময়ে কাম্‌পোর সাহচর্যে এদিকে এবং জাপানি করণ কৌশলের আরও কিছু কিছু বিশিষ্টতায় শিক্ষিত নৈপুণ্যের অধিকার এল।

ম্যাকমিলন কোম্পানি (লনডন) থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি অ্যান্ড ফ্রুট গ্যাদারিং' (১৯১৮) বইয়ের বেশ কিছু ছবিতে কালি -তুলির ব্যবহারে নতুন অর্জিত সামর্থ্যের পরিচয় আছে। যেমন গীতাঞ্জলি অংশের ১১, ৬৭ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে ছবি বা ফ্রুট গ্যাদারিং অংশের ৬১ সংখ্যক কবিতার ছবি। এই বইয়ের কোনো কোনো কাজে ফাঁকা জমির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। যেমন, গীতাঞ্জলি ৭, ১৩, ফ্রুট গ্যাদারিং-এর ৪২ সংখ্যক। ফ্রুট গ্যাদারিং -এর ৭১ সংখ্যক কবিতার রঙিন ছবিতে ঢেউ-এর কিনারের অলংকরণ ওগাতা কোরিন-এর (১৬৫৮-১৭১৬) আঁকা অসাধারণ সমুদ্রদৃশ্য স্মরণে জাগায়। পুরী ৫. ১. ১৯১৭ তারিখের একটি পোস্ট-কার্ডে নন্দলালের আর একটি সমুদ্রদৃশ্য পাই, যার ঢেউগুলির কিনারও অলংকৃত। (কলাভবন সংগ্রহ, অ্যাক্‌সেশন সংখ্যা ৬০৪৬)। পোস্টকার্ডে করা বহু ছবিতে সাদা-কালোয়, কখনও বা সামান্য রঙের ছোঁয়ায় জাপানি ধরনে কাজের চর্চার নজির রয়েছে।



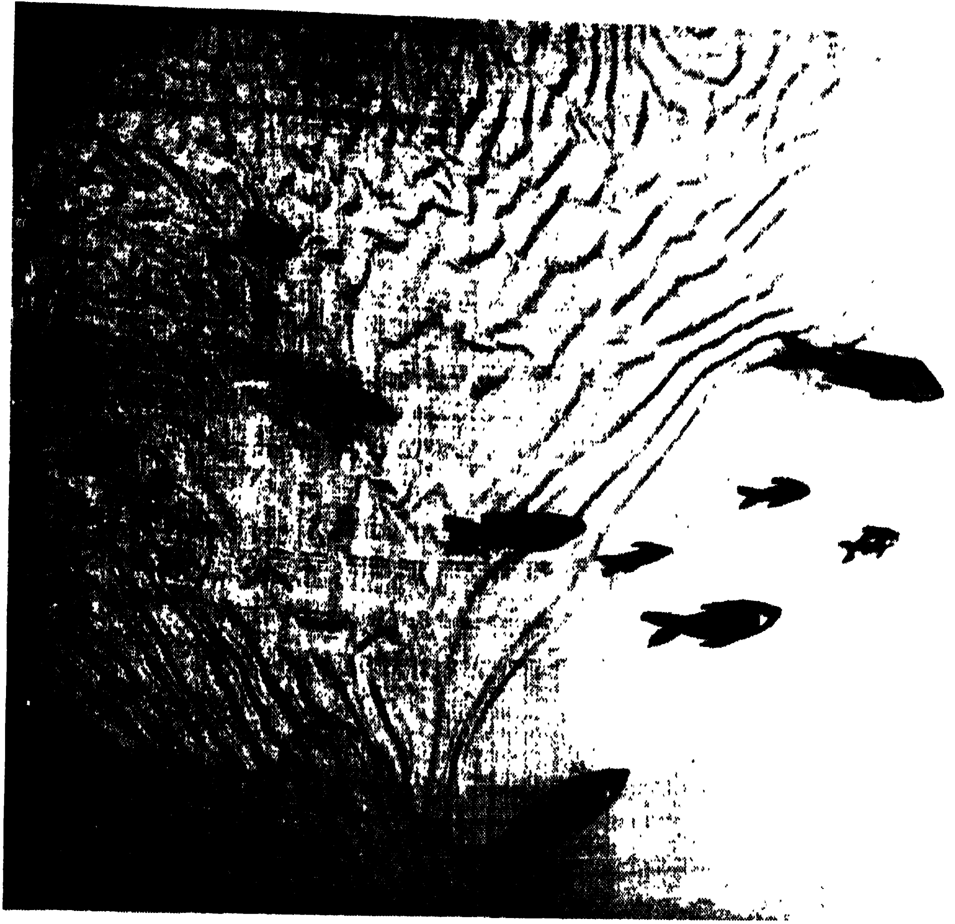
শিল্পী ওগাতা কোরিন
সোনালি কাগজে রঙে আঁকা 'ঢেউ' ছবির অংশ



শিল্পী ওগাতা কোরিন
সোনালি কাগজে কালিতে আঁকা ছবির অংশ



শিল্পী মোতোনোবু
তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমুদ্রপার হচ্ছেন



জলস্রোতে মাছ ১৯৪৯ সাদাকালো

রেখার সামর্থ্য নিয়ে পরীক্ষায় নন্দলালের আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল অফুরন্ত। এই-খানে গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটা চাপা বিরোধও ছিল। তিনি নন্দলালকে বলতেন, "রেখার ভিতর আমি দেখি যেন খাঁচার ভিতর বন্ধ পাখি।" রেখায় রূপটুকু ছাঁদা যায়, কিন্তু রূপের মুক্তি রঙে। রঙই রাজা— অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়। তাঁর হাতে তাই রেখার বাঁধুনি উপচে যায় রঙ। নন্দলালকে বরাবর টেনেছে দৃঢ় আকারবদ্ধ রূপের প্রবণতা। রেখার মাহাত্ম্য তাঁর নিজস্ব শৈলীর ভিত্তি। আরাই কাম্‌পোর কাছে অনুশীলনে রেখার শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

জাপানি ছবির ইতিহাসের পর্বে পর্বে চীনা প্রভাবে রেখানুশীলনের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে। ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলার— যাকে জাপানিরা বলেন সেন্— দীর্ঘ চর্চায় জাপানি শিল্পীদের হাতে তুলির স্বচ্ছন্দ অথচ শক্তিমন্ত চাল ছবির জগতে এক বিস্ময়। কানো মাসানোবুর (১৪৫৪-৯০) হাতে শুরু বিখ্যাত কানো শৈলীর শিল্পীরা লিপি-চিত্রকলায় চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিলেন। যেমন মাসানোবুর ছেলে কানো মোতোনোবুর (১৪৭৬-১৫৫৯) কাজ, যাঁর নমনীয় কোমল রেখার অসামান্য সৌন্দর্যময় বিন্যাসে চিত্রিত পট অপরূপ ছন্দোময় হয়ে উঠত। জাপানের ক্ল্যাসিকাল ক্যালিগ্রাফিক কাজের চমৎকার দৃষ্টান্ত মোতোনোবুর "তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমুদ্র পার হচ্ছেন" এই ছবিটি। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ওগাতা কোরিন-এর নাম, যাঁকে বলা হয় জাপানি শিল্পীদের মধ্যে জাপানিতম। তাঁর হাতে মণ্ডনধর্মী রেখা বিন্যাসের নৈপুণ্য অসাধারণ উৎকর্ষ পেয়েছিল। আলংকারিক রেখার সুষমা বিপর্যস্ত না করেও তিনি প্রচণ্ড প্রাণাবেগ প্রকাশ করতে পারতেন। তীক্ষ্ণ গতিময় রেখায় বস্তুর বাস্তবগুণ শুদ্ধ চিত্ররূপ পেত। তাঁর আঁকা সমুদ্র দৃশ্যগুলি, সোনালি পটে নীল রঙে উত্তাল সমুদ্রের ভয়ংকর রূপ— সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জাপানি ছবির মধ্যে স্থায়ী কীর্তি। সেন্-রীতির এই ধারাবাহিক বিকাশ এবং অসীম প্রকাশ ক্ষমতার নিহিত কলাকৌশল নন্দলাল আরাই কাম্‌পোর কাছে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতীয় মূর্তি শিল্পের অলংকরণ এবং রাজপুত ছবির আলংকারিক রীতি সম্পর্কে নন্দলালের আগ্রহ এবং অনুশীলন অনেক আগে থেকেই সূচিত হয়েছিল, সেই চর্চায় একটা নতুন আয়তনযুক্ত হল জাপানি ক্যালিগ্রাফি অনুশীলনে। ডিজাইন বা নকাশির নির্বস্তুক সৌন্দর্য রচনা ছাড়াও বস্তুর গড়ন ও গুণ চিত্রগত করায় আলংকারিক পদ্ধতির অন্তহীন সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর বোধের বিকাশে এই অভিজ্ঞতার গুরুত্ব খুব। জাপানের শিল্প বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা 'কোক্কা' কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে নিয়মিত আসত। এই পত্রিকায় ওদেশের ক্ল্যাসিক্যাল ছবির অতি চমৎকার প্রতি-লিপি থেকে বড়ো শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে সাক্ষাৎ ধারণা তৈরির সুযোগও পেয়েছেন। নন্দলালের নানা ধরনের কাজে, জীবজন্তু মানুষজনের রূপ রচনায় বা

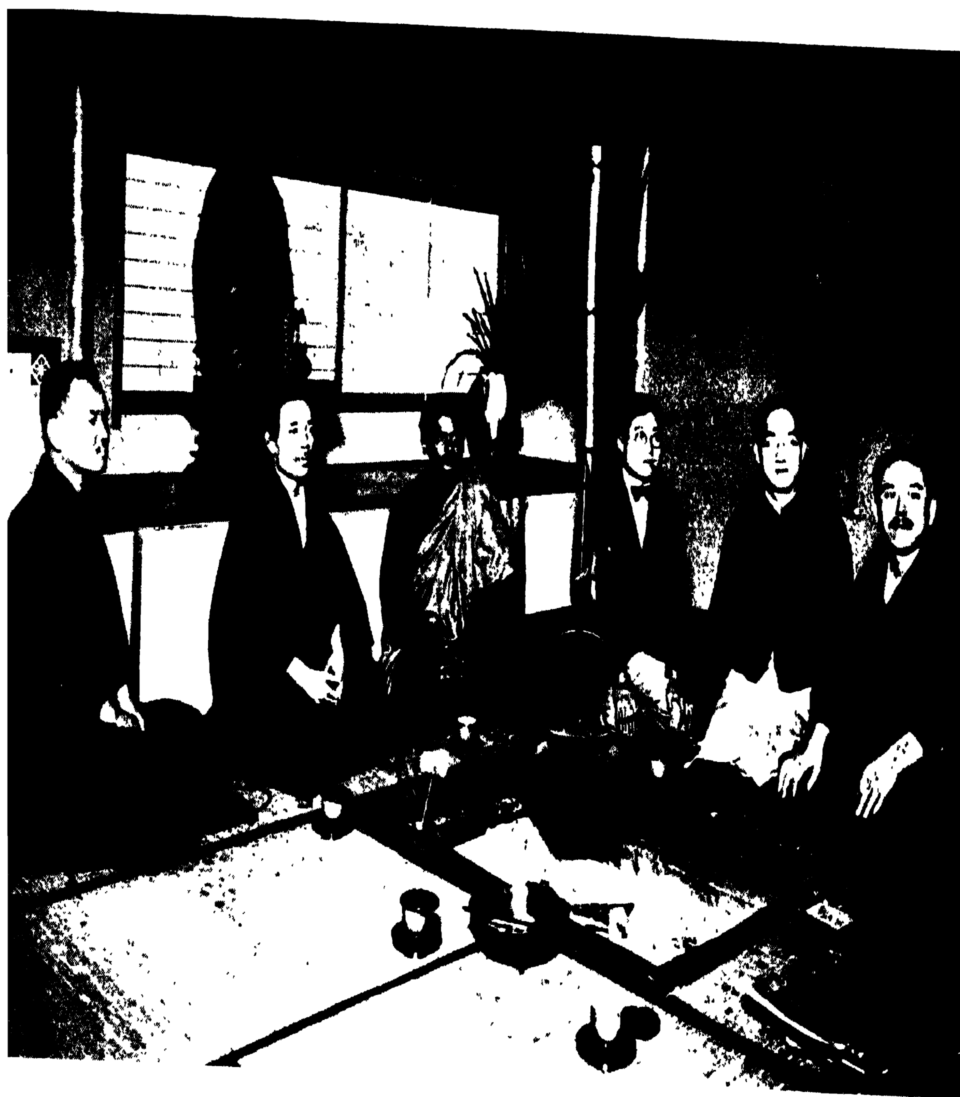
প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায় তীক্ষ্ণ ও কোমল রেখার বুনোটে যে বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায়, আবহমান প্রাচ্য চিত্রকলার আলংকারিক রীতি পদ্ধতির গভীর অনুশীলনেই সেই শৈলী গড়ে উঠেছিল।

জাপানি আঙ্গিকের অভিজ্ঞতার সংহত, সৃষ্টিময় প্রয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এই পর্বের 'উমার ব্যথা' (১৯২১, ৬৬পৃষ্ঠা দ্র.) ছবি। ছিন্ন রুদ্রাক্ষের মালা, ছিন্নদল পদ্ম, প্রত্যাখ্যাত উমার বেদনা -আনত দেহভঙ্গির কারুণ্য ঘিরে আছে পাহাড়ি প্রকৃতি। এই ছবির তুলির চালে, গাছ পাতা পাথর আঁকার ধরনে অনেকটা জাপানি শৈলীর কাছাকাছি গেছেন। এ রকম ছবি অবশ্য একটিই পাওয়া যাচ্ছে এই সময়ে। কালি-তুলির কাজও বেশি নয়। জাপানি শৈলী অনুসরণের প্রবণতা বেড়েছে আরো পরে।

৫

নন্দলালের জীবনে বড়ো পর্বান্তর এল ১৯২০-তে। কলাভবনের দায়িত্ব নিয়ে স্থায়ী-ভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এলেন। বিশ্বভারতী প্রাচ্যবিদ্যা এবং প্রাচ্য শিল্প-কলা চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথ এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। শান্তিনিকেতনে সূচনাকাল থেকেই তিনি এজন্য কিছু কিছু প্রাথমিক আয়োজন করে এসেছেন। এখানকার শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ জাগাবার জন্যে তিনি নিজে মাঝে মাঝে জাপানি সাহিত্য পড়ে শোনাতেন, জাপানি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। চীন-জাপানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সর্বদাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। চীন-জাপান সম্পর্কে তাঁরও আন্তরিক আকর্ষণের মূলে ছিল ওকাকুরা তেন্‌শিনের চরিত্র এবং মতা-মতের স্মৃতি। ১৯১৬-য় তিনি তেন্‌শিনের স্ত্রীর আমন্ত্রণে ইদ্‌জুরায় তাঁদের বাড়িতে বাস করে এসেছেন। তেন্‌শিনের স্মৃতিতে একটি ফার গাছের চারা রোপণ করে এসে-ছিলেন। ১৯২৪-এ আবার চীন-জাপান ভ্রমণের সুযোগ এল। এবারে তিনি নন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে যান। এই প্রথম নন্দলাল এশিয়ার দুটি প্রাচীন দেশের কলাসংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ পেলেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক চীন এবং জাপানের পক্ষে দুঃসময়। অব্যবস্থিত রাজনৈতিক পরিবেশ। সমাজের মধ্যেও মত -সংঘর্ষ, রুচির সংঘর্ষ আবর্ত সৃষ্টি করছে। সাধারণ জীবনে পশ্চিমি প্রভাব খুব তীব্র। নির্মোহ সুস্থির দৃষ্টিতে নন্দ-লাল এই পরিস্থিতির ভালো মন্দ দিক খুঁটিয়ে দেখেন। ৮ মে ১৯২৪ তারিখে চীন থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে (রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ) তাঁর অভিজ্ঞতার বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। বলছেন, চীন দেশে উচ্চ অঙ্গের শিল্পের গোড়ায় পশ্চিম দেশীয় কীট.প্রবেশ করেছে। সাধারণের মধ্যে রুচির কোনো



তাইকানের বাড়িতে চা নো ইয়ু (চা পার্বণ) অনুষ্ঠানে নন্দলালের সংবর্ধনা
বাঁ-দিক থেকে দ্বিতীয় তাইকান, তৃতীয় নন্দলাল, ষষ্ঠ আরাই কামপো

মান নেই। পোশাক -পরিচ্ছদে তীব্র মার্কিন প্রভাব। মার্কিনি কায়দায় মিউজিয়ম তৈরি করে শিল্পবস্তু সংরক্ষণের চেষ্টায় তবুও দুর্লভ সামগ্রী দেশের বাইরে যাওয়া অনেকটা বন্ধ হয়েছে দেখে খুশি হন। সংখ্যায় কম হলেও সত্যকার শিল্পের কদর বোঝে এমন কিছু লোক ইনডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর মতো সোসাইটি খুলে বড়ো আকারে কাজ করছেন দেখে ভালো লাগে তাঁর। 'ছোকরাদের' মধ্যে না ভেবেই পুরাতনকে ছেড়ে যাবার প্রবণতায় উদ্বেগ বোধ করেন। এই পরি-বেশের মধ্যে উদ্যোগী হয়ে তিনি যথার্থ গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং চীনের পরম্পরাগত শিল্পকলা যতটা সম্ভব দেখেন।

এই যাত্রায় নন্দলাল জাপানে ছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ। জাপানের শিল্পী সমাজের কাছে তিনি অপরিচিত ছিলেন না। তাঁর 'সতী' ছবির প্রতিলিপি জন উডরফের আলোচনার সঙ্গে 'কোক্কা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৮)। ১৯১৯-এ তোকিয়োয় বাংলার শিল্পীদের যে প্রদর্শনী হয় সেখানে তাঁর ছবিও ছিল। বহুশ্রুত ইয়োকোইয়ামা তাইকান, শিমোমুরা কান্‌জান— এঁদের সঙ্গে এবারে নন্দলালের পরিচয় হল। এখানে নতুন করে কিছু অনুশীলনের মতো সময় বা সুযোগ পান নি অনুমান করা যায়। তবে বিখ্যাত শিল্পীদের মূল কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ অবশ্যই পেয়েছিলেন। বিজুৎসু -ইন্‌য়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তেন্‌শিনের মৃত্যুর পরে এই প্রতিষ্ঠান ঝিমিয়ে পড়েছিল। ১৯১৮-য় তাইকান নতুন উদ্দীপনায় এখানকার কাজের তত্ত্বাবধান শুরু করেন এবং অনেক তরুণ শিল্পী যোগ দেন। সাধারণের রুচির বিশৃঙ্খলা চীনের মতো জাপানেও ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল। শিল্পীদের মধ্যেও অনেক দল উপদল। রেনোয়ারের ছাত্র উমেহারা রিয়ুজাবুরো (১৮৮৮-), পিসারো এবং সেজানের অনুগামী ইয়াসুই সোতারো (১৮৮৮ -১৯৫৫) বিশেষভাবে আধুনিক ফরাসি শিল্প আন্দোলনের প্রভাব আত্মস্থ করে জাপানে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। এঁরা শক্তিমান শিল্পী ছিলেন এবং সমকালীন শিল্পী সমাজে এঁদের প্রভাব কম ছিল না। ফলে ১৯২০ থেকে ফরাসি চিত্রকলার বিভিন্ন আন্দোলন, ফোভিজ্‌ম -কিউবিজ্‌ম -ফিউচরিজ্‌মের প্রভাব জাপানি শিল্পীদের মধ্যেও এইসব শৈলীর পরীক্ষায় উৎসাহ জাগিয়েছে। গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো গোষ্ঠী। নন্দলাল অবশ্যই সমকালীন জাপানি শিল্পজগতের বিরোধী প্রবণতাগুলি লক্ষ করেছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাবে যে সমস্ত ধারা উপধারা তৈরি হয়ে উঠেছিল সেসব কাজের মূল্য সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা কিছুই আমরা জানি না। অনুমান করা যায়, য়ুরোপীয় আধুনিকতা সম্পর্কে শিল্পীদের এই ব্যাকুলতা তাঁর ভালো লাগে নি।* নানা স্রোতের ঘাত -প্রতিঘাতের মধ্যেও বর্ষীয়ান তাইকান

---

* আমাদের আর একজন কৃতী শিল্পীর অবলোকন স্মরণীয়। ১৯৩৭ -৩৮ সালে বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায় জাপানে ছিলেন। সমকালীন জাপানি কলাসংস্কৃতির পশ্চিমি ঝোঁক

নতুন নতুন কাজে নিজেকে বিকশিত করছেন, একটা বড়ো গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছেন দেখে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন। তেন্‌শিনের প্রভাবে শুরু জাপানি-আধুনিকতার মূল ধারাটি তখনও প্রাণবন্ত ছিল। তাইকান একসময়ে পুরানো ছবি নকল করার কাজ করেছেন। যেমন নন্দলালও করেছেন। শিল্পের স্বদেশকে বোঝার এই চেষ্টার পাশাপাশি য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও গুরু তেন্‌শিন উৎসাহ দিতেন। শিল্পে জাপানি আধুনিকতার মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠা তাঁর বিজুৎসু-ইন্ কেন্দ্রেই সম্ভব হল। এই প্রতিষ্ঠানের ছয় জন মূল সংগঠক শিল্পী—তাইকান্, শুন্‌সো, কান্‌জান, সেইগো কোগেৎসু, তেরাসাকি কোগিও (১৮৬৬-১৯১৯), কোবোরি তোমোনে (১৮৬৪-১৯৩১)। আমাদের এখানে প্রথম তিনজনের ধারাবাহিক কাজ ভালো অ্যালবামে দেখার সুযোগ আছে। দেখলে বোঝা যায়, ওকাকুরা তেন্‌শিন সকলকে এক গোয়ালে ঢোকাতে কখনও চেষ্টা করেন নি। তাঁদের নিজস্ব বিকাশের সমস্যা আলাদা। প্রয়োজনে য়ুরোপীয় আঙ্গিকের সূক্ষ্ম মিশ্রণকেও এঁরা কিছু দোষের মনে করেন নি। অনেক ছবিতে এই ছায়া-

---

প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "…I could gather that Picasso and Matisse exert the strongest influence on the Japanese oil painters. Apart from the followers of these two there are a number of devoted adherents of almost all the different schools of France today. Notable among them are the schools of surrealism, impressionism, etc. There cannot be any question about the thoroughness of these artists…. Not only have they copied the style and mannerisms of the French painters, but have also gone so far as to introduce French ideal of beauty in their figure drawing.

"There is another fact about modern Japanese art which has struck me as curious and painful, and which I may call an over-emphasis of the notion of style. The few critics and teachers of art that I could meet seemed to be practically obsessed with the idea of style. It is difficult to explain what lies behind this mentality of the oil painters of Japan. But I think one may say, without any fear of contradiction, that preoccupation with style is working like an insidious poison and striking at the very root of the Japanese art."—('চিত্রকথা' পৃ. ৩৯৩ ৯৪)।

আধুনিকতা অর্থে য়ুরোপীয় আধুনিকতা ধরে নেওয়াই প্রাচ্য দেশের পক্ষে সংকটের মূল। জাপানের অভিজ্ঞতায় বিনোদবিহারী এই সংকটের তীব্রতা অনুভব করেন।

১৩৬. জাপানের প্রেরণা



শিল্পী হিশিদা শুন্‌সো

ও চি বা : ঝরাপাতা ১৯০৯ রঙের কাজ



শিল্পী ইয়োকোইয়ামা তাইকান
সেই সেই রুতেন : জলপ্রবাহ ১৯২৩ সাদাকালো



তাইকান এবং নন্দলাল

তপের নিপুণ ব্যবহার দেখা যায়। দেখা যায় পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার। য়ুরোপীয় প্রতিকৃতি শিল্পের সম্পন্ন ঐতিহ্য থেকে এঁরা অনেক নিয়েছেন। নিজেদের ছবিতে চরিত্ররূপ রচনায় সে শিক্ষা কাজে লাগিয়েছেন। য়ুরোপীয় তেলরঙের বিভা আসে না জাপানি রঙে। আনা চাই। এঁরা তাই রঙের সঙ্গে ঝিনুকের গুঁড়ো মেশানো শুরু করেন। আশ্চর্য ফল পান। খোলা মনে, খোলা চোখে সব অভিজ্ঞতা এইভাবে নিজেদের কাজের মধ্যে টেনে এনেছেন। সাহসে, প্রত্যয়ে অবিচল ব্যক্তিত্ব নিয়ে কী নেবেন না-নেবেন যাচাই করেছেন। সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরিয়ে আসার বহু নজির আছে এঁদের কাজে। এ লড়াই বিজুৎসু-ইন্ প্রতিষ্ঠানের পর্বে পর্বে দীর্ঘ দিন চলেছিল। তিরিশের দশক অবধি জাপানি আধুনিক শিল্পে বিজুৎসু-ইন্য়ের প্রতিপত্তি অটুট ছিল। নন্দলাল এখানকার শিল্পীদের বড়ো মর্যাদার কাজ— মাস্টার পীস-গুলি অবশ্যই ভালো করে দেখেছিলেন। ঠিক আগের বছর ১৯২৩-এ আঁকা তাইকানের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ 'সেই সেই রুতেন' নামের ৩৮·৬৪ মিটার দীর্ঘ পট দেখেছিলেন। জীবনের সব শিক্ষা, সব অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে রেশমের উপরে সাদা-কালোয় আঁকা এই নদীর ছবিতে শিল্পীর নিজের জীবনে যেমন, তেমনি বিজুৎসু-ইন্য়ের চর্চার ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। নন্দলালের সাদাকালোয় করা কোনো কোনো কাজের সঙ্গে তাইকানের বিশাল এই ছবিটির খুব ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে।

ছাত্র বয়স থেকে জাপানি শিল্পরীতি সম্পর্কে আকর্ষণ এবং বিভিন্ন সময়ের সঞ্চিত জ্ঞান বোধহয় চীন-জাপান ঘুরে আসার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় ক্রমে আত্ম-প্রকাশের একটি বড়ো পথ তৈরিতে কার্যকর হল নন্দলালের জীবনের উত্তর-পর্বে। রঙের কাজের পাশাপাশি কালি-তুলির কাজের একটা ধারা অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু ক্রমে রঙের বৈভবের চেয়ে সাদাকালোর কাজে তাঁর অভিনিবেশ গাঢ় হতে থাকে। রঙ দিয়ে ধরা যায় বস্তুর যে অকারবদ্ধ রূপ, তার চেয়ে বস্তুর স্পর্শগ্রাহ্য গড়নের গতি-রেখার রহস্য নন্দলালকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছে চিরদিন। এইখানে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তা। এই স্বভাবের টানেই তিনি ভারতীয় মণ্ডনধর্মী শিল্পের চর্চায় গভীর আনন্দ পেতেন। একই প্রবণতায় চীন-জাপানের লিপিকলার রেখার ছন্দে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অকস্মাৎ বাইরের প্রভাবে কোনো বড়ো প্রতিভার আত্মপ্রকাশের ভাষা বদলায় না কখনও। প্রতিভা নিজস্ব স্বভাবে বাইরে থেকে নিজের ভাষা তৈরির উপাদান আকর্ষণ করে নেয়। 'প্রভাব' কথাটা এখানে তাই অবান্তর। নন্দলালের আত্মবিকাশে জাপানি অভিজ্ঞতা এইভাবেই গভীর ফলবান হয়েছিল। পরিণত বয়সে ক্রমে তিনি বর্ণমায়া থেকে নিজেকে সংবৃত করে নিয়েছেন। আশ্রয় করেছেন সাদা এবং কালো, যে সাদায় কালোয় সব রঙ সংবৃত। তাঁর শিল্পীমনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক বদলে অবশ্যই জাপানি অভিজ্ঞতা থেকে জেগে ওঠা ভাবনা কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালোবাসে— জাপানের আর্টে কালা-গোরার মিলনই প্রধান।" (পূর্বোক্ত সূত্র)। পটের সমতল জমি ভেঙে চিত্রগত বস্তুর নানা আয়তনের মায়া জাগানো রঙে যতো সহজ শুধু কালোয় তেমন অনায়াস হতে পারে না কখনও। এই আঙ্গিকে শিল্পী কঠিন বাধার সম্মুখীন হন। শুধু কালোয় বস্তুর গড়ন ধরতে গেলেই পটের অলাঞ্ছিত অবকাশ বা স্পেস-এর সঙ্গে গড়নটির দ্বন্দ্বময় সম্বন্ধপাতের মাত্রাবোধে ভিন্ন এক চিত্রভাষা গড়ে তুলতে হয়। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রটিতে নন্দলালের মতো বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা আমাদের আর-কোনো শিল্পী করেন নি। চিত্রগত বস্তুর ঘনতা, ভর, অন্তর্গত গতির তীব্রতা শুধু সাদা কালোর দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাসে ধরা প্রচণ্ড সাহসের এবং শক্তির কাজ। অথচ এ বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে প্রায় প্রত্যহ আয়াসহীনভাবে একটানা অনেক কাজ করে যেতেন। ভোরবেলার প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ সময়টুকু নিবিষ্টভাবে কালি-তুলির কাজে মগ্ন থাকতেন। যখন যেখানে গেছেন সেখানকার পরিবেশের যা-কিছু অভিজ্ঞতা— ধরে এনেছেন এই আঙ্গিকে। বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে নন্দলালের যথার্থ ভূমিকা এবং নানামুখী আদর্শের টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁর স্থির অবিচল বিকাশশীল প্রতিভার তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন



পূর্ণাঙ্গ বিচার এখনও হয় নি, তেমনি ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় তাঁর এই বিশিষ্ট দানের গুরুত্ব সম্পর্কেও বিচার হয় নি। আক্ষরিকভাবেই তিনি কালি -তুলির ছবি এবং স্কেচ মিলিয়ে অসংখ্য কাজ করেছেন এবং সব কারও পক্ষে দেখে ওঠাও সম্ভব নয়। যেটুকু দেখার সুযোগ আছে তাতেই বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে,, দেশীয় প্রকৃতি, দেশীয় জীবজন্তু এবং দেশীয় মানব সমাজের কী এক বিশাল অভিজ্ঞতা এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। পুরাণের গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনলেন এই পথে। কতো বিচিত্রভাবে তাঁর প্রতিভা স্বদেশের মাটিতে শিকড় মেলেছিল। দৈনন্দিন বাস্তবকে কে আর এত বিচিত্ররূপে ব্যবহার করেছেন ! বাস্তবতার তত্ত্ব নিয়ে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পতত্ত্বের এলাকায় নানা তর্কে উঠেছে তাঁর জীবিতকালে। সেসব তর্কে তাঁর বিশেষ কিছু ভূমিকা ছিল না, নির্লিপ্তই ছিলেন বলা যায়। কিন্তু নিজের কাজে শক্ত কব্জিতে বাস্তবের মোকাবিলা করেছেন অক্লান্তভাবে।

বিষয় -মহিমায় ছবি মাস্টার -পীস হল -কি -না -হল এ ভাবনা আর যেন তাঁকে ভাবায় না। চোখ মেলে ঘাস -পাতা, গাছ -গাছালি যা দেখেন— সর্বত্রই পেয়ে যান ছবির খাঁটি বিষয়। কুকুরছানাগুলো মা- কুকুরকে ঝেঁপে আছে, গোরুবাছুর ঘরে ফিরছে বা চরে বেড়াচ্ছে, চাষিটি মাথাল মাথায় দিয়ে কিসের প্রতীক্ষা করছে, মেলায় চলেছে মেয়ে পুরুষের ঝাঁক, তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে নেশুড়ে, নাচিয়ে বাউল, বাবুদের চড়ুইভাতির এঁটোকাঁটা পাবে বলে উৎসুক ভিখিরি ছেলেমেয়ে (মলাটের স্কেচ)— এই রূপময়, আবার দীনতায় অবসন্ন স্বদেশ ; স্বদেশের বাস্তব প্রকৃতি এবং বাস্তব মানুষ উঠে আসে তাঁর চিত্রধারায়। পাহাড় এবং সমুদ্র আসে। হিমালয়ের নানান্ রূপ এবং পুরী ও গোপালপুরের সমুদ্রের অসামান্য. দৃশ্যাবলি —যার মধ্যে মানুষের



জীবনযাত্রার লড়াইটাও ধরা আছে। কত মুখ মানুষের, মুখের কত রকমারি ছাঁদ। বিচিত্র রক্তের উত্তরাধিকারী সব ভারতীয় মানুষ, তাদের পোশাক-আশাক, জীবন-যাত্রার দৃশ্য ধরা রয়েছে নন্দলাল বসুর এই ধারার কাজে। এসব কাজে বিশেষ করে দেখার জিনিশ, রেখার জোর এবং তুলির সামান্য ছোপছাপে রূপের গড়ন অব্যর্থভাবে ধরার নিপুণতা।

চলমান জীবনের সর্বায়ত রূপ ধারাবাহিক চিত্রমালায় এভাবে ধরে যাওয়ায় তাঁর অভিনিবেশ জাপানের উকিইয়ো-য়ি ধারার শিল্পীদের কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিষয় ভাবনায় পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বস্তু থেকে এঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধারার শিল্পীরা বিষয়-ভাবনার আভিজাত্য ভেঙে দেওয়ায় বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন। বলা হত, ক্লাসিক্যাল জাপানি ছবির পরিশীলিত সূক্ষ্ম আঙ্গিক এঁদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু এঁদের ছবিতে প্রবল প্রাণময় রেখা ও বর্ণ বিন্যাসের ক্ষমতা, কেউ অস্বীকার করেন না। জাপানি চিত্রকলার ইতিহাসে উকিইয়ো-য়ি ধারার শিল্পীরা একটি স্বতন্ত্র প্রাণবন্ত চিত্র-প্রজাতি সৃষ্টি করে গেছেন, যার আর-এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ



গোপালপুর পর্যায় ১৯৪৭ কালির ছোপের কাজ



ফসল তোলার সাঁওতালি নাচ ১৯৫০ জলরঙ

ঘটেছিল নিশিকি -ইয়ে বা সিল্ক -প্রিন্ট শিল্পে। উকিইয়ো -য়ি শিল্পীরা পরিবারগত ভাবে এক -একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করতেন এবং বিশেষ বিষয়ের ছবিতে পারদর্শিতা এক -একটি পরিবারের অধিকারে ছিল। নন্দলালেব হাতে উকিইয়ো -য়ি তুল্য একটি চিত্র -প্রজাতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে — বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি অবশ্য কোনো একটি বিষয়ের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ পারদর্শিতার চর্চা করেন নি, চারপাশের প্রকৃতি ও চলমান জীবনের রূপগত বৈচিত্র্যের সব -কিছুতেই তাঁর সমান আকর্ষণ। আর, তাঁর এই বাস্তবজীবনমুখী বিপুল কাজে রঙের ব্যবহার করেছেন কম, কালি -তুলির ছবিই সংখ্যায় অনেক বেশি। কোথাও কোথাও কালিতে আঁকা ছবিতে বিশেষ প্রয়োজনে সামান্য রঙের ছোঁয়া দিয়েছেন। যেমন রাতের শালবনের পথে গোরুর গাড়িতে কেঁদুলি মেলায় যাবার ছবিটিতে পথের উপরে কালোর মধ্যে সোনালি রঙের স্পর্শ। বা, জলে উজিয়ে চলা পুঁটিমাছের ছবিতে মাছগুলির কান্‌কো এবং চোখে লালের ছোঁয়া। কালির মধ্যে সোনালি বা অন্য রঙের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল অথবা মৃদু প্রভা খেলানোর এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন জাপানি শিল্পী তাওয়ারাইয়া সোতাৎসু (সপ্তদশ শতাব্দী)। জাপানি কালি -তুলির ছবিতে এই পদ্ধতি পরে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। ইঙ্গিতটি নন্দলাল জাপানি ছবি থেকে পেয়ে থাকবেন।

এই প্রসঙ্গেই নন্দলালের প্রকৃতিচিত্র, ভূদৃশ্য -সমুদ্রদৃশ্য রচনায় ধারাবাহিক আগ্রহের কথাও মনে আসে। আমাদের ঐতিহ্যে প্রকৃতিচিত্রের চর্চা ছিল না। আধুনিক পর্বের গোড়ায় প্রকৃতিচিত্রের আদর্শ এসেছিল দুই উৎস— ইংরেজ শিল্পী টার্নার -কনস্‌টেবল্‌দের ছবি এবং চীনা ও জাপানি ছবি— থেকে। চীনা প্রকৃতি-চিত্রের ঐতিহ্য প্রাচীনতম। চীনের চিত্রনীতি গড়ে উঠেছিল কনফুশিয়স, লাও -ৎজু, এবং মহাযান বৌদ্ধ বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তিতে। সুঙ সম্রাটদের আমলে (৯৬০ -১২৭৯) চীনা প্রকৃতিচিত্র উৎকর্ষের বিস্ময়কর স্তরে পৌঁছয়। বস্তুর চাক্ষুষ রূপ মাত্রেই প্রাচীন চীনা শিল্পীদের দৃষ্টিতে গভীর বিশ্বসত্যের প্রতীক। স্বর্গ ও মর্তের সৌষম্যে বাঁধা বিশ্বপ্রকৃতিতে মেঘ -কুয়াশা -জল স্বর্গের প্রতীক— য়িয়াঙ ; পাহাড় -গাছপালা পার্থিবতার প্রতীক,— য়িঙ। জলধারায়, নুয়ে আসা মেঘ বা কুয়াশায় তাঁরা দেখেছেন মর্ত্যের সঙ্গে মিলনে স্বর্গের অনুকাঙ্ক্ষা। তাঁদের তুলির স্পর্শে পটের উপরে যা -কিছু ফুটে ওঠে সবই এই বিশ্ব -ব্যাপারের মহিমা সম্পর্কে শিল্পীর ধ্যানের প্রতিরূপ। এই আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর চীনা প্রকৃতিচিত্রের প্রশান্ত সৌন্দর্য অনেক দিন জাপানের শিল্পীদেব আদর্শ ছিল। তাঁরা প্রকৃতিচিত্রে স্বদেশের কোনো দৃশ্য নয়, চীনা দৃশ্যাবলিই আঁকতেন। প্রকৃতিচিত্রে জাপানি স্বাদেশিতার বোধ প্রথম দেখা দিয়েছিল কানো ধারার অন্যতম শক্তিমান শিল্পী তান্‌য়িউ -র (১৬০২-৭৪) চেতনায়। তিনি চীনা দৃশ্যাবলির বদলে চোখে দেখা দেশীয় দৃশ্যের আদলে আঁকা শুরু করেন এবং চীনের প্রভাব মুক্ত

জাপানি প্রকৃতিচিত্রের বিকাশ শুরু হয়। অত পুরনো কাজ আমাদের এখানে কতটা পৌঁছেছিল বলা শক্ত। কিন্তু আমাদের শিল্পীরা এক সময়ে উকিইয়ো -য়ি ধারার কাৎসুশিকা হোকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯) এবং আরো বড়ো মাপের প্রকৃতিচিত্র শিল্পী হিরোশিগের (১৭৯৭-১৮৫৮) কাজ অবশ্যই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। উকিইয়ো -য়ি কলমের প্রকৃতিচিত্রে আদর্শায়িত দৃশ্যের বদলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানীয়তা এল। জাপানের ইতিহাসে আধুনিক পর্বের ঠিক আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সমাজের মধ্যে রুচির বদল ঘটে যাচ্ছিল। হিরোশিগের কাজে সেই নতুন মেজাজ ফুটেছিল। তাঁর ছবিতে মেঘ -বৃষ্টি -জল, পাহাড় -গাছপালা থেকে প্রতীকের রেশ কেটে গিয়ে বাস্তব, নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বিশিষ্টতা জোরালো ভাবে প্রকাশ পায়। আসন্ন যুগান্তরের উল্লাসের পূর্বাভাস ফুটেছে তাঁর আঁকা আতসবাজির আলোয় উদ্‌ভাসিত সুমিদার আকাশের চিত্রাবলিতে। পশ্চিম জগতে তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, মার্কিন শিল্পী হুইস্‌লার তাঁর ছবির থীম অনুসরণ করে আঁকতেন। বিজুৎসু -ইন্‌য়ের শিল্পী তাইকান্ -শুন্‌সো -কান্‌জানদের প্রকৃতিচিত্রে এই উত্তরাধিকার বর্তেছিল। নন্দলালের পরিণিত পর্বের ছবিতে এমন বহু ভূদৃশ্য -সমুদ্রদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় যার আঙ্গিকে এইসব জাপানি শিল্পীর আঙ্গিকের মিশ্রণ অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু কালির গাঢ় হাল্কা রেশ দিয়ে যে কী প্রবল শিল্পভাষা গড়া যায়— গোপালপুর পর্যায়ের সমুদ্র দৃশ্যগুলি তার অবিস্মরণীয় নজির। অবশ্যই এ তাঁর জাপানি প্রেরণার ফল। সমর্থ প্রতিভার হাতে এমনি করেই এক -একটা শিক্ষা মৌলিক সৃষ্টিতে ফলবান হয়।

নন্দলাল যখন বলেন, “শালগাছ তালগাছ যদি আঁকি, তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব”, তখন চীনা শিল্পীদের উপলব্ধির কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি-চিত্রে প্রতীকের মাহাত্ম্য কখনওই বড়ো কথা নয়। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে যাওয়া আদর্শায়িত প্রকৃতি তাঁর ছবির বিষয় নয়। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতনের আশপাশ, রাঁচী, পুরী, গোপালপুর— আলাদাভাবে চেনা যায়। ১৯২৫ -এর পর থেকে নন্দ-লালের প্রকৃতিচিত্রে কালি -তুলির ব্যবহার ক্রমে বেড়েছে। রঙের সাহায্য ছাড়াই কালির টোনের হেরফেরে আঞ্চলিক প্রকৃতির অনন্যতা এবং বিশিষ্ট মেজাজ ফুটিয়ে-ছেন। অবশ্য জাপানি শিল্পীরা যত বিরাট পটে প্রকৃতির রূপ -বৈচিত্র্য ধরতেন তেমন বড়ো মাপের কাজ নন্দলাল করেন নি। ভাঁজ খুলে পর্যায়ক্রমে দেখতে হয় এই দীর্ঘ পট, একে জাপানিরা বলেন মাকিমোনো। তাইকানের হাতের মাকিমোনোর ছাপা কপি দেখেও বিস্মিত হতে হয়। এমন অনুভূতি হয় যেন হেঁটে হেঁটে চলেছি জলা-জঙ্গল, নতোন্নত জমি, ফেলে যাওয়া পোড়ো বসতি, গাছপালার নিবিড় জটলা পেরিয়ে পেরিয়ে— যেতে যেতে শেষ প্রান্তের দিগন্তে চোখে পড়ল আকাশে এক ফালি চাঁদ। ওই আলো যতদূর পৌঁছয় সবটা পটে এনেছেন সাদাকালোয়। রবীন্দ্র-

নাথের আক্ষেপ মনে পড়ে, আমাদের শিল্পীরা এই বিরাটত্বের দিকে গেলেন না। কালিতুলির কাজে নন্দলাল যে অসামান্য নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাতে মনে হয় তিনি পারতেন চেষ্টা করলে।

ছাত্র বয়সে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে তাঁর কাজের পরিবেশ থেকে, তাঁর ভাবনার পরিমণ্ডল থেকে নন্দলালের চেতনায় জাপানের শিল্পকলা সম্পর্কে যে আগ্রহ জেগেছিল, এইভাবে জীবনের পর্বে পর্বে তার বিকাশ। তাঁর বিশিষ্ট প্রাচ্য-প্রতিভার পূর্ণতার জন্য, চিত্রকলায় ভারতীয়-আধুনিকতার পরিণতির জন্য নিহোন্-গা (জাপানের ঐতিহ্য-অনুগ শিল্পের ধারা) থেকে যা নেবার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় নিয়েছিলেন।



৪

নন্দন-ভাবনা

'শিল্পকথা' পুস্তিকার ভূমিকায় নন্দলাল বলেছেন, "ভাষার শিল্প আমার জানা নেই। সুতরাং ব্যাখ্যা করে কিছু বলব, আমার সে শক্তি নেই।" দীর্ঘ শিল্পীজীবন এবং ভারতীয় আধুনিক শিল্পের বিকাশে তাঁর ভূমিকার গুরুত্বের তুলনায় রচনার পরিমাণ সত্যিই বেশি নয়। একজন শিল্পীর যা জানাবার, হাতের কাজের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তেই তা জানাবেন— এ সত্য মেনেও আমরা তাঁর মুখের কথা বা চিঠিপত্র বা কোনো লেখা পেতে চাই। এই আগ্রহের মূলে, যে ভাবনা-পদ্ধতির ভেতর দিয়ে শিল্পীর সংকল্প গড়ে ওঠে, তার কিছু আভাস পাবার ইচ্ছা কাজ করে। নিষ্পন্ন সৃষ্টির আবহ-মণ্ডল সম্পর্কে এমন-কী টুকরো খবর, মন্তব্য— সব যত্ন করে সাজিয়ে তোলার অভিনিবেশে শিল্পীদের শিল্পকথা নিয়ে নন্দন-সাহিত্যের একটি সম্পন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। নন্দনতত্ত্বের কোনো যুক্তিযুক্ত কাঠামো পাওয়া যাবে বা শিল্পের স্থির কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যাবে এসব থেকে, এমন আশা করা যায় না। পাওয়া যায় সৃষ্টিময় চৈতন্যের বিচ্ছুরিত আলোয় উজ্জ্বল কিছু ইঙ্গিত। তারই সূত্র ধরে শিল্পীর নিজের সময়ের আলোড়ন, তাঁর নিজস্ব অবস্থান, কাজের অভিজ্ঞতায় সমস্যার গ্রন্থিগুলি কেমনভাবে তিনি মোচন করেছেন— সে বিষয়ে একটা ধারণা গড়ে নেওয়া যায়। নিজের দৃষ্টি এবং উপলব্ধির সরাসরি বিবরণ বলেই শিল্পীর শিল্পকথার মূল্য অপরিসীম।

নন্দলাল নানা উপলক্ষে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বলেছেন। অনু-লেখকেরা নিবন্ধের আকারে উক্তিগুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময়ে জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চিঠিপত্রে, যার বেশিরভাগ এখনো ছড়িয়ে আছে নানাজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। আর পাওয়া যায় তাঁর ঘনিষ্ঠদের লেখা স্মৃতিকথায় ধৃত উক্তি। এই যা-কিছু বস্তু সম্বল আমাদের হাতে এসেছে তাতে শিল্পের তত্ত্বগত সমস্যা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ নেই। নিয়ত-নির্দিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা-সার এই উক্তিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়, দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত। বিক্ষিপ্ত সব উক্তি প্রসঙ্গ ধরে সাজিয়ে দেখলে শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার সমস্যা এবং শিল্পের সৃজন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অবলোকন অনেকটাই বুঝে নেওয়া যায়।

২

২৩/২৪ বছর বয়সে ভিন্ন জীবিকার মোহ ছেড়ে নন্দলাল স্থির সংকল্প নিয়ে শিল্পের জগতে এলেন। দেশে তখন স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা প্রবল। বহু মনীষীর মেধা ও শ্রম জাতীয় আত্মপরিচয় সন্ধানে নিয়োজিত রয়েছে। এই সময়ে শিল্পের দিক থেকে জাতীয় গৌরবের বস্তুভিত্তি রচনায় অশেষ সাহায্য করেছেন নিবেদিতা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ভারতশিল্পের ঐশ্বর্যের এবং ভারতীয় শিল্পভাবনার তত্ত্বভিত্তির পরিচয় উন্মোচিত হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় শিল্পের সর্বময় প্রতিপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন এবং সংশয় জাগছিল। ওকাকুরা তেন্‌শিনের মাধ্যমে চীনা ও জাপানি শিল্প -পরম্পরার পরিচয় উন্মোচিত হওয়ায় প্রাচ্য মর্যাদাবোধ আরও তীব্র হয়। চক্ষুষ্মান্ আত্মসচেতন যুবক নন্দলালের সংকল্প গঠনে এই পরিবেশের প্রভাব গভীর হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথও এই সময়ে ছাত্রদের মন স্বদেশমুখী করার প্রয়োজন মানতেন। হ্যাভেলের অনুমোদনে তিনি 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট' -এর শিক্ষাবিধিতে যে পরিবর্তন আনেন তার উদ্দেশ্য ছিল দেশের মাটিতে শিকড় মেলতে আধুনিক শিল্পীদের সাহায্য করা। জাতীয় পুরাণের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, ভারতীয় শিল্পনীতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং দেশের আবহমান শিল্পের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের উপরে তখন গুরুত্ব দেওয়া হত। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য ক্রমেই হ্যাভেল-কুমারস্বামীদের শিল্পব্যাখ্যা পদ্ধতি থেকে সরে এসেছেন। ভারতশিল্প আধ্যাত্মিকতার রূপক, সবই "ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতা এবং অরূপ" এই মরমিয়া ব্যাখ্যা বেশি দিন তাঁর পক্ষে আঁকড়ে থাকা সম্ভব হয় নি। নিজের কাজেও তিনি কোনো প্রথিত প্রাচীন আঙ্গিক হুবহু অনুসরণ করেন নি। ক্রমে শিক্ষক হিশাবেও তাঁর উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছিল, কালের পরিবর্তনে শিল্পরুচির প্রাচীন শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে। উপস্থিত বর্তমান বিশৃঙ্খল, কিন্তু এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে একালের শিল্পীকে নতুন করে দাঁড়াবার জমি তৈরি করতে হবে। সেজন্য ঐতিহ্যের মর্ম জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু যা অবসিত হয়ে গেছে সেই সব রীতি -পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। শিল্পরুচির উত্তরণ ঘটাতে হবে, উপস্থিত বর্তমানের এ দায়িত্ব এড়িয়ে শিল্পীর বা শিল্পের মুক্তি সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সাহিত্যরুচির উত্তরণ ও বিকাশের দৃষ্টান্ত শিল্পের এলাকাতেও আধুনিক শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কে এমন বোধোদয় ঘটাবে, এ একান্তই স্বাভাবিক। পরামর্শে উপদেশে অবনীন্দ্রনাথ সর্বদা বর্তমানের দায় -দায়িত্ব এবং সচেতন শিল্পী -ব্যক্তির স্বকীয়তার মর্যাদা ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতেন।

আর -এক বিদেশি অভিভাবকের উপদেশও নন্দলালের মর্মে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

অনেকবার নন্দলাল বলেছেন, স্বকীয়তা (originality) -স্বভাব (nature) -পরম্পরা (tradition) এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গ সুন্দর আর্ট। এ উপদেশ ওকাকুরা তেন্‌শিনের। নিজের দেশে তেন্‌শিন য়ুরোপীয় রুচির দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জাপানি আধুনিকতার পথ নির্দেশে করেছিলেন। তিনিও চাইতেন, তাঁর ছাত্ররা শিল্পে নিজের দেশের উত্তরাধিকার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে এবং স্বকীয় প্রতিভার শক্তিতে আধুনিক রুচির বিশ্বগত মান আয়ত্তে আনবে। য়ুরোপ এবং আধুনিককতা সমার্থক নয়, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেক দেশে আধুনিক রুচির বিকাশ স্বতন্ত্র হতে বাধ্য— এই সচেতনতা তেন্‌শিন এবং অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতা, সহমর্মিতার ভিত্তি ছিল। নানামুখী মত -সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে এইভাবে যখন স্থির আদর্শে উত্তরণ ঘটছিল, সেই সময়ে নন্দলাল শিল্পী জীবন শুরু করেন। দেশীয় শিল্পের পরম্পরা সম্পর্কে শুধু তথ্যগত জ্ঞানে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। সুযোগ পেলেই দেশের প্রখ্যাত শিল্প কীর্তি দেখতে যেতেন। অনুলিপি তৈরি করে বুঝতে চেষ্টা করতেন প্রাচীন শিল্পী-দের দক্ষতার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল কী ধরনের শিক্ষায়, বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকর্মে ভিন্নতা এবং মিল কতটা। অনুশীলনজাত সাক্ষাৎ জ্ঞানে নন্দলাল একালের শিল্পীদের মধ্যে অদ্বিতীয়। ভারতীয় আধুনিক শিল্পের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর উক্তিতে কঠিন পরিশ্রমে অর্জিত এই জ্ঞান প্রতিফলিত রয়েছে।

৩

'স্বকীয়তা -স্বভাব -পরম্পরা' শব্দ তিনটি নন্দলাল মৌল ভাবনা -মন্ত্রের মতো বার বার উচ্চারণ করেছেন। প্রথমেই আসছে শিল্পীর স্বকীয়তার কথা। প্রতিভার তাপ এবং উদ্দীপনা শিল্পীর মন এবং ইন্দ্রিয়ের গতি -প্রকৃতিতে ভিন্ন ধরন ফুটিয়ে তোলে। সাধারণ থেকে আলাদা করে তোলে। দৃশ্যমান চরাচরের আকার -আকৃতি সকলেরই দৃষ্টিতে ছায়া ফেলে। নিয়ত প্রতিফলিত সেই দৃশ্যপ্রবাহ মনের উপরে কোনো স্থায়ী ছাপ রেখে যায় না সাধারণত। কিন্তু নিছক দেখার স্তর থেকেই শিল্পীর ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ু কাজ করে অন্যভাবে। বস্তুর আকার -আকৃতি সকলেই দেখতে পায়, কিন্তু 'রূপ' দেখার দৃষ্টি স্বতন্ত্র। সে হল শিল্পদৃষ্টি। বস্তুর রূপ -সত্তা, নান্দনিক মূল্য, প্রতিভাত হয় শিল্পদৃষ্টিতে। "শিল্পী বস্তুর রূপ সচেতনভাবে দেখেন।" (দৃ-স্, পৃ. ৩২)। সচেতন অভি-নিবেশ শিল্পদৃষ্টির প্রথম লক্ষণ। আলো প্রতিফলিত হলেই বস্তুর আকার প্রতিভাত হয়। কিন্তু রঙিন আকারটুকুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে বস্তুর গুণ। নন্দলাল বলেন, "শিল্পী বস্তুকে গুণ -সহিত দেখেন।···বাহ্য রূপ থেকে গুণে পৌঁছোন, গুণটি বুঝে যখন রূপে আবার ফিরে আসেন তখনই শিল্পের রূপ শিল্পীর চোখে নির্দিষ্ট ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

(দৃ-স্ব, পৃ. ৩২-৩)। বস্তুর শিল্পগত রূপ দেখার অর্থ নান্দনিক মূল্যটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা। সাধারণ চোখে বস্তুতে বস্তুতে আকারগত প্রভেদ সহজে ধরা দেয়, নয় তো ধরা দেয় কোনো একটা গুণ। গুণ বলতে বোঝায় বস্তুর ঘনতা, বুনানি, কঠিনতা-কোমলতা এবং গতি। সাধারণ দৃষ্টিতে আকার এবং গুণের অভেদ ধরা দেয় না, কিন্তু, "শিল্পী জানেন, আসলে রূপে ও গুণে তফাত নেই; রূপের সবটাই গুণ এবং গুণের জন্যই রূপ।" (দৃ-স্ব, পৃ. ৩২)। সাধারণের দৃষ্টিতে যা রঙিন আকার মাত্র, শিল্পদৃষ্টিতে সেই আয়তনের মধ্যে গুণের সন্নিপাত সমেত বিশিষ্ট রূপসত্তাটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ রূপের উপলব্ধি নিবিড় হয় না, স্নায়ু ও মনের উদ্দীপনা শমে পৌঁছয় না। এই দেখাকেই নন্দলাল বলেন সচেতন দেখা।

দ্রষ্টা শিল্পী-ব্যক্তি, দ্রষ্টব্য রূপময় চরাচর। শিল্পীর ইন্দ্রিয় চরাচরের দিকে উন্মুখ হয় সৃষ্টিরই প্রেরণায়। দেখার স্তর থেকেই তিনি সৃষ্টি নিরত, নান্দনিক অভিপ্রায়ে চালিত। স্বকীয় প্রতিভার তাপ অনুভব করেন বলেই তাঁর দৃষ্টি সাধারণ থেকে ভিন্ন উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। "আর্টিস্টের নিজের ব্যক্তিগত আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, সবই আছে।" (দৃ-স্ব, পৃ. ১৫)। ভালো লাগার, ভালোবাসার টানে তিনি বিষয়ের সঙ্গে "গভীর একাত্মানুভূতি" বোধও করেন নিশ্চয়। কিন্তু বিষয়ে একান্তভাবে লিপ্ত মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, সেই আবেগ কতটা সাহায্য করে শিল্পীকে? রূপসৃষ্টির প্রতিটি স্তর জটিল দ্বন্দ্বময়। সংকল্পের সংহতি এবং প্রকরণ-উপকরণের উপরে সচেতন কর্তৃত্ব ভিন্ন সৃজন-পদ্ধতির শৃঙ্খলা আয়ত্ত করা কখনও সম্ভব নয়। বিষয়ে লীন হওয়ায় বা আবেগের তীব্র প্লাবনে কি সৃজন-পদ্ধতির উপরে শিল্পীর কর্তৃত্ব থাকা আদৌ সম্ভব? আধুনিক নন্দনতত্ত্বে শিল্পীর আত্মসচেতনতা এবং সৃজন-পদ্ধতির উপরে কর্তৃত্ব একটি বড়ো বিবেচ্য প্রশ্ন। এ প্রশ্নে নন্দলালের অবলোকন অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তিনি বলেন,

> শিল্পসাধনায় শিল্পী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায়।...এই মুহূর্তে সে একটি ভাবের আবেগে বিচলিত হচ্ছে আর পরমুহূর্তেই সৃষ্টি করতে বসে নিজের আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে; তখন বিষয়ে-বিজড়িত তার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি থাকছে না, ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতা নৈর্ব্যক্তিক রূপ ধরছে। (দৃ-স্ব, পৃ. ১৫)।

শিল্পকাজ শিল্পীর ব্যক্তিগত আবেগ বিমোচনের উপায়, আবেগের তাড়নায় সৃজন প্রতিভা সক্রিয় হয়ে ওঠে— এমন ধারণা আধুনিক কালে ক্রমেই ভেঙে গেছে। জীবনে এবং শিল্পে আধুনিক মন চায় সচেতন কর্তৃত্ব, সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ। আবেগে ভেসে যাওয়া মানসিকতা কোনো শৃঙ্খলায় পৌঁছয় না, অথচ নির্মাণ মানেই বিন্যাসের শৃঙ্খলা, প্রকরণ এবং উপকরণের সহযোগ। সেই শৃঙ্খলা আনবার সজ্ঞান অভিপ্রায় শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভালোলাগা না-লাগার আলোড়নের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। আধুনিক কবি-শিল্পীর পুরুষার্থ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, "নিরাসক্ত আত্মবিলোপ।" এই সূত্রে

আধুনিক নন্দন -ভাবনার উৎসের দিকে একটু এগোলেই অনিবার্যভাবে মনে পড়বে টমাস স্টার্নস এলিয়টের প্রসিদ্ধ উক্তি,

> Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion ; it is not expression of personality, but an escape from personality.
>
> The emotion of art is impresonal. ("Tradion and The Individual Talent.")

তুলনাটা অবশ্য বেশি দূর টানা সঙ্গত নয়, কারণ, নন্দলাল ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শিল্পী হিশাবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তাঁকে কখনও কখনও অলংকার শাস্ত্রের কাঠামোর বাইরে নিয়ে যায়। অনুভব করেন, শিল্পে ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি সাধারণীকৃত রসে পরিণত হয়— এই তত্ত্বে সৃজন-পদ্ধতির উপরে শিল্পীর নিয়ন্ত্রণের সমস্যা বিবেচিত হয় নি। হবার কথাও নয়। আধুনিক মনই মরমিয়া রহস্যের ঘোরের বাইরে আসতে চায়, অলৌকিকের আবরণ ছিন্ন করে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। নিজের উপরে এবং চরাচরের উপরে সচেতন কর্তৃত্ব অর্জন আধুনিক মনের ধর্ম। আবেগের তাড়না থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার, নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তরণের প্রয়োজন আধুনিক শিল্পীর মননে তীব্র হয়ে উঠেছে। কারণ, আধুনিক শিল্পী চান, নিজেরই স্নায়ু ও চৈতন্যের গতিপ্রকৃতির এবং শিল্প-সৃজন পদ্ধতির জটিল প্রক্রিয়ার উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব। মনের নৈর্ব্যক্তিক অবৈকল্য ভিন্ন এই কর্তৃত্ব অর্জন সম্ভব নয়। সৃষ্টির সময়ে শিল্পী তাঁর নিজের আবেগের ঊর্ধ্বে চলে যান — এই উপলব্ধি নন্দলালের আধুনিক মনন থেকে উৎপন্ন।

এই আলোয় দেখলে বিষয়ের সঙ্গে "গভীর একাত্মানুভূতি" কথাটাও অসঙ্গত লাগে না। যেন -বা একই সত্তা বিষয়ী এবং বিষয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়। কিন্তু সত্যিই এক নয়। তাই অন্যত্র বলেছেন,

> নিজের সত্তা এবং নিজের গুণ তিনি [শিল্পী] জানেন ; নিজেকে বস্তুর সঙ্গে একীভূত করা আর বস্তু থেকে পৃথক করা, এই উভয়প্রকার ক্ষমতাই তিনি রাখেন।" (দৃ -স্থ, পৃ. ৩২)।

দৈবের অনুকম্পা বা আধ্যাত্মিকতার তুরীয় দশা থেকে শিল্পের উৎপত্তি হয় এমন কোনো তত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। অদ্বৈতের নির্বিকারত্ব তাঁর কাম্য নয়, কারণ,

> বিকার থেকেই শিল্পের আরম্ভ। শান্তভাব যেন সোজা লাঠি ; কিছু বলার তাতে থাকে না। কিন্তু যেই একটু বেঁকল, অমনি বলা হলো যেন সাপের মত কিংবা আর এক রকম।··· তাই শিল্পে একটু গলদ আছে। খাঁটি সোনাতে অলংকার হয় না, তাতে একটু খাদ মেশাতে হয়।" (শি -শি -ন, পৃ. ৬১)।

কারণ,

"শিল্পের সৃষ্টি হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় করে। মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না।...
বিষয়ের মোহে পড়লেই ভয়ের কারণ। সেই হল মায়ার দাসত্ব। (দৃ -সৃ, পৃ. ১৭)।

অদ্বৈতের সাধক যা -কিছু অনিত্য বলে পেছনে ফেলে যায়, নন্দলাল সেই মায়াকেই শিল্পের আশ্রয় বলেন। ইন্দ্রিয় -সংবেদনের জগৎকেই একান্তভাবে শিল্পীর ও শিল্পের এলাকা মানা আমাদের পরিস্থিতিতে আধুনিক কাণ্ডজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। শিল্প আধ্যাত্মিকতার সোপান, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতীক— এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের শিল্পভাবনার মুক্তি ও প্রগতির অভিযান। নন্দলাল অসংশয়ে মুক্তি ও প্রগতিরই পক্ষ নিয়েছেন।

৪

শিল্পদৃষ্টিতে প্রতিভাত রূপ -সত্তার ধারণা প্রসঙ্গে নন্দলাল বার বার প্রা ণ ছ ন্দে র কথা বলেছেন। রূপ -সত্তা প্রাণছন্দ আশ্রয় করে সুনির্দিষ্টতা পায়। দেখার বিষয়ের সঙ্গে দ্রষ্টার একাত্মানুভূতির গূঢ় তাৎপর্য ধরিয়ে দেবার জন্যই প্রাণছন্দের কথা বলতে হয় তাঁকে। গাছ -পালার, প্রাণীর নিজস্ব প্রাণধর্ম অভিব্যক্ত হয় তার শরীরী রূপে। স্বভাব (nature) অনুশীলন মানে শুধু বাইরের আকারটুকু বুঝে নেওয়া নয়। বিশেষ আকারের মধ্যে যে -রূপ স্থির নির্দিষ্ট হয়ে উঠছে, তার মূলে আছে প্রাণশক্তির বিশিষ্ট কোনো প্রবণতা। একটা গাছ অস্তিত্বের প্রয়োজনে একদিকে শিকড়ে শিকড়ে মাটি আঁকড়ে থাকে, তেমনি আলোর প্রয়োজনে ডাল -পালা মেলে আকাশমুখী হয়। গাছের প্রাণধর্ম অভিব্যক্ত হয় উর্ধ্বমুখী কাণ্ড, শাখা -প্রশাখার সরল বা জটিল বিন্যাসের ছাঁদে, ছন্দে। প্রত্যেক প্রাণীর শারীরিক গঠনের মধ্যেও রূপ পায় তার প্রাণধর্মের বিশিষ্টতা। চরাচরে যা -কিছু শরীরী, প্রাণের অভিব্যক্তির ছন্দে তার রূপ সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। রূপের আশ্রয় প্রাণছন্দে। শিল্পীর লক্ষ্য, দেখার বিষয়ের প্রাণ-ছন্দটিকে আপন উপলব্ধির মধ্যে পাওয়া। এজন্য তাকে বার বার, প্রহর প্রহরের নানান্ আলোয়, এমন কী নিশুতি রাতে একাগ্রভাবে দেখার সাধনা করতে হয়। "আমার কাছে তুমি স্বরূপ প্রকাশ করো"— শ্রান্তিহীন শিল্পীর এই অনুনয়। বস্তুর রূপসত্তা প্রসঙ্গে নন্দলাল খুব গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাণছন্দের ধারণার উপরে। প্রাণছন্দ ধারণাটি তাঁর উদ্ভাবন নয়, চীন জাপানের শিল্পশাস্ত্র থেকে নিয়েছেন। চীনারা বলেন 'চি-য়ুন্ শেঙ তুঙ', জাপানিরা বলেন 'সেই দো'। প্রাণছন্দ শব্দটি অবনীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় মতে ছবির ছয় অঙ্গ— রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য,

সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ।* ছন্দের উল্লেখ নেই। চীনা -জাপানি শিল্পষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ প্রাণছন্দ, লাইফ মুভমেন্ট বা রিদ্‌মিক ভাইটালিটি। অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, আমাদের ষড়ঙ্গে প্রাণছন্দের কথা স্পষ্ট বলা না হলেও এই মন্ত্রমূর্তিটির মূলে প্রাণ-ছন্দই তরঙ্গিত।

বস্তু রূপটি চেতনার স্পর্শে কখন কোথায় প্রাণবান্, কোথায় -বা চেতনার অভাবে সেটি ম্রিয়মাণ, ইহাই আমাদের ষড়ঙ্গের মূলমন্ত্র।

চিত্রের প্রথমোদয় এবং পূর্ণোদয়ের ঠিক মর্মস্থানটিতে আছেন ছন্দ···। ছন্দ অভি-প্রায়, ছন্দ অভিপ্রায়কে বাহিত করিবার সুপথ,···। (ভা -শি -ষ, পৃ. ১৬, ২১)।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা সমেত চীন -জাপানের শিল্পভাবনার কেন্দ্রীয় সূত্র থেকে নন্দলাল প্রাণছন্দের ধারণা সংগ্রহ করে সৃজন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃতি -অনুশীলনের সময়ে সর্বদাই তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিতেন, দ্রষ্টব্য বস্তুর মূল প্রাণছন্দটি ঠিকভাবে উপলব্ধিতে না আসা পর্যন্ত তার স্বরূপ প্রকাশ পায় না। একটা গাছ, সে চায়,

···সর্বাঙ্গ দিয়েই প্রাণদেবতা সূর্যের রৌদ্র পান করে পরিণত হবে, ফলবান্ হবে সে। ভূমির উপরিভাগে গাছের সমস্ত গতিভঙ্গি সেই ঐকান্তিক ইচ্ছাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। (দৃ -স্থ, পৃ. ১৪৪)।

মাটি ভেদ করে ওঠা আকাশমুখী গাছের ওই গতি ভঙ্গিতেই তার প্রাণছন্দের অভিব্যক্তি। তেমনি প্রত্যেক জীবের মূল স্বভাব অনুযায়ী বা আবেগজনিত বিকার অনুযায়ী শিরদাঁড়ার এক -একটি ভঙ্গি পাওয়া যায়। সেই ভঙ্গিটিতে তার প্রাণছন্দের প্রকাশ। নন্দলালের মতে, বস্তুর আকার ·আকৃতি এবং গুণের বাঁধুনির মূল এই প্রাণ-ছন্দ। প্রাণছন্দই বস্তুরূপে সুনির্দিষ্টতা আনে, রূপের চরিত্র নির্ভর করে প্রাণছন্দের উপরে।

এই প্রাণছন্দের রেখাটির আশ্রয়েই শরীরের ভারসমতা (balance), কাঠামো (construction), এবং ঘনত্ব (volume) লক্ষ করার বিষয়। প্রাণছন্দ যেমন ঐগুলিকে নিয়মিত করে, তেমনি ঐগুলির দ্বারা নিয়মিত হয়। (দৃ -স্থ, পৃ. ২৫-৬)।

সবটা মিলিয়ে নন্দলাল বলতে চেয়েছেন, শিল্পীর রূপের ধারণা সম্পূর্ণ হয় বস্তুর

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

বাৎস্যায়ন -কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের এই ছয় অঙ্গ, নির্দেশ করিয়াছেন, যথা— প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য, ষষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ।"—ভা-শি-ষ, পৃ. ৭।

আকার, গুণ এবং প্রাণছন্দ নিয়ে। 'শিল্পচর্চা' বইয়ে প্রাচ্য শিল্পনীতির প্রাণছন্দ সূত্রটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ করে দেখিয়েছেন। ভারতীয়, চীনা এবং জাপানি শিল্প বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর স্থির প্রত্যয় জন্মেছিল, প্রাণছন্দই প্রাচ্যশিল্পের মূল বনিয়াদ। প্রাণছন্দ দখলে এলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শারীরবিদ্যা এবং পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান অনুশীলন না করে বা সে জ্ঞান ব্যবহার না করেও উঁচুদরের কাজ হতে পারে। তাঁর কথায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতিতে প্রভেদ হল,

> বিলাতি শিল্পী দেহের আঙ্গিক বিশ্লেষণ থেকে তার সমগ্রতায় পৌঁছোন, প্রাচ্য শিল্পী দেহের সমগ্রতাবোধ থেকে আঙ্গিক বিশ্লেষণে আসেন। একজন বিজ্ঞান বা 'ব্যাকরণ' থেকে শুরু করে প্রাণছন্দে বা life movementএ উপস্থিত হবার চেষ্টা করেন। আর -একজন প্রাণছন্দ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান বা 'ব্যাকরণ' শিক্ষা পূরা করেন। অতএব, শারীরস্থানবিদ্যা দেশি বা বিলাতি দুই শিল্পীকেই অর্জন করতে হয়; তবে তার ব্যবহার ও শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন। (দৃ -সৃ, পৃ. ২২)।

আঁকার সময়ে একটি মূল রেখাতেই প্রাণছন্দ ধরা পড়ে, "আদিম রেখাটি থেকে প্রসৃত হয়ে অন্যান্য রেখার ভঙ্গিতে চিত্রের পটভূমি ব্যেপে একটি সর্বাঙ্গীণ ছন্দের সৃষ্টি হয়।" (দৃ -সৃ, পৃ. ৩১)। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, খুঁটিনাটি যোগ করতে গিয়ে প্রাণছন্দটি যেন নষ্ট হয়ে না যায়। নন্দলালের ব্যক্তিগত ঝোঁক এই প্রাচ্য পদ্ধতির দিকে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপদেশেও এই ঝোঁকটি স্পষ্ট। এই মূলতত্ত্ব আশ্রয় করে নিজে কাজ করেছেন, ছাত্রদেরও শিখিয়েছেন। দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এইখানে তাঁর গভীর যোগ। এবং এ যোগ ছিন্ন না করেই তিনি আধুনিক রুচির দাবি মেটাতে পেরেছেন। তাঁর বিশ্বাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগহীন স্বকীয়তা শিল্পীকে উন্মার্গগামী করে তোলে, আর স্বকীয়তা বর্জিত ঐতিহ্যচর্চায় কারিগরির বেশি এগোনো যায় না। সাক্ষাৎ প্রকৃতি বা স্বভাবের সঙ্গে সংস্রব হারালে প্রাণময় উদ্দীপনা নষ্ট হয়, শিল্পীর কাজ হয়ে ওঠে ছকে বাঁধা। আবার স্বকীয়তা বর্জিত স্বভাব অনুশীলনের ফল হয় নিছক নকলনবিশি। স্বকীয়তা -স্বভাব -পরম্পরা— তিনের সহযোগেই শিল্পী -ব্যক্তিত্বে আসে সাবলীল বিকাশের স্ফূর্তি। তবেই সে stylization -এর বাঁধা পথ এড়াতে পারে। শিল্পীর প্রতিটি কাজে প্রকাশ পেতে পারে নতুন উদ্দীপনা। যে কারণেই হোক, "নিজের style বা অন্য শিল্পীর style অনুকরণ করা দোষের, যেমন নিজের বা অপরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ঘৃণার কথা।" (শি -শি -ন, পৃ-৫৪)।

এইসব ধারণার বীজ নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ এবং ওকাকুরার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তর নামও মনে আসে। মহেন্দ্রনাথের কাছে নন্দলাল নিয়মিত যেতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প সম্পর্কে পর্যটক মহেন্দ্রনাথের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল, আর ছিল অগাধ পড়াশুনো। তাঁর শিল্প-

তত্ত্বের বইয়ের* "পরিচয়" দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> ···আমার বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে এঁরা তিনজনে মিলিত হয়ে বহু-দিন ধরে শিল্প সম্বন্ধে যে সব আলোচনা ও গবেষণা করেছেন, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই পুস্তকে সেই সমস্ত চিন্তা ও তর্ক বিতর্ক একত্র করে আমাদের ও বিদেশের শিল্পার্থিগণকে অর্পণ করেছেন।

খুবই কৌতূহল হয়, অত বড়ো তাত্ত্বিক পণ্ডিতের কাছ থেকে নন্দলাল কী ভাবে কতটা পেয়েছেন। তত্ত্বে ভারি মহেন্দ্রনাথের বইখানায় মূল ঝোঁক শিল্পকে দিব্য চেতনার আধার দেখানোর দিকে। মনস্তত্ত্বের পদ্ধতি ব্যবহার করে শিল্পে মানুষের চাওয়া পাওয়ার হিশেব কষেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন নন্দলাল, "পুণ্যদর্শন" বলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু অমন ভাবে শিল্পের এলাকাটিকে তুরীয় কোনো স্তর নন্দলাল কখনওই ভাবেন নি। শিল্পীর দৃষ্টি দৃশ্যবস্তুর বাইরের আবরণ পেরিয়ে তার প্রাণ স্বরূপকে দেখতে পায়, প্রাণছন্দটির সঙ্গে শিল্পী একাত্ম করে নেন নিজেকে — এরকম কথা যখন মহেন্দ্রনাথ বলেন, নন্দলালের অবস্থানের সঙ্গে অনেকটা মেলে। কিন্তু "শিল্পকে বলা যায় প্রতীকে এবং রঙে লেখা এক দর্শন -প্রস্থান," এই সিদ্ধান্ত স্থাপনায় মহেন্দ্রনাথ নন্দলালের সমর্থন পান নি নিশ্চয়।**

৫

রূপের ধারণা, ভাবের উপলব্ধির সঙ্গে সুরূপ -কুরূপ, ভাবের উঁচু -নিচুর প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। সুন্দর অসুন্দর শ্রেণী বিভাজন কি সম্ভব? শিল্প বিষয়ের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা কি বিচার করা চলে? শিল্পের নিজস্ব এলাকা কিছু আছে কিনা— এই ভাবনা থেকেই প্রশ্নগুলি ওঠে। জীবনের সর্বাত্মক আদর্শ নিয়ে নতুন ভাবনা -চিন্তার যুগে নন্দলাল বড়ো হয়েছেন। সেই বাতাবরণে স্বাদেশিকতার প্রেরণা, আধ্যাত্মিকতার মহিমা বোধ, রুচির নৈতিক মান— এসব বিচার -বিবেচনার অন্ত ছিল না। সবাই মেনে নেবে, এমন কোনো স্থির আদর্শ যে এই বিচার -বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিল তা নয়। সৃজনপর শিল্পী -সাহিত্যিকেরা এই মত -সংঘর্ষের উত্তাপের মধ্যে নিজের নিজের ধারণা গঠন করে নিতেন। নন্দলালের আধ্যাত্মিক প্রবণতার কথা অনেকে বলেছেন। তিনি নিজে যখন বলেন, "গাছের মধ্যেই শিব আঁকব" কিংবা বাঘগুহার ছবি সম্পর্কে বলেন

* Mohendra Nath Dutta, ***Dissertation on Painting***, Calcutta 1922.

** "Painting might be called a system of philosophy written out by symbols and colours", *ibid.* p. 15.

"সবই বুদ্ধ", তখন মনে হতে পারে ধর্মীয় -আধ্যাত্মিকতা এবং শিল্পকে একাকার করে ফেলেছেন। কিন্তু এ ধারণার ভিত্তি নেই। ধ্যান, আধ্যাত্মিকতা শব্দগুলি নন্দলাল শিল্পের নিজস্ব এলাকার উৎকর্ষ বোঝাতেই ব্যবহার করতেন। তাঁর ভাবনাক্রম অনুসরণ করলে স্পষ্ট হয়ে আসে, ধ্যান বলতে তিনি রূপবৈচিত্র্যের অন্তর্গত কোনো ঐকতত্ত্বে পৌঁছুবার উপায় বোঝেন না। তাই বলেন, "ধ্যান করলে রূপটা প্রত্যক্ষ হয়.।" (শি -শি -ন, পৃ. ৬৩)। অরূপ কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছনোর জন্য নয়, রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্যই ধ্যান। ধ্যানের অর্থ এখানে শিল্পদৃষ্টির একান্ত অভিনিবেশ। বস্তুটি যখন ইন্দ্রিয়ের সামনে নেই তখনও প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা অর্জনের আয়াস। হিন্দিতে "ধ্যান" হামেশাই মনোযোগ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন, "ধ্যান সে দেখো" ব "ধ্যান লাগাকর দেখো"। অন্যত্র বলেছেন,

> শিল্পের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যা, তার সঙ্গে লৌকিক আচারধর্মের বা নীতিধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শান্তি সমতা ও চেতনাব প্রসার অনুভূত এবং প্রকাশিত হলেই হল। (দৃ -স্থ, পৃ. ৩৭)।

ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট এখানে। 'আত্মিক' 'আধ্যাত্মিক' এসব শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিবর্তন করে একান্তভাবে শিল্পচেতনার সীমার মধ্যে নতুন তাৎপর্যে প্রয়োগ করেছেন। নন্দলালের লেখায় এমন অনেক টুকরো মন্তব্য আছে যা থেকে বোঝা যায়, শিল্পকে তিনি স্বাশ্রয়ীমূল্যে মূল্যবান মনে করেন। শিল্পের ভালোমন্দ বিচারে সামাজিক নীতি-বোধের বাটখারা তাঁর বিবেচনায় অপ্রাসঙ্গিক। যে -কোনো বিষয়ই শিল্পে নবজন্ম লাভ করে। তার নান্দনিক মূল্যই তখন প্রধান বিবেচ্য। পুরী -কণারকের বন্ধকাম মূর্তি-গুলি নষ্ট করার প্রস্তাবকে তাই তিনি সাংঘাতিক প্রস্তাব বলেন। কাম -নিরত নর-নারীর মূর্তিগুলির অসামান্য গঠন সৌকর্য, পরিতৃপ্তির আভা মাখানো মুখচোখের অভিব্যক্তিতে নন্দলাল 'দেবভাব' দেখেছেন। (শি -শি -ন, পৃ.৬০)। আদি রসাত্মক এই মূর্তিশিল্প সম্পর্কে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত. "এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রসসৃষ্টি হিশাবে উক্ত মূর্তিগুলি খুবই উচ্চশ্রেণীর।" (দৃ -স্থ, পৃ. ১৭)। এখানেই পাদটীকায় জোর দিয়ে বলেছেন,

> শিল্পবস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়, রসের দিক থেকে। রসের ব্যভিচার ঘটালেই শিল্পের পক্ষে তা 'দুর্নীতি'। রসের ব্যভিচার ঘটিয়ে শিল্পকে সামাজিক সুনীতি-প্রচারেও লাগানো যায় ; যথার্থ শিল্পসৃষ্টি তা নয়। (দৃ -স্থ, পৃ. ১৬)।

ব্যক্তিগত আসক্তি অনাসক্তির উপরে উঠতে না পারলে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না একথা যিনি বলেন, তাঁর পক্ষে শিল্পের বিষয় নির্বাচনে সুন্দর -অসুন্দর পর্যায়ভাগ সম্ভব নয়। এ বিচার সাধারণ মানুষের। শিল্পদৃষ্টিতে বস্তু মাত্রেরই রূপসত্তা প্রতিভাত

হয়। রূপসত্তাই শিল্পীর দৃষ্টি এবং মনকে টানে। এ আকর্ষণের কোনো সীমা -পরিধি নেই। নান্দনিক উদ্দীপনায় মনের সামনে টাঙানো চিক্ সরে গেলে শুধু পেলব, কোমল, সামঞ্জস্যময় দৃশ্য নয়, 'হৃদয়বিদারক' বা 'বীভৎস' বা ছন্নছাড়া দৃশ্যও একটা-না -একটা রূপের ছাঁদ ধরিয়ে দেয়। নির্মোহ রূপদ্রষ্টার চোখে সুরূপ কুরূপে ভেদ নেই কোনো।

> সমুদয় জগৎ, অন্তরে বাহিরে সকল রূপ যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান সত্তার সেই প্রাণছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপে— কী সাধারণ আর কী অসাধারণ। (দৃ -স্থ, পৃ. ১৮)।

আধুনিক শিল্পী মনের নৈর্ব্যক্তিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে এই উক্তিতে।

৬

কবিতা -গান -ছবি -ভাস্কর্য -স্থাপত্য— শিল্পের এই জাতিগুলির ভিন্নতা সত্ত্বেও সঙ্গতি সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, কবিতার অবলম্বন শব্দপ্রতীক, কবিতায় শব্দপ্রতীকের ইঙ্গিত থেকে বস্তুর বোধে পৌঁছতে হয়। ছবিতে বস্তুটি সাক্ষাৎ। রঙ রেখার ভাষা যুক্ত হয় তার সঙ্গে। কিন্তু,

> কবিতার গাছ আর ছবির গাছ, কোনোটিই গাছ হিসাবে স্থির থাকে না, নিজ নিজ ব্যঞ্জনার দ্বারা রসিকের মনকে রসের অভিমুখে প্রেরণ করে। (দৃ -স্থ, পৃ. ৩৭)

এই গতি সঞ্চারের দিক থেকে কবিতা এবং ছবিতে উপায় -উপকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও মিল রয়েছে। অন্যভাবে দেখিয়েছেন, "চিত্রে একটি মুহূর্ত নিয়ে কারবার আর কবিতায় গানে অনেকগুলি মুহূর্তের প্রবাহ"— এটা আংশিক সত্য। দৃষ্টিপাতমাত্রই মুহূর্তে ছবির সবটা একসঙ্গে নজরে আসে ঠিকই, কিন্তু যথার্থ উপভোগের জন্য আমরা ছবির অন্তর্গত বস্তু এবং কলাকৌশলের খুঁটিনাটি ফিরে ফিরে দেখি। দেখার বিস্তার ঘটে অনেক মুহূর্তের পটে। টুকরো টুকরো কালের সহায়ে এককালীন উপলব্ধিটি নির্দিষ্টতা পায়। কবিতা বা গানেও টুকরো মুহূর্তের প্রবাহ অতিক্রম করে একটি অখণ্ড চরম মুহূর্তে এককালীন পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছতে হয়। বলা হয়ে থাকে, ছবি সাধারণত দেশ বা স্পেস -আধৃত শিল্প। কবিতা, গান ধ্বনির শিল্প, সুতরাং কালে আধৃত। নন্দলাল দেশ -এর কথা তুলছেনই না। শিল্প আস্বাদনে শুধু কালের পটটিকেই হিশেবের মধ্যে নিয়েছেন। আস্বাদনের, মননের দিক থেকে শিল্পে শিল্পে অন্তঃসঙ্গতি দেখাচ্ছেন। বলেছেন, দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর শিল্পের প্রকাশ -পদ্ধতি পৃথক। তবুও এক শিল্পের গুণ যে অন্য শিল্পে ফোটানো সম্ভব হয়, কবিতায় -গানে রূপাভাস জাগানো যায়, আবার

ছবিতে স্পর্শ -গন্ধের ব্যঞ্জনা যে আনা যায়, তার কারণ, আস্বাদনের সময়ে দুই ধারার শিল্পই কালমাত্রায় আশ্রিত থাকে। "শিল্পক্ষেত্রে একটা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে অপর -একটা ইন্দ্রিয় -গোচর বস্তু করে তোলাই শিল্পের একটা বিশেষ কৌশল।" কবিতায় গানে চিত্ররূপময়তা আনা সম্ভব, ছবিতেও আনা যায় নির্দিষ্ট রূপ ছাপিয়ে ওঠা অনির্দেশের ব্যঞ্জনা। নন্দলালেরই ভাবনা -সূত্র ধরে আর এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, কবিতা ও গানের ছন্দ যেমন আছে, ধ্বনি ও ধ্বনির বিরতি নিয়ে রচিত ছন্দ, তেমনি ছবিতেও আছে রেখার ছন্দ। কবিতায় গানে শ্রুতিগত কালের মাপে ছন্দ অনুভব করি। ছবিতে রেখা বিন্যাসের ছন্দও মুহূর্তে মুহূর্তে দৃষ্টিকেন্দ্র বদল করে অনুপুঙ্খ নজরে এনে উপলব্ধি করতে হয়। শিল্প উপভোগের দিক থেকে শোনার কালমাত্রা এবং দেখার কালমাত্রায় নন্দলাল গূঢ় যোগ অনুভব করেন।

প্রসঙ্গটি আমাদের শিল্পভাবনায় নতুন এবং দেশ -আশ্রিত ও কাল -আশ্রিত— এইভাবে শিল্পের জাতিভেদ আদৌ টেকে কিনা নন্দলালই বোধহয় এ প্রশ্ন প্রথম তোলেন। শুধু উপভোগ নয়, শিল্প সৃষ্টির দিক থেকেও সমান গুরুত্বে প্রশ্নটি তোলা সম্ভব। আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পে অনেক আগেই এই বোধ এসে গিয়েছিল। প্লাস্টিক আর্টস একান্তভাবে স্পেস বা দেশ -নির্ভর, ওগ্যুস্ত রদ্যাঁ (১৮৪০ -১৯১৭) এই তত্ত্ব ভেঙে দেন। বলেন, বাস্তবে সময় কখনও থেমে যায় না। গতি, চলমানতা— জীবনের ধর্ম। শিল্পকে তিনি এই সত্যের উপরে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। ফলে ভাস্কর্যকে, ছবিকে কখনওই তিনি স্থাণু ভাবতে পারেন নি। পাথরে, ব্রোঞ্জে প্রাণ সঞ্চার করা, গতি সঞ্চার করা তাঁর মনে হত ভাস্কর্যের মূল সমস্যা। গতি বা মুভমেন্ট মানেই একটি ভঙ্গি থেকে ভিন্ন ভঙ্গিতে উত্তরণ। এক মুহূর্ত থেকে ভিন্ন মুহূর্তে উত্তরণ। ব্রোঞ্জ হোক, পাথর হোক, সেই জড় বস্তুর মধ্যে চলমান জীবনের ধর্ম আনতেই হবে শিল্পীকে। কী করে এই গতির মায়া সৃষ্টি করা সম্ভব? তাঁর বিখ্যাত কাজ 'সেন্ট জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট' ধরে রদ্যাঁ ভাস্কর্যে কালমাত্রার তত্ত্ব বুঝিয়েছেন। মূর্তিটির দুটি পা-ই লগ্ন রয়েছে মাটিতে, অথচ হেঁটে এগিয়ে আসা মানুষের চলন অবয়বটিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত। চলন্ত অবস্থায় কোনো মডেলের ফোটো নিলে কি সেই প্রতিকৃতিতে এমন গতি ফুটত? দেখা যেত, একটি পা শূন্যে এগিয়ে আসছে, অন্য পা রয়েছে মাটিতে। মনে হত যেন অকস্মাৎ স্থকিত হয়ে যাওয়া অসাড় অবয়ব একটি। এর কারণ, সেকেন্ডের ঠিক ২০ কি ৪০ ভাগ সময়ে গোটা অবয়বের সমগ্র অংশের প্রতিকৃতি ধরা হয় ফোটোয়। কিন্তু শিল্পে ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা হয় অবয়বের গতিময় ভঙ্গি, "progressive development of movement" গড়ে তোলার ক্রম যেমন, কালআশ্রিত, তেমনি চলনের গতিও কাল -মাত্রায় বাঁধেন শিল্পী। প্রত্যঙ্গের, পেশির বিন্যাসে গতির মায়া রচনা



শিল্পী : ওগুস্ত রদ্যাঁ
সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট ১৮৭৮ ব্রোঞ্জ

করেন।* গতিশীল বাস্তবকে ইন্দ্রিয় -গোচর করে তোলেন।

ছবি সম্পর্কেও রদ্যাঁ একই কথা বলেন। তেয়োদোর জেরিকোর (Theodore Gericault) আঁকা 'কুর্স দ্যএপ্‌সম'(এপ্‌সম রেসেস) ছবিটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ঘোড়ার পায়ের বিন্যাস অস্বাভাবিক বলে সমালোচিত হলেও দেখার সময়ে গতিময় প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমান্বয়ে দেখতে দেখতে দর্শক ছবিটিতে ছুটন্ত গতির তীব্রতা ঠিকই উপলব্ধি করে।

রঁদ্যা এবং নন্দলাল স্বচ্ছন্দেই কালমাত্রার দৃষ্টান্ত হিশাবে স্থাপত্যেরও উল্লেখ করতে পারতেন। স্থাপত্যেও গড়ে তোলার ক্রম এবং পরিক্রমা করে দেখার ক্রম উভয়ত "অসংখ্য মুহূর্তের টুকরো টুকরো করে তবে আবার যথার্থ একটি মুহূর্তের রহস্যে পৌঁছতে" হয়।

৭

শিল্প একটি বিকাশশীল ধারণা, open concept, তাই কোনো চিরস্থির সংজ্ঞায় শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ করা অসাধ্য। জিজ্ঞাসুদের নন্দলাল কখনও বলেছেন "রূপ ও ভাব যার আছে তা-ই ছবি," কখনও বা বলেছেন, "শিল্প হল কল্পনা," "শিল্প হল সৃষ্টি," "শিল্প হল শিল্পীর ধ্যান বা চিন্তা," "শিল্প হল ছন্দ।" এসব মন্তব্যে নিশ্চয়ই শিল্পের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু লক্ষণগুলির তাৎপর্য গুছিয়ে তিনি কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রচনার চেষ্টা করেন নি। তাঁর ব্যক্তিগত অনুশীলন এবং সৃজনের অভিজ্ঞতা -সার দানা বেঁধে উঠেছে উক্তিগুলিতে। দীর্ঘ জীবনের কাজে নন্দলাল শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার একটি বড়ো পর্ব গড়ে দিয়ে গেছেন কী ধরনের শিল্পনীতি মেনে, এইসব টুকরো লেখা থেকে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

---

*"...It is the artist who is truthful and it is photography which lies, for in reality time does not stop, and if the artist succeeds in producing the impression of a movement which takes several moments for accomplishment, his work is certainly much less conventional than the scientific image, where time is abruptly suspended-" August Rodin, "Movement in Art", Elizabeth Gilmore Holt ed. *A Documentary History of Art*, Vol. III, New york 1966, P. 409.

অনুক্রমণী

'অগ্নি' ১২৭
অজন্তা ১০, ৩৬-৩৭, ৪১-৪৩, ৫৩, ৮৫, ৯৮, ১২৪-২৫, ১২৭
অতুল বসু ৫৬, ৭৫-৭৬, ৯৭
অতুল মিত্র ৪, ২১
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫, ৯৫
অনুকণা খাস্তগীর ১০৮
অনুকৃতিবাদ ২৭
"অনুশীলনতত্ত্ব" ২৭
'অন্নপূর্ণা ও রুদ্র' ৯৮
'অন্নপূর্ণা ও শিব' ১১
অবনী সেন ৭৫-৭৬, ৯৭
'অবনীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব' ১২৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১-৯, ১১-১৬, ১৮, ২১-২৫, ২৭, ২৯-৩১, ৩৩, ৩৭-৪০, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫০-৫৬, ৫৮, ৬৭, ৭৩, ৭৫-৭৬, ১০৩, ১০৯, ১১১, ১২১-২৬, ১২৯, ১৩২-৩৩, ১৪৩, ১৪৬-৪৭, ১৫১, ১৫৩
অমৃতা শের-গিল ৭৭
'অর্জুন' ১০৩
'অলকানন্দা' ১১২
অশোক মিত্র ১৯
অসহযোগ আন্দোলন ৪৭-৪৮
অসিতকুমার হালদার ৩৭, ৪৮, ৫০-৫৫, ১১৫-১৬
'অহল্যা উদ্ধার' ৪৩, ৪৫
আকবর ৯
'আনমনা' ১১, ১৫
'আপন কথা' ৩
'আবদুল গফ্‌ফর খান' ১০৩, ১০৬
'আরব্যরজনী সিরিজ' ৭৩
আরাই কাম্‌পো ৫০, ৯৯, ১২৪, ১২৯, ১৩১-৩৩
'আর্ট বর্ন অব দি অক্টোবর রেভলিউশন' ৮২
আলপনা ৬০, ৬২
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ৭৬
অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ৭৪, ৮১
অ্যালবার্ট মিউজিয়ম ৩৯
'ইছি' ১২৭
ইন্‌ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট ১৪-১৫, ৪৭, ৫০, ৯৭, ১০১, ১২৫, ১৩৫
ইমপ্রেশনিজম ৫৯, ৭৭, ৮১, ৮২, ১৩৬
ইয়ং আর্টিস্টস ইউনিয়ন ৭৫
ইয়াস্থই সোতারো ১৩৫
ইশো ১২৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৭
উকিইয়ো-য়ি ১৪০-৪২
উডকাট ৬০
উডরফ, জন ১৩৫
উতমারো ৮১
উপযোগিতাবাদ ২৭
'উমার তপস্যা' ১১
'উমার ব্যথা' ৬৮, ১৩৩
উমেহারা রিয়ুজাবুরো ১৩৫
এক্সপ্রেসনিজম্‌ ৫৯, ৭৪, ৭৬, ৮১, ১০১-০২
'এক্ষণ' ৬১
এন্‌ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়ার ২৮
এপ্‌সম রেসেস, (কুর্স দ্য এপ্‌সম) ১৫৭
এম্‌প্যাথি ১০০
এলিয়ট, টমাস স্টার্নস ১৪৯

এশীয়পন্থ ১১৮
ওকাকুরা তেন্‌শিন, কাকুজো ৬৪, ১০১, ১১৯-২২, ১২৫-২৯, ১৩৪-৩৬, ১৪৬-৪৭, ১৫৩
'ওমর খৈয়াম' ৪৪, ৫৩
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, উইলিয়ম ২৭
ওয়াশ ৮, ৯, ৩৮-৪১, ১২৩-২৪
'ওলিম্পিয়া' ৮১
'কচ ও দেবযানী' ৭৪
কণারক ৩৫, ৩৭
ক..কতা ৩
কনফুশিয়স ১৪১
কনস্‌টেবল, জন ১৪১
কলাভবন ১৪-১৬, ১৮-১৯, ৫০-৫১, ৫৬, ৫৮-৬০, ৬২-৬৩, ৬৫-৬৬, ৭১, ৭৩, ৮২, ১১৫, ১৩২, ১৩৪
কাওয়াই গিয়োকুদো ১২০
কাজিন্‌স জেমস ৫৩
কাৎসুতা, ইয়োশিও ১২৪
কাৎসুশিকা হোকুসাই ১৪২
কান্‌গা-কাই ১১৯
কান্‌জান্‌, শিমোমুরা ৬৪, ১১৭, ১২০, ১২৯, ১৩১, ১৩৫-৩৬, ১৪২
কান্‌ডিনস্কি, ভাসিলি ৫৯, ১০১
কানাই সামন্ত ৩৭, ৪৯, ১২৫, ১২৮, ১৩২
কানো তান্‌ উয়ু ১২৩
কানো মাসানোবু ১৩৩
কাবুরাগি কিয়োকাতা ১২০
কারপেলে, আঁদ্রে ৫৯, ১০২
কার্জন, জর্জ নাথানিয়েল ৬
'কালাদিঘির পাড়ে ইন্দিরা' ১২৬
'কালী' ৩১, ১২৫
কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার ৭৫
কাশীনাথ দেবল ৫০
কাংড়া ৮৭
ক্যালকাটা গ্রুপ ১৯, ৯৭
ক্যালিগ্রাফি ৯০-৯১, ৯৩, ৯৯, ১০৩, ১০৬, ১৩৩
কিউবিজম ৫৬, ৫৯, ৬১, ৭৪, ৮১, ১০১, ১৩৫
কিক্‌কাওয়া রেইকা ১২০
কিয়ারাস্‌ক্যুরো (ছায়াতপ) ৪০, ৮৩
কীর্তন ৩
কীর্তিমন্দির, বরোদা ১০০
'কুণাল ও কাঞ্চনমালা' ৬৮
'কুৎ-সু-গেন' ১২০
কুমারস্বামী, আনন্দ কেন্‌টিশ ৩৪, ৩৫, ৩৯. ১৪৬
কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ৬৮, ৬৯
'কুর্স দ্য এপ্‌সম', (এপ্‌সম রেসেস') ১৫৭
'কৃষ্ণচুড়া' ৭৮, ৭৯
'কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ' ৩, ৩৭, ৭৩
'কৃষ্ণ-যশোদা' ১২৬
'কৃষ্ণ-সুদামা' ৪৫, ৬৮
কোঁৎ, ওগুস্ত ২৬
'কোক্‌কা' ৪৬, ১৩৩, ১৩৫
কোগিও—তেরাসাকি দ্র.
'কোপাই নদী' ১০৩
কোবোরাই তোমোনে ১২০, ১৩৬
কোরিন, ওগাতা ১৩২-৩৩
কোলরিজ, স্যামুয়েল টেইলর ২৭
কোলাজ ১০৯
ক্রামরিশ, স্টেল্লা ৫৯, ৮১
ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ৪৭, ৫২-৫৫, ৯৭
'ক্ষীরের পুতুল' ৩
ক্ষেত্রমণি বসু ৪, ২০
'খেয়ালিয়া' ৫৩
গথ, ভান ৮২

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭, ৫০-৫১, ৫৪-৫৬, ৫৯, ৬২, ১০১, ১১১, ১২৯, ১৩২
'গঙ্গাবতরণ' ১০০
গণেন মহারাজ ১৩
'গণেশ জননী' ১৩
গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট ২, ২১-২২ ২৬, ৪৭, ৭৬, ১৪৬
গান্ধীজী ৪৭, ৮৮
গাহো, হাশিমোতো ১১৯-২০
গিরিধারী মহাপাত্র ৪৭
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪৬
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২
গিলার্দি, ওনিস্তো ২২
'গীতাঞ্জলি অ্যাণ্ড ফ্রুট গ্যাদারিংস' ১০৭, ১৩২
'গোধূলি' ১১৩
গোপাল ঘোষ ৯৭, ১১১-১২
গোপালপুর পর্যায় ১১২-১৩, ১৩৯
গোবর্ধন আশ ৭৫, ৯৭
'গোষ্ঠলীলা পট' ৯১
গ্রাফিক্স ৬০, ১০১-০২ ১০৭
গ্রিফিথ, জন ৬৬
'গ্রীষ্ম' ('মধ্যাহ্ন স্বপ্ন') ৭৮, ৮০
'গ্রুপ অব অপ্সরাজ, এ' ১২৪
'ঘুমন্ত মেয়ে' ৩৯
চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
'চণ্ডীমঙ্গল-সিরিজ' ৩, ৩৭, ৭৩
'চয়নিকা' ৪৮
চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৯৭-৯৮
'চিত্রকথা' ৫১, ৫৯, ৬১, ৭৪, ১১৩, ১২৭, ১৩৬
'চিত্রকর' ৪৮, ৭৪
চিন্তামণি কর ৪৩
'চৈতন্য সিরিজ' ৩৮, ৫৬
'ছাগ-অবতার' ১০৩
ছাপছোপের কাজ ৮০, ১১৩, ১৩২
ছাপাই ছবি ১০১
ছায়াতপ (কিয়ারাসক্যুরো) ৪০, ৮৩
'জগাই-মাধাই' ৪৫, ৬৮
'জতুগৃহদাহ' ১১, ৪৪-৪৫
জয়নুল আবেদিন ৯৭-৯৮
জয়া আপ্পাস্বামী ৩৯, ১৩২
'জ্বলন্ত পাইন' ১১৩
জাতক ৪১
'জাপান যাত্রী' ১২৯, ১৩১
জাপোনেস্রী ৮১
জালিয়ান্ওয়ালাবাগ ৪৮
'জীবনস্মৃতি' ৪৯, ৫৬
'জোড়াসাঁকোর ধারে' ১১, ১৩, ১২৫
জোলা, এমিল ৮১
'ঝড়ের রাতে' ৭২
'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' ৮৮
টার্নার, যোসেফ মেল্লোর্ড উইলিয়ম ২৭, ১২৩, ১৪১
'টেম্পটেশন অব দ্য বুদ্ধ' ১২৫
টেম্পেরা ১১, ৪০, ৪১
'ডাণ্ডি অভিযান' ৮৮
ড্রাই পয়েন্ট ১০২
ডুরার, অ্যালব্রেথ্ট ৬১
তাইকান, ইয়োকোইয়ামা ৩১, ৪০, ৫৫, ৬৪, ১১৭, ১২০-২১, ১২৩, ১২৫, ১২৯, ১৩১-৩২, ১৩৫-৩৭, ১৪২
তাওয়ারাইয়া সোতাৎসু ১৪১
তান্কা, তিব্বতি ৬০
তান্যিউ ১৪১
'তালকুঞ্জ' ১০৩
তেরাসাকি কোগিও ১২০, ১৩৬
"তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী চিত্ত" ৪৯
'দশরথের অন্তিমশয্যা' ৩১

'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' ১২, ১৩, ৩২, ৩৭, ৮০,
১২৮, ১৪৭-৫২, ১৫৪-৫৫
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২
'দেশ' ১৫, ৪৩, ৮৩, ৮৮
দোমাস্নিকভ, বি এফ. ৮২
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ৭০
'নটীর পূজা' ৭১, ৯৯, ১০০
নরসিংলাল ৯৮
'নিদ্রিতা' ৩৯
নিবেদিতা, ভগিনী ৩১-৩২, ৩৭, ৪৫,
১০৭, ১৪৬
নির্মলকুমার বসু ৮৯
'নিরীক্ষা' ৭০
নিশিকি-ইয়ে ১৪১
নিহোন্-গা ১১৯, ১৪৩
নীরদ মজুমদার ৬৫, ৯৭
'নেচার মিস্টিরিয়স' ৫৩
'নৌকা বিহার' ৪১
পঞ্চানন মণ্ডল ৩৮
পঞ্চাশের মন্বন্তর ৯৭, ৯৮
পট, ওড়িশা ৪৩, ৮৯
পট, কালীঘাট ১২, ৯১
'পথহারা গাভী' ৪৬
পরিতোষ সেন ৯৭
'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' ৬৫, ৮৩
'পাইন বন' ১০৩
পাটা ৪৩, ৬০
পামার, চার্লস এল. ৮, ১২৩
'পার্থসারথি' ৪৪, ৪৫, ১২৪
'পার্বতীর প্রত্যাখ্যান' ১১
প্লাস্টিসিটি (স্পৃশ্যগুণ) ৪৪
পিকাসো, পাবলো ৭৬, ১১৫, ১৩৬
পিয়ার্সন, উইলিয়ম উইনস্টানলি ২৮
পিরালি ব্রাহ্মণ ২
পিসারো, কামী ৭৭, ১৩৫
পূর্ণচন্দ্র বসু ৪
পেয়ঁ, জু (জ্যু বিহঙ্গ) ১১৭
পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ৫৯, ৮১
প্যোপকভ, ভি.য়ে. ৮২
প্রতিমা দেবী ৫৯, ৯৮
প্রত্যক্ষবাদ ২৭
প্রদোষ দাশগুপ্ত ৯৭
'প্রবাসী' ২১, ৩৮
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮
'প্রভাত সংগীত' ৪৯
প্রাণকৃষ্ণ পাল ৯৫, ৯৭
প্রুধঁ, পীয়ের পল ২৭
প্রেসিডেন্সি কলেজ ২০
ফজলউদ্দিন কাজি ৩৭
ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ ৯৭
ফিউচরিজম ১৩৫
ফেসটিভাল অব দি ইউ-এস-এস-আর,
ইন্ডিয়া (১৯৮৭-৮৮) ৮১
ফোন্তানেসি, আন্তোনিও ১১৯
ফোভিজম ১৩৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৭
বঙ্গভঙ্গ ৬, ৩০, ৪৮
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৬
'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' ৫
বটতলার ছাপা ১০৮
বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী ১৪, ১১৫
'বসন্ত' ('কৃষ্ণচূড়া') ৭৮, ৭৯
বসু বিজ্ঞান-মন্দির ১১, ৪৫, ৯৮
বরোদার কীর্তিমন্দির ১০০
বাঘগুহা ৩৭, ৫৩, ৮৫, ৯৮
বাস্তববাদ ২৭
'বাংলার ব্রত' ৩, ১০৯
'বিক্রমাদিত্য' ৩৯
বিচিত্রা ১৫, ৫০
বিজুৎসু-ইন ১২০-২১, ১৩৫-৩৭, ১৪২

বিজুৎস্থ-গাক্কো ১১৯-২০
বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড
কালচার ৮২
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ৪৮, ৫৯,
৬১-৬২, ৬৫, ৭৪, ১০০, ১০৭,
১১১, ১১৩, ১২৭, ১৩২, ১৩৫-৩৬
বিবেকানন্দ, স্বামী ১৪, ৩১-৩২, ১৫৩
বিমূর্তবাদ ৬১
বিশ্বভারতী ১৪, ৫১
'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ৫৭, ১০৩
'বিশ্বমাতৃকা' ৫৩
বিশ্বরূপ বসু ১২, ৩৮, ৯০
বিষ্ণু দে ৭৩
বিহঙ, জু্য (জু পেয়ঁ) ১১৭
'বীণাবাদিনী' ৭২
'বুদ্ধ ও সুজাতা' ৫, ১২৫
বুর্দেল, আন্তোয়ান ৫৯
'বৃষ্টিতে কণারক' ৪৫
বেঙ্গল স্কুল ৪০, ৫৫
'বেতাল পঞ্চবিংশতি ৩৯
বেন্থাম, জেরেমি ২৬-২৮
'বৈষ্ণবীর ছবি' ১২৩
'বোলপুরের পথে' ৭৮, ৮০
ব্রাউন, পার্সি ৭৫
ব্লান্ট, নর্মান ৬৮
ব্লেক, উইলিয়ম ২৭-২৮
'ভারতশিল্পী নন্দলাল' ৩, ৩৮, ৪৩
'ভারতশিল্পে মূর্তি' ৩৮
'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' ১৫১
'ভারতী' ৩৮
'ভারতের চিত্রকলা' ১৯, ৯১
'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' ৩৫
ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ম ৩৯
ভেঙ্কটাপ্পা, কে ৩৭, ৫২
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
মধুসূদন দত্ত ৬, ২৭
'মধ্যাহ্ন স্বপ্ন' ('গ্রীষ্ম') ৭৮, ৮০
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ১০২
মহেঞ্জোদড়ো ১০৯
মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩, ৩২, ১৪৬, ১৫৩
'ম্যান ইন এ ল্যান্ডস্কেপ' ১০৩
মাইকেলএঞ্জেলো ৬১
মাকিমোনো ১৪২
মাতিস, অঁরী ৮২, ১৩৬
'মাদোনা' ২১
মানে, এদুয়ার ৭৭, ৮১
'মায়াবতীর পথে' ১১২
মার্কস, কার্ল ২৭
'মিথস অব দি হিন্দুজ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস্'
১০৭
'মিথুন' ৭৪
মিল, জন স্টুয়ার্ট ২৬-২৮
মিলওয়ার্ড ৫৯
'মীরাবাঈয়ের জীবন' ১০০
মুকুলচন্দ্র দে ৪৯-৫০, ৭৫, ১০১, ১৩১
মুঘল-কলম ৩৭
মুঘল-মিনিয়েচার ৯
মুরাদায়ান, এস. এম. ৮২
মেইজি ১১৮
'মেঘদূত' ১২৫
মোতোনোবু, কানো ১৩৩
মোইসেইয়েন্‌কো, য়ে. য়ে. ৮২
মোনে, ক্লোদ ৭৭
মৌলানা জিয়াউদ্দিন ১০৬
যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ৮, ৫৬, ৭৫
যামিনী রায় ১৯, ৫৫-৫৬, ৫৮, ৬২, ৭৩
'যামিনী রায়', ৭৩, ৭৫-৭৭
য়িঙ ১৪১
য়িয়াঙ ১৪১
রণদাপ্রসাদ গুপ্ত ৫৬

রত্তন পারিমু ১০১
রথীন মৈত্র ৯৭
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪
রদ্যা, ওগুস্ত ৫৯, ১১৬, ১৫৬-৫৮
রবি বর্মা ২১, ৬৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪-১৫, ১৮, ২৭, ২৮
৩০, ৪৮, ৫০-৫২, ৫৪, ৫৬-৫৮,
৬০-৬২, ৬৪-৬৫, ৭৩, ৭৫. ৭৮,
৮৩, ৯৮, ১০১-০৩, ১০৭, ১১১,
১১৬, ১২৮-২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৩৮,
১৪২-৪৩
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০২
রাখিবন্ধন ৩০
'রাগমালা চিত্র' ৮৭
'রাত্রি' ('শীত') ৭৮, ৮৩
'রাধা বিরহ' ৮৫, ৮৭
রামকিংকর বেইজ ৪৩, ৫৯, ৬১-৬২,
৭৪, ৮২-৮৩, ৯৭, ১১১
রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৩-১৪, ৩১-৩২
রামমোহন রায় ২
'রামায়ণী পট' ১১
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩০
'রাসলীলা' ১২৫
রিবেল আর্ট সেন্টার ৭৫
'রিরিয়ু-তো' (তর্পণের দীপ ভাসানো)
১২৫
'রূপম' ৬৮, ১২৪-২৫,
রেনোয়ার, পিয়ের ওগুস্ত ৭৭, ৮২,
১৩৫
র‍্যাফাইল, ২১
লাও-ৎজু ১৪১
লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ ৭, ২৯-৩০
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ৬১
লিনোকাট ১০৬
লিপিকলা (ক্যালিগ্রাফি) ১০৩, ১৩৩
লিপিকলা, চীনা ৯৯
লিপিকলা, জাপানি ৯৩
ল্যাকসিট (lacsit) ৫৩
'শবরীর প্রতীক্ষা' ৬৮, ৬৯, ৭০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮
শরৎ মহারাজ ১৩
শশীকুমার হেশ ৫৬
শাকাকু (সিয়েন হো) ১২৬
শামানোভ, বি. আই. ৮২
শাহিদ সোহরাওর্দী ১৯
'শিব-সতী' ৪১
'শিব সীমন্তিনী' ১৩
'শিবের বিষপান' ৪৫
'শিমোমুরা কান্জান দেন' ১২৯
শিমোমুরা হিদেতোকি ১২৯
'শিল্পকথা' ১৪৫
'শিল্পচর্চা' ১৫২
'শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল'
১৪, ৩২-৩৩, ৩৫, ৬৪, ১১০,
১১২-১৩, ১১৬, ১৫০, ১৫৩-৫৪
'শিশুকৃষ্ণ কোলে যশোদা' ৫৩
'শীত' ('রাত্রি') ৭৮, ৮৩
'শীতের পদ্মা' ৪৬, ৪৯, ১২৪
শুন্‌সো, হিশিদা ৫৫, ৬৪, ১২০-২১,
১২৫, ১৩৬, ১৪২
শৈলেন দে ৪৭, ৫২, ১৫৩
শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৩
'সতী' ৩৯, ৪১, ১৩৫
'সতীর দেহত্যাগ' ৪১
সত্যজিৎ রায় ৬১, ৬৩, ১২৮
'সত্যভামা ও কৃষ্ণ' ৩১
সত্যেন বটব্যাল ২১
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড ২৯
'সন্ধ্যা প্রদীপ' ৭৮
সমর দে ৭৫

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৭, ৫২
'সরস্বতী' ১২৫
'সহজ পাঠ' ১০৭-০৮
সাদাকালোর কাজ ৮৮, ১৩৮
সিয়েন হো, (শাকাকু) ১২৬
সিল্ক প্রিন্ট ১৪১
সিস্‌লে, আল্‌ফ্রেদ ৭৭
সুকুমারী দেবী ১০৯
সুখময় ভট্টাচার্য ৫৮
'সুজাতা' ৭৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯, ২৯, ১৪৯
সুভো ঠাকুর ৯৭
সুরেন গাঙ্গুলী ১২৬
সুরেন দে ৭৫
সুরেন্দ্রনাথ কর ৪৯ ৫০, ১০২
সেইগো কোগেৎসু ১২০, ১২৬
'সেই সেই করতেন' ১৩৭
সেজান, পোল ৭৭, ৮২, ১২৫
সেন রীতি ১৩৩
'সেনট জন দি ব্যাপটিস' ১৫৬
সৈয়দ আহ্‌মেদ ৩৭
সোতাৎসু —তাওয়ারাইয়া দ্র.
সোতারো ইয়াসুই ১২৫
সোমনাথ হোড় ৯৭-৯৮
সোয়া, মঁসিয়ে দ্য ৮১
স্কুল অব ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল আর্ট ২২
'স্টুডিও, দি' ২২, ২৮, ৩৯, ৪৬
'স্পিরিট অব দি এয়্যার, দি' ৫৩
'স্পিরিট অব দি ফাউনটেইন, দি' ৫৩
'স্পিরিট অব দি ফায়ার, দি' ৫৩
স্পৃশ্যগুণ (প্লাস্টিসিটি) ৪৪
'স্বর্ণকুম্ভ' ৮৫
হরপ্পা ১০৯
হরিনারায়ণ বসু ৫৫
হরিপুরা মিউরাল ৮৯-৯২, ৯৫
'হলকর্ষণ' ৬০, ৯৮-৯৯
'হাড় খাব মাংস খাব চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব' ৮৮
হ্যাভেল, আর্নেস্ট বিনফিল্ড ৭, ১৫, ২১-৩১, ৩৪-৩৫, ৩৯, ৫৬, ৫৯, ১৪৬
'হিমালয় দৃশ্যাবলি' ৫৬, ১৩৯
'হিমালয়ের শিব' ১১
হিরোশিগে ১৪২
হিশিদা— শুন্‌সো দ্র.
হুইসলার, জেমস্‌ ১৫২
হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ৫৬
হোরংহাম, সি. জে ৩৬-৩৭, ৪১
'হেলাফেলার কাজ' ১০৯
হোকসাই— কাৎসুশিকা দ্র
Art of Asit K. Haldar, The ৫৩
Bauhaus ১০১
Centenary, Government College of Art and Craft ২৩, ২৬
Documentary History of Art, A ১৫৭
Gericault, Theodore ১৫৭
Holt, Elizabeth Gilmore ১৫৭
Ideals of the East, The ৩১, ১২৬
"Indian Art and Ideology" ৫৪
Itten, Johannes ১০১
Klee, Paul ১০১
Korner, Sophie ১০১
Longmans Miscellany 1943 ২৯
Marcks, Gerhard ১০১
"Movement in Art" ১৫৭
Muche, Georg ১০১
"My Apprenticeship Under Nandalal" ৬৩

Nandalal Bose centenary volume ১৯
On Art & Aesthetics ৬০, ৬৭
Painting of three Tagores The ১০১
Roop-Lekha ৫৪
Schreyer, Lothar ১০১
Tandon, R, C. ৫৩
Tery-Adler, Margit ১০১
'Tradition and the Individual Talent" ১৪৯
Visva-Bharati News ৭৪
Viswa Bharati Quarterly The ১৬
World Window ৬১